রজত জয়ন্তী বর্ষ ॥ ১৩৮৩

ম্পাদক ঃ সুরজিৎ ঘোষ ॥ অভিরূপ সরকার

ছুটির পরেই
হিম ক্রীম
— আইস ক্রীম
হিম ক্রীম

শতভিষার কবিতার বই :

ভিনদেশী ফুল

(ফরাসী কবিতার অনুবাদ)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার

একঋতু

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বৃষ্টির শব্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

প্রথম পুরুষ

অরবিন্দ গুহ

আজ চোখ মেলে

কুমার রায়

বিশুদ্ধ অরণ্য

আলোক সরকার

কয়েকটি কবিতার বই

ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা
পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

নির্বাসন নাম ডাকনাম
কালীকৃষ্ণ গুহ

তোমার নিঃশব্দ তরবারী
রথীন্দ্র মজুমদার

সামনে প্রিয়তম পথ
রাণা চট্টোপাধ্যায়

অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা
পার্থ রাহা

কফিন কিংবা স্যুটকেস
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

জয়ন্তীবর্ষে প্রকাশের পথে শতভিষার নতুন বই

অরুণ মিত্র

কবিতা কাহিনী ইত্যাদি ঃ ফরাসী প্রসঙ্গ

ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক সমগ্র প্রবন্ধ সংকলন

●

দীপংকর দাশগুপ্ত

ছন্দ কবি কবিতা

প্রবন্ধ সংকলন

●

আলোক সরকার

মায়াকাননের ফুল

সমগ্র কাব্যনাট্যের সংগ্রহ

শতভিষা

রজতজয়ন্তী বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৮৩

একটি চিঠি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নন্দলাল বসু

শতভিষার পঁচিশ বছর

আলোক সরকার

প্রেক্ষিত

সুরজিৎ ঘোষ

পঁচিশ বছরের এ্যালবাম্
পঁচিশ বছরে শতভিষার পাতায় প্রকাশিত কিছু
স্মরণীয় কবিতা ও গদ্যের এলোমেলো ছবি

কবিতা

জীবনানন্দ দাশ অজিত দত্ত অরুণ মিত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ অরবিন্দ গুহ শঙ্খ ঘোষ আলোক সরকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দীপংকর দাশগুপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সুধেন্দু মল্লিক অমিতাভ দাশগুপ্ত তারাপদ রায় মঞ্জুশ্রী দাশ শান্তিকুমার ঘোষ সামসুল হক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্র আচার্য পবিত্র মুখোপাধ্যায় কালীকৃষ্ণ গুহ রত্নেশ্বর হাজরা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরেশ মণ্ডল অশোক দত্তচৌধুরী রাণা চট্টোপাধ্যায় সুনীথ মজুমদার রথীন্দ্র মজুমদার পার্থ রাহা অশোক চট্টোপাধ্যায় সুব্রত রুদ্র প্রমোদ বসু শেখর গঙ্গোপাধ্যায় গৌতম বসু অভিরূপ সরকার সুরজিৎ ঘোষ

বিশেষ নিবন্ধ চিঠিপত্র আলোচনা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রবোধচন্দ্র সেন শঙ্খ ঘোষ
দীপংকর দাশগুপ্ত আলোক সরকার
অভিরূপ সরকার সুরজিৎ ঘোষ

কবিতা বিকীর্ণ শিল্প

আলোক সরকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় যশোধরা বাগচী বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
রমানাথ রায় গৌতম বসু সুরজিৎ ঘোষ অভিরূপ সরকার

শংকর চট্টোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুধেন্দু মল্লিক পবিত্র মুখোপাধ্যায় সুব্রত
সেনগুপ্ত কালীকৃষ্ণ গুহ পার্থ রাহা আশিস ঘোষ অশোক
দত্তচৌধুরী আলোক সরকার শংকর চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

সুরজিৎ ঘোষ অভিরূপ সরকার

দাম : পাঁচ টাকা

এই চলার শিরায় উপশিরায় যে ছন্দ আছে তাই এ সুন্দর

এই চলার শিরায় উপশিরায় যে ছন্দ আছে তাই এ সুন্দর

SANTINIK

INDIA POSTAGE

Sj Abanindra Nath
Tagore
P.O. Santiniketan
Dist Birbhum
BENGAL

চিত্ররূপময়

তখন ছুটির দিন। সেই স্পষ্টাস্পষ্টি কিশোর খুশিটি তখন স্কুলে পড়ে। শরতের ছুটিতে তার সে কি আনন্দ। জীবনতরু জল না পেলে বাঁচে না। পাথরের থেকেও রস নিতে চায়, যে পাষাণের মঞ্চে সে বাঁধা থাকে তা থেকে। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর ভিতরেই তখন তার খেয়ালখুশীর গান, সেই খেয়ালেই কখন সে আনমনে যাচ্ছিল পথ দিয়ে। এ দিকে শরতের রোদে তখন কী আলো কী বাহার। পৃথিবীর ছবি আঁকার সমস্ত সরঞ্জাম ঘরের ভেতরে ফেলে শুধু এক জোড়া আনন্দের চোখ নিয়ে জাপানী ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কে—না কতকাল আগে জন্মতারার একটি আলোকবিন্দু রওনা হয়েছিলো পথে, ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তখনকার মত বাসা বেঁধেছিল সেই অবয়বে যাঁর নাম অবনীন্দ্রনাথ। ছেলেটি পড়ে গেল তাঁর চোখে, মনের নজরে।

আঁখি যতজনে হেরে
সবারে কি মনে ধরে ?

একে বোধ হয় ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠলেন, "এই, শোন এদিকে।" সামনে গিয়ে গুটিগুটি দাঁড়াতেই বললেন, "কী গান গাইছিলি ? গা তো।" সিঁড়ির নীচের ধাপে বসে তখন ছেলেটির গান শুরু হল আবার।

এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে, সোনার বরণ
হৃদয়হরণ

কষ্ট তো কত। শরতের খোলা আকাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকায় যা কিছু তা কি সে জানত। মন বলে, "চোখ, তুমি ধরে রাখতে পার না।" গান শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "ধরেছে, রবিকা ধরে ফেলেছে। আর ত্থাখ কত চেষ্টা করছি, কিন্তু সবুজের উপরে সোনাটা কিছুতেই ধরতে পারছি না।" সেই বলায় কি কোন দুঃখ ছিল, কে জানে ? পরমুহূর্তেই আবার আনন্দে গলা বুজিয়ে বললেন,"গান শোনালি, তোকে এখন কি দিই ? হাতে ছিল চিঠির তাড়া ; তার থেকেই একখণ্ড পোষ্টকার্ড দিয়ে বললেন, "এই নে তোদের মাষ্টারমশাই পাঠিয়েছে।" কী না তার এক পিঠে দু'চার লাইন,অন্য পিঠে পেন্সিল আর কলমের

আঁচড়ে একটি অপরূপ দৃশ্য—এক কোণে যার লেখা "On the way to Baroda" এই চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি নন্দনের অমৃতধারায় যাঁর স্নান সারা হয়েছিলো জন্মের আগেই। ঐ কিশোরের মত তিনি কতজনেরই তো মাষ্টারমশাই, তাঁদের চোখের তারায় সৃষ্টি করার রঙ মেশানোর কাজে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর কাছে তিনি ছাত্র, শুধু নন্দলাল, নন্দলাল বসু নন। বরোদা থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন কুশল সংবাদ দিয়ে আর পথের সংগ্রহ একটুখানি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর মাষ্টারের কাছে। দিগন্তের কোল ঘেঁষে কারা ফেরে। 'স্মৃতি জাগায় বহুকাল আগের। মন চায় বাড়ী ফিরতে। স্বপ্নে দেখে বহুকাল আগের ছেড়ে আসা বাড়ি ঘর ঘাট মাঠ গাছ।' অনেক দিনের পুরোনো ছবি, কবে এই যাত্রা শুরু হ'য়েছিলো, এখন রঙছুট। ধীরে ধীরে ঝাপসা হ'য়ে আসছে রঙ। তাই কালো কালিতেই ছাপিয়ে দিলুম সেই চিঠি, নাকি ছবি। সময় ছাড়া এর গায়ে রঙ চড়ায় কার সাধ্যি। আর নীচে দেওয়া রইল এই গপ্পের কিশোর আর এই চিঠিতে লেখা সব সাঙ্গোপাঙ্গোদের পুরো নাম।

বিশু—বিশ্বরূপ বসু।

মাসোজী— বিনায়ক রাও মাসোজী।

জয়ন্ত—জয়ন্ত দেশাই।

সুখময়—সুখময় মিত্র।

গুপ্ত—দেবীপ্রসাদ গুপ্ত।

মধুকর—মধুকর শেঠী।

শান্তি—শান্তি বসু।

সেই কিশোরটি—বিশ্বজিৎ রায়।

সুরজিৎ ঘোষ

২৬শে বৈশাখ ১৩৮৩

রবিবার। কলকাতা।

শতভিষার পঁচিশ বছর

আলফা কাফে নয়, 'শতভিষা'র প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিলো রাসবিহারী আর মহীশূর রোডের মোড়ের এক ছোট্ট চায়ের দোকানে। সেই চায়ের দোকান আর নেই, সেখানে এখন ঘড়ি মেরামতের দোকান। বস্তুত যারা এই পরিকল্পনা করেছিলো, সেই দুজন অতিতরুণ যুবক, যারা তখন পর্যন্ত ভোটের অধিকার পায়নি, তারাও বোধহয় আর নেই ; সেই সময় নেই, সেই অস্থিত উদ্দীপনা নেই। আলোক সরকার তখন সদ্য বি. এ. পাশ করা বেকার যুবক, দীপংকর দাশগুপ্ত পুরোপুরি বেকার নয়, দৈনিক 'গণবার্তা'য় সাংবাদিকতা-বিষয়ে শিক্ষানবিশী ক'রে মাসিক দশ টাকা হাতখরচ পায়। সকালবেলায় এলোমেলো ভ্রমণ, সঙ্গে তরুণ মিত্র, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অজিত বক্সী, অশেষ চট্টোপাধ্যায়, বিমল রায়চৌধুরী সত্যেন্দ্র আচার্য, বিকেলবেলায় আড্ডা জমে আলফাতে। সরু গলির মতো ছোট্ট এক চায়ের দোকান, দিনের আলো ফুরুতে-না-ফুরুতে সেইখানে এসে হাজিরা দেয় উজ্জ্বল নয়ন, আদর্শনিমগ্ন তরুণেরা—সেইখানে কবি আছে, গল্পকার আছে, চিত্রশিল্পী আছে, সঙ্গীতজ্ঞ আছে, রাজনীতিজ্ঞ আছে, আছে এমনকি খুন-জখম-ওস্তাদ গুণ্ডা। সকলেই অপ্রতিষ্ঠ, সকলেরই চোখে স্বপ্ন, বুকে অতৃপ্তি কিন্তু হতাশা নয়, হতাশাজনিত অবসাদ নয়, বিদ্বেষ নয়, চওড়া বুকে সবকিছুকেই গ্রহণ করতে হবে, খোলা চোখে যা-কিছু দেখার আছে দেখতে হবে। সে এক উদ্দীপ্ত সময়, মাঝে-মাঝে উৎসবের সময় বলে মনে হয়, মহীশূর রোডের মোড়ের চায়ের দোকানের মতো সেই সময়ের মানুষেরা কোন ঘড়ির দোকানের শিকার হলো, ভাবি।

সবকিছুই পরিবর্তনশীল কিন্তু মহীশুর রোডের মোড়ের সেই চায়ের দোকানে 'শতভিষা'র প্রথম পরিকল্পনার সময় আমরা যে উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম তার মৌল কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। কবিতার কাগজ বের করতে হবে যার লক্ষ শুধু কবিতাই। কবিতার কাগজ বের করতে হবে কেবল আধুনিক কবিতার জন্য—আধুনিকতা অর্থাৎ প্রবহমানতা,

যে প্রবহমানতাকে মেনে নিয়ে বিশ্বপ্রকৃতি বারেবারেই ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত নতুন, সেই ব্যক্তিকতাই হবে আমাদের অন্বিষ্ট। 'শতভিষা' তরুণ কবিদের মুখপত্র নয়; প্রবীণ কবিদের মুখপত্র নয়, কবিতার ব্যাপারে বয়স-বিচার হাস্যকর; 'শতভিষা' কবিতারই মুখপত্র, যে কবিতা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে না, ফ্যাশনের দাসত্ব করে না, হুজুগে মাতে না, যে-কবিতা ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত, একই সঙ্গে সৌন্দর্যময় অপূর্ব এবং অ-পূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতার প্রজ্ঞা প্রমাণ করতে সক্ষম। আমাদের পরিকল্পনা এইরকম কিন্তু সেই পরিকল্পনাকে কেমন ক'রে রূপ দেবে এই নিয়ে সেই দিন দুইজন তরুণ বিশেষ ভাবিত হয়েছিলো। প্রথম প্রয়োজন অর্থের, ঠিক হলো কাগজ বার হবে এক ফর্মার অর্থাৎ ডিমাই সাইজের যোলপাতার, খরচ পড়বে সবমিলিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। টাকা সংগ্রহ হবে কেমন ক'রে? দীপংকরের মাসিক দশ টাকা আয় আছে, আমার পোস্ট-অপিসে দশ টাকার একটা অ্যাকাউন্ট ছিলো তার থেকে পাঁচ টাকা তোলা গেলো, তরুণ মিত্র দিলো তিন টাকা, সত্যেন মুখোপাধ্যায় তিন টাকা, রণজিৎ সেন তিন টাকা—চব্বিশ টাকা দিয়ে কাজ শুরু হলো।

আলফা কাফের অধিকাংশ সদস্যকেই জানানো হ'লো না ব্যাপারটা, আমরা গোপনে কাজ করতে থাকলুম, উদ্দেশ্য একদিন সকলকে চমক দেওয়া যাবে। দীপংকরের সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় আছে, তাঁর কাছ থেকে একটি কবিতা সংগ্রহ করা গেলো, অরুণকুমার সরকারের একটি কবিতা চুরি করলুম, তরুণ মিত্র অশোক মুখোপাধ্যায়ের মাস্টার-মশাই নরেশ গুহ, তাঁরও একটি কবিতা পাওয়া গেলো। মৃণালকান্তি, এখন পরমানন্দ সরস্বতী, তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত, গৌতম রায় তার একটি কবিতা নিয়ে এলো। অরবিন্দ গুহ, যিনি কেবল আলফা কাফেরই নন, বাংলাদেশের তৎকালীন তরুণ কবিদের মধ্যে সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত, কিছু না জানিয়েই তার কাছ থেকে একটি কবিতা নিয়ে নিলুম। পাওয়া গেলো কল্যাণ সেনগুপ্তর কবিতা, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের কবিতা, ইস্কুলের ছাত্র মানস রায়চৌধুরীর কবিতা। আলফা কাফের অনেক ভিড়ের মধ্যে তখন একজন তরুণ, নাম শংকর চট্টোপাধ্যায়,

আসতেন। বাইরে শুনেছি সে নাকি ভীষণ দামাল ছেলে কিন্তু আলফা কাফের এককোণায় চুপচাপ বসে থাকতো, কখনো আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সাহিত্যালোচনা করতো। আশুতোষ কলেজের পত্রিকায় একটি গল্প ছাপা হয়েছে, কবিতা-টবিতা লেখার অভ্যাস আছে ব'লে জানি না। একদিন রাতে, ল্যান্সডাউন রোডের ল্যাম্পপোস্টের আলোর নীচে লজ্জা-লজ্জা মুখে আমাকে একটি কবিতা দেখালো, স্বরচিত কবিতা। কিছু না ব'লে কবিতাটা নিয়ে নিলুম, 'শতভিষা'র প্রথম সংখ্যায় ছাপতে হবে;

এ-সব ১৯৫১ সালের ঘটনা, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। 'শতভিষা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলফা কাফেতে হৈ-হৈ পড়ে গেলো, আমাদের অগ্রজ কবিরা, আলফা কাফের বাইরের তরুণ কবিরা অভিনন্দন জানালেন। সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন অনেকে, শংকর তো আছেই সঙ্গে সত্যেন আচার্য। ছোট্ট এক ফর্মার কাগজ, ওপরে প্রেস থেকে ধার করা ব্লকের ছবি, সূচীপত্র নেই, পাতার নম্বর নেই তবু তার প্রতি অসংখ্যের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। অগ্রজদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ নানা পরামর্শ দিলেন, সক্রিয় সহযোগিতা করলেন। মনে আছে ঢাকায় পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন নরেশ গুহ, পত্রিকার ছাপা কেমন ক'রে ভালো করা যায় সে-বিষয়েও সুপরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সত্যেন দত্ত রোডের বাড়িতে আমি আর দীপংকর দীর্ঘসময় কবিতা নিয়ে আলোচনা করতুম।

'শতভিষা'র সমস্ত পরিকল্পনাটাই দীপংকর দাশগুপ্তর। খরচের টাকা যেমন প্রায় সবটাই তিনি দিতেন, সেই রকম 'শতভিষা'র প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন তিনিই। আমি প্রধান পরামর্শদাতা, সঙ্গে তরুণ মিত্র। কবিতা-ব্যাপারে আমার সঙ্গে দীপংকরের মতের অমিল প্রায় ঘটতোই না, আজ পর্যন্ত সেই অবস্থা অটুট আছে। তরুণ মিত্র, আমাদের মধ্যে সবচাইতে পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদেশী সাহিত্য-বিষয়ে আমাদের সবসময় ওয়াকিবহাল রাখতেন। 'শতভিষা'র পরিচালনা ব্যাপারে ভিতরের দিকে আমরা এই তিনজন বাইরের দিকে অসংখ্য কবি এবং অকবি বন্ধুর শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা।

সবচাইতে বেশি মনে পড়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি কেবল 'শতভিষা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিই নন, প্রথম থেকেই তিনি 'শতভিষা'র আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে। বীরেনদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমরা লেখা সংগ্রহ করতাম তৎকালীন প্রবীন কবিদের, বীরেনদাই আমাদের নিয়ে যেতেন জীবনানন্দ দাশের কাছে, বিষ্ণুদের কাছে। বীরেনদার সূত্রেই আমাদের যোগাযোগ ঘটে ক্রান্তিপ্রেসের সঙ্গে, সেখানে অল্পটাকায় 'শতভিষা' ছাপার বন্দোবস্ত করে দেন তিনি। অদ্ভুত কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা বীরেনদার, 'শতভিষা'কে তিনি সহজেই আপন ক'রে নিয়েছিলেন। ঠিক এইরকমই 'শতভিষা'র নিকটজন ছিলো শংকর চট্টোপাধ্যায় আর সত্যেন্দ্র আচার্য। প্রেস ছাপার কাজে দেরি করলে শংকর আছে, কাগজওলা পত্রিকা বিক্রির টাকা না দিতে চাইলে শংকর আছে। সত্যেন লাজুক প্রকৃতির কিন্তু 'শতভিষা'র প্রচারের ব্যাপারে অর্থাৎ স্টলে কাগজ দেওয়ার ব্যাপারে (যে কাজে আমার বা দীপংকরের কোন যোগ্যতাই ছিলো না) বরাবরই উৎসাহী কর্মী। আর একজনের কথা মনে পড়ছে, অতীব তরুণ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শতভিষা' তার কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছে।

'শতভিষা' প্রকাশ হবার কিছুদিনের মধ্যেই 'শতভিষা'র মতো ক্ষুদ্র আকারের ষোলো পাতার কবিতার কাগজ পরপর অনেকগুলি প্রকাশিত হলো। মোহীন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতা পত্রিকা', সত্যেন্দ্র আচার্য অমিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সব শেষের কবিতা' ভূমেন্দ্র গুহরায় স্নেহাকর ভট্টাচার্যর 'ময়ূখ'। আক্ষরিক অর্থে বাংলা সাহিত্যে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সূত্রপাত হলো। কিছুদিন পর একটু বড়ো আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো আনন্দ বাগচী দীপক মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস'। 'শতভিষা' প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো পাতার কবিতার কাগজ কতো যে প্রকাশিত হয়েছিলো তার হিশেব-নিকেশ করে কুলিয়ে ওঠা যাবে না। আজ আর এ-কথা স্বীকার করতে কষ্ট হয় না, পঞ্চাশের পর বাংলা দেশের কবিতা আন্দোলন এই সমস্ত ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে, কোনো বাণিজ্যিক পত্রিকার সহায়তা লাভ অথবা মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

১৯৫১ সালে কেন আমরা 'শতভিষা' প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম সে

আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা বিশেষ সময় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমি যা বলতে চাইবো তার স্বপক্ষে সব দলিল ঠিক এইমুহূর্তে উপস্থিত করতে পারবো না, যখন পারবো তখন বিষয়টি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করবো। এখন কেবল এইটুকু বলি, 'শতভিষা', কেবল 'শতভিষা' নয়, এইধরনের ক্ষুদ্র কবিতা পত্রিকাগুলির প্রয়োজন তখন অপরিহার্য ছিলো। 'শতভিষা' প্রকাশের আগে বাংলা দেশে মাত্র দু-টি কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হতো—একটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' অপরটি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক'। বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' পত্রিকা, যার প্রতি তৎকালীন তরুণ কবিদের শ্রদ্ধা এবং আস্থা গভীর ছিলো, সেই সময় তা-ও আর নতুন কবিদের কাব্যভাবনা এবং কাব্যকলা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলো না, সেই সময়কার তরুণ কবিদের কবিতার সংকলন 'সমকালীন বাংলা কবিতা'র সমালোচনায় নতুন যুগের সঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকার ব্যবধান স্পষ্ট হয়। অবশ্য তরুণ কবিরা অনেকেই 'কবিতা'-র লেখক ছিলেন, এমনকি 'শতভিষা' যে-সমস্ত তরুণ কবিদের রচনা প্রকাশে আগ্রহী ছিলো তাদের লেখাও মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হ'তো 'কবিতা'য়। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' সেই ধরণের কবিতা বিষয়েই পক্ষপাত প্রমাণ করতো যা তিরিশের দশকের কবিদের-ই প্রতিধ্বনি, নতুন কোনো কাব্য আন্দোলন যে শুরু হ'তে পারে এমন ধারণা 'কবিতা' পত্রিকার ছিলো না। এই অবস্থায় 'শতভিষা' যা আধুনিকতাকে প্রবহমানতা-র অর্থেই এক দিক থেকে গ্রহণ করেছিলো, তার প্রকাশ যে বিশেষ প্রয়োজনের ছিলো সেটা বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু এ সব আলোচনা অনেক তর্ক-বিতর্কের ব্যাপার, আমি আবার 'শতভিষা'র ঘরোয়া আলোচনায় ফিরে যাই। আমার ইচ্ছে ছিলো 'শতভিষা'র প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলা কবিতা বিষয়ে একটা দীর্ঘ আলোচনা করবো—তৎকালীন কবিদের ছন্দ-বিষয়ে উন্মুখর আগ্রহ, শব্দ-বিষয়ে একনিষ্ঠ পরিশ্রম, পূর্ববর্তী কালের কবিদের যৌনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজ-ভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি লক্ষণগুলির সযত্ন পরিহার—এইসব প্রবণতা-গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো কিন্তু তা করতে হলে অনেক বড়ো প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন, আমি বরং আপাতত ঘরোয়া কথাতেই ফিরে যাই।

১৯৫১-এর সেপ্টেম্বরে 'শতভিষা'র প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়, তার ঠিক তিনমাস পরেই দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হলো। প্রথম দিকে আমরা নিয়মিত ছিলুম। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদপট রচনা করলেন অশেষ চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পাওয়া গেলো; পুরোনো আনন্দবাজার পত্রিকার আপিসে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলুম, ব্যস্ত থাকায় তিনি কবিতা দিতে পারলেন না, কিন্তু প্রচুর উৎসাহ দেখালেন 'শতভিষা' বিষয়ে। দ্বিতীয় সংখ্যায় আরো অনেক নতুন কবি এলো—বটকৃষ্ণ দে, রবীন্দ্র বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র আচার্য, কবিতা সিংহ ইত্যাদি।

'শতভিষা'র তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের আগে দীপংকর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কাছে কবিতা চেয়ে একটি চিঠি লেখে। অলোকরঞ্জন তখন 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, আমাদের সঙ্গে আলাপ নেই কিন্তু আমরা সকলেই তার রচনার বিশেষ অনুরাগী। দীপংকরের চিঠি যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে কবিতা এলো, "আমার ঠাকুমা"। মনে আছে, পাণ্ডুলিপি দেখতে দেখতে দীপংকর সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলো, দেখেছেন, 'ভৎর্সনা' বানানে 'ৎ'র মাথার উপর রেফ ব্যবহার করেছে। এই রকমই ছিলুম তখন আমরা। বানান বিষয়ে অতি সচেতন, ছন্দ শব্দ বিষয়ে অতি সচেতন। কিন্তু সংস্কারাবদ্ধ নয়। একই সঙ্গে বিদ্রোহী এবং শিকড় সচেতন। বানান বিষয়ে ছন্দ বিষয়ে দীপংকর চিরদিন কট্টর আধুনিক কিন্তু সেই আধুনিকতা কোনো উন্মত্ততা নয়, যুক্তিবহ শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রমঅগ্রসরমানতা, নির্বোধ অশিক্ষিত ভেঙেচুরে দেবার প্রয়াস নয়। মনে আছে, একবার অলোকরঞ্জন 'বাঁশি' বানানে দীর্ঘ ই কার ব্যবহার করেছিলেন, ছাপাবার সময় দীপংকর হ্রস্ব ই ক'রে ছাপেন। এইনিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে খুব সাময়িক ছোটো-খাটো একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

আমরা চাইতুম জীবনানন্দ দাশ বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমাদের পত্রিকায় কবিতা লিখুন কিন্তু কাছে গিয়ে কবিতা চাইবার সাহস হ'তো না। ল্যান্সডাউন রোডে জীবনানন্দ-র বাড়ির সামনে দিয়ে আমরা দিনে অন্তত আটবার যাওয়া আসা করতুম কিন্তু ভিতরে যেতে ভয় হতো। তখন তরুণ কবিদের কাছে জীবনানন্দর কবিতা মন্ত্রের মতো, তা একই

সঙ্গে আচ্ছন্ন করে, উদ্দীপ্ত করে। অনুপ্রেরিত করে। সেই সময় দীপংকরকে আমি বলেছিলুম, জীবনানন্দর কবিতা আমি পড়তে চাই না, তা আমার ভিতরের সব ঘর বাড়ি গ্রাস করে। সেই সময় আর একজন কবি ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। একই রকম প্রতিপত্তি, একই রকম প্রভাববিস্তার। জীবনানন্দ অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে, আমরা এঁদের যেমন শ্রদ্ধা করতুম, ঠিক সেই রকমই এদের প্রভাব-বিষয়ে সতর্ক থাকতুম। ১৯৫১—৫২ সাল, তখনও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তরুণ কবিদের কাছে বিশেষ আলোচিত নাম নয়, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা যে কোনো কারণেই হোক তরুণদের তেমন আলোড়িত করতো না।

জীবনানন্দর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে-যেতে একদিন সাহস করে এগিয়ে যাওয়া গেলো। সরুগলি দিয়ে ঢুকে দরজার কড়া নাড়তে বেরিয়ে এলেন উঁচু ক'রে কাপড়-পরা, কাপড়ের খুট গায়েজড়ানো এক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। এই জীবনানন্দ দাশ, রাসবিহারী এভিনিউ-র পথে অসংখ্যবার দেখেছি, কাপড়ের কোঁচা শক্ত হাতে ধ'রে আড় চোখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে পথ চলছেন। 'শতভিষার' জন্য কবিতা চাইতে বল্লেন, আর কে কে লিখছে, প্রেমেন লিখছে? আমি বললুম, উনি তো কবিতা আর তেমন লেখেন না, গান লেখেন। শুনে দেড় মিনিট ধ'রে এক অলৌকিক হাসি হাসতে থাকলেন, সে হাসিতে সমস্ত শরীর কাঁপে, দাঁত দেখা যায় না। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বল্লেন, এক সপ্তাহ পর কবিতা দেবো।

ঠিক এক সপ্তাহ পরেই দিয়েছিলেন। আমরা যতোবার তাঁর কাছে কবিতা চেয়েছি, কখনো ফেরাননি। শেষ দিকে আমাদের সঙ্গে মোটামুটি চেনা-জানা হয়ে গিয়েছিলো, শংকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা; প্রায়ই বাড়ি দেখে দেবার কথা বলতেন, কদাচিৎ কবিতার কথা।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রথম কবিতা খুব সহজে পেলেও জীবনানন্দর কাছে কবিতা চাইতে যেতে আমাদের ভয় করতো। দ্বিতীয়বার কবিতা চাইতে যাওয়ার আগে আমরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিলুম। বীরেনদা কিছুদিন আগে জীবনানন্দ বিষয়ে একটি ছোট মন্তব্য লিখেছিলেন। সেখানে জীবনানন্দর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ফাঁকে 'লোকটা যে

দেখতে হাবাগোবা, আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বহীন' এ-কথাও ছিলো। আমরা জীবনানন্দর বাড়িতে এলুম, বীরেনদা সঙ্গে আছেন বলে একেবারে বাড়ির মধ্যে, এর আগে জীবনানন্দ গলির মুখে দাঁড়িয়েই কথা সেরে নিতেন। আমরা ঘরে বসে আছি, একটু পরে জীবনানন্দ ঘরে ঢুকলেন, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছা, খালি গা, দু'হাতে দু'বালতি জল। জল ঘরের কোণে রেখে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, কী চাই, বীরেনদার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আমরা তাঁর হাতে 'শতভিষা' দিয়েছি, বীরেনদা আমাদের সঙ্গে জীবনানন্দর ভালো ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এলেন, কী বলতে চাইলেন, আর সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটলো। 'শতভিষা'গুলো ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে জীবনানন্দ বীরেনদার দিকে প্রায় তেড়ে এলেন—'আমার ব্যক্তিত্ব নেই! কী লিখেছেন আপনি? জানেন আমি বাইশ বছর অধ্যাপনা করছি।' বীরেনদা বোঝাবার চেষ্টা করছেন, জীবনানন্দর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা যে কতোটা নিবিড় সে-কথা বলছেন, কিন্তু ক্ষিপ্ত, প্রায় উন্মত্ত জীবনানন্দ। তারপর হঠাৎ শান্ত হলেন, নিজেই 'শতভিষা'গুলো কুড়িয়ে নিলেন ঘরের মেঝে থেকে, বল্লেন, সাতদিন পরে এসো, কবিতা দেবো।

সাতদিন পরেই দিয়েছিলেন। আর কবিতা দেওয়ার পর পাঁচ মিনিট, যদি না তার বেশি হয়, মুখ বন্ধ ক'রে, সারাশরীর কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। হাসির কারণ কি? দীপংকর বলেছিলো, উনি বলতে চাইছেন, কেমন দেখলে আমার ব্যক্তিত্ব!

বিষ্ণু দে-র বাড়িতে যেতেও আমাদের কম ভয় ছিলো না। বিষ্ণু দে জীবনানন্দ-র ঠিক উল্টো। সাজানো ঘর, সুন্দর শোভন সাজপোশাক। বিষ্ণু দেও আমাদের কখনো নিরাশ করেননি, যখনি কবিতা চেয়েছি, দিয়েছেন। যেমন বুদ্ধদেব বসু। প্রুফ দেখাবার কঠোর নির্দেশ থাকলেও কবিতাভবন থেকে কখনো খালি হাতে ফিরিনি।

'পূর্বাশা' আপিসে গিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের লেখা নিয়ে আসতুম। শান্তি-নিকেতনে চিঠি পাঠিয়ে সুনীলচন্দ্র সরকারের। প্রথম দিকে মণীন্দ্র রায় ছিলেন আমাদের নিয়মিত লেখক যেমন ছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালের শেষদিকে 'শতভিষা'র পঞ্চম সংকলন প্রকাশের আগে আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নামের একজন কবির কবিতা পাই। তাঁর নাম আগে কখনো শুনিনি কিন্তু কবিতা প'ড়ে দীপংকর উচ্ছ্বসিত। এরপর থেকে যখন-ই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা এসেছে, দীপংকরের সমান উচ্ছ্বাস দেখেছি। কিন্তু ঠিক এই রকম হয়নি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বেলায়। 'শতভিষা'র জন্য পাঠানো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা দীপংকর প্রকাশ করতে ঠিক সম্মত ছিলো না। আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে। কবিতাটি 'শতভিষা'য় প্রকাশ হবার অনেক দিন পরে কথাপ্রসঙ্গে শক্তি একদিন বলেছিলেন ওটি তাঁর তৃতীয় ছাপা কবিতা। শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'শতভিষা'য় অনেক পরে ছাপা হয়। আমরা তাঁর কবিতা পেতে চাইতুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিলো না, তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করতে করতেই 'শতভিষা'র অনেকগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেলো। প্রথমদিকে আমাদের পত্রিকায় প্রায়ই লিখতেন শিবশম্ভু পাল মোহিত চট্টোপাধ্যায় আর শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। ফণিভূষণ আচার্যের কবিতাও 'শতভিষা'য় প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছিলো। অন্য একটি পত্রিকায় ফণি লিখেছেন ওটি তাঁর প্রথম ছাপা কবিতা।

উৎপলকুমার বসুর যে সব কবিতা 'শতভিষা'র প্রথম দিকে ছাপা হয় তা পড়ে আজকের দিনের পাঠক উৎপলের কবিতা বলে চিনতেই পারবে না। উৎপল মহিলার ছদ্মনামেও 'শতভিষা'য় কবিতা লিখেছেন। বিনয় মজুমদার 'শতভিষা'র একেবারে শেষদিকে 'শতভিষা'য় কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং প্রচুর লেখেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 'শতভিষা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিলো না। পরিচয় হয় ১৯৫৩-র শেষের দিকে। এবং এর-ই কাছাকাছি সময়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত-র সঙ্গে। আলাপ হবার পর এঁরা দু'জনেই 'শতভিষা'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'য়ে ওঠেন। ১৯৫৪ থেকেই প্রণবেন্দু 'শতভিষা'র নিয়মিত লেখক, কেবল লেখকই নন, 'শতভিষা'কে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তিনি। ১৯৫৪-৫৮, 'শতভিষা'কে ঘিরে আছে অলোকরঞ্জন, প্রণবেন্দু, তরুণ মিত্র দীপংকর আর আলোক সরকার। লেকের পাড়ে, দেশপ্রিয় পার্কের মাঠে, অলোকের যাদবপুরের বাড়িতে তখন নিয়মিত বৈঠক। প্রণবেন্দু তখন কলেজের নিচু ক্লাসের ছাত্র, 'শতভিষা'য় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা আলোক সরকারকে

উৎসর্গ করা হয়। সেই কবিতার শেষ লাইনে 'কাম' শব্দটি ছাপার ভুলে 'কাজ' হয়ে যায়। প্রণবেন্দুর ধারণা সেটি ইচ্ছাকৃত। ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কোনো ভিত্তিই নেই।

এ-ঘটনার উল্লেখ এ-কারণেও প্রয়োজন যে 'শতভিষা' সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে—'শতভিষা' ইন্দ্রিয় বিশেষ ক'রে প্রথম ইন্দ্রিয়-উত্তেজক কবিতার বিরোধী। তা একেবারেই নয়। 'শতভিষা' কেবল মনে করতো, কবিতা রচনায় কোনো একটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া নিরতিশয় নির্বুদ্ধিতা, কবিতা সবকিছু নিয়েই লেখা চলে। তাছাড়া তিরিশের চল্লিশের কবিদের রচনায় 'কাম' বিষয়টি এতো বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে 'শতভিষা' তা নিয়ে আর তেমন উৎসাহবোধ করতো না। কবিতার অগ্রগতির জন্য নতুন, নতুন এবং ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, শতভিষা এটা বুঝেছিলো। কাম বিষয়ে তার অনীহা ছিলো না; অতিরিক্ত উৎসাহও ছিলো না যেহেতু বিষয়টি ব্যবহারে ব্যবহারে হেজে মজে গিয়েছে। বস্তুত প্রণবেন্দু সেকথা যে জানতেন না,এমন নয়। কবিতাকে আরো বড়ো উন্মুক্তির পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা তখন দিবারাত্র ইউরোপের, বিশ্বের কাব্যচিন্তা, কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছি—ভালেরি আমাদের মাতাচ্ছে, রিলকে আমাদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে, মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে মালার্মের কাব্যাদর্শই বুঝি একমাত্র। প্রণবেন্দু, অন্তত আলোক সরকারকে এ-বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, প্রণবেন্দুর মনে থাকতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর নাম মনে পড়ছে, তাঁর কাছেও 'শতাভিষা' বিশেষভাবে ঋণী। ১৯৫৬-এ 'শতভিষা'য় প্রথম কবিতা প্রকাশের পর থেকেই সমরেন্দ্র আড়াল থেকে 'শতভিষা'কে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি নিজে এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা করার বিপক্ষে, আমিও আর কিছু লিখলুম না। কুমার রায়ের সহযোগিতার কথাও এই প্রসঙ্গে 'শতভিষা' স্মরণ করছে।

১৯৫৩-র মাঝামাঝি সময় থেকেই আলফার আড্ডা ভাঙতে সুরু করে। আমরা একে একে এসে আশ্রয় নিই লেক মার্কেটের দোতলার এক রেষ্টুরেণ্টে। সে আড্ডাও বেশিদিন টেঁকে না, দোকানটাই উঠে যায়। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আর তেমন একত্র হই না, কিছুটা আত্মকেন্দ্রিকতা, কিছুটা জীবিকা অর্জনের তাগিদে সকলেই নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। 'শতভিষা' তখনও

আমাদের অনমনীয় উৎসাহে প্রকাশিত হচ্ছে, বছরে চারটের জায়গায় বছরে দুটো। পুরোনো বন্ধুদের ফাঁক পূরণ করছেন নতুন বন্ধুরা, এলেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছুদিন পর তারাপদ রায়। ১৯৫৭ সালে তারাপদ রায়-র প্রায় গ্রাম্য অমার্জিত ব্যবহারে আমরা তাকে একটু ভয়-ই পেতুম কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারাপদ আমাদের নিবিড় বন্ধু হলেন। সেই সময় তারাপদ-র মতো মুক্তপ্রাণ জীবনময় ব্যক্তি খুব কমই ছিলো। শংকরের মতো, কবি-বন্ধুদের প্রয়োজনের সময় সাহায্যের জন্য তারাপদ নিজেই এগিয়ে আসতো,তাকে অনুরোধ করার দরকার হ'তো না। তারাপদর মধ্যবর্তিতাতেই আলাপ হয় সুধেন্দু মল্লিকের সঙ্গে, 'শতভিষা'র সঙ্গে সুধেন্দুর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নিজের পত্রিকা ছিলো, 'কবিপত্র', কিন্তু 'শতভিষা'র সঙ্গে তারও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে আরো তরুণ নবীন কবিদের ভালোবাসায় 'শতভিষা' সমৃদ্ধ হয়—মৃণাল দত্ত, আশিস সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, কালীকৃষ্ণ গুহ, অশোক দত্তচৌধুরী, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুনীথ মজুমদার, রথীন্দ্র মজুমদার, সুব্রত রুদ্র, রাণা চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। 'শতভিষা'র প্রতি মৃণাল দত্তর নীরব ভালোবাসার পরিচয় 'শতভিষা' অনেকবার পেয়েছে। কালীকৃষ্ণ, অশোক, সুনীথ, রাণা, রথীন, বুদ্ধদেব এরা 'শতভিষার' একান্ত আপনজন। কালীকৃষ্ণর ভালোবাসার উষ্ণতা 'শতভিষা'র কাছে প্রেরণার মতো কাজ করেছে। ১৯৬৫, শতভিষা আর একজন তরুণ কবির ভালোবাসা পেলো, পার্থ রাহা। পার্থ যে-ভাবে 'শতভিষা'কে সাহায্য করেছে তেমন ক'রে খুব বেশি তরুণ কবি করেনি। পার্থ 'শতভিষা'র অনলস স্বার্থহীন কর্মী, নিকট আত্মীয়। পার্থই নিয়ে যায় ভুলুবাবুর প্রেসে। ভারী সুন্দর মিষ্টি মানুষ ছিলেন ভুলুবাবু, তার সঙ্গে আর দেখা হয় না।

১৯৫৫—৫৬ সালে 'আধুনিক কাব্য পরিচিতি' সিরিজ নাম দিয়ে 'শতভিষা' অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে। অরবিন্দ গুহ সুকুমার রায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত শান্তিকুমার ঘোষ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাঁচজনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একই সময়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আলোক সরকারের 'ভিনদেশী ফুল'ও প্রকাশিত হয় 'শতভিষা' থেকে। পরে 'শতভিষা' থেকে প্রকাশিত হয় রথীন রাণা কালীকৃষ্ণ আলোক সরকারের কবিতার বই।

১৯৬৪ সালে 'শতভিষা'র উদ্যোগে কাব্যনাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সবশুদ্ধ আমরা সাতটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলুম। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রথম নায়ক', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর 'উত্তর মেঘ', দীপক মজুমদারের 'বেদানার কুকুর ও অমল', সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর 'হিসাব', আলোক সরকারের 'অশথ গাছ' ও 'মায়াকাননের ফুল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ফাঁকি'। এই নাটকগুলি অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন সমীর ঘোষ। সাতটি নাটকের ছটিরই পরিচালক ছিলেন তিনি, অলোকরঞ্জনের নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

১৯৬৪-তে 'শতভিষা' নতুন উদ্যমে বার করবার চেষ্টা করি। পত্রিকার আকার অনেক বড়ো, পরিকল্পনাও বিস্তৃত। দীপংকর তরুণ তো আছেই, প্রণবেন্দু সমরেন্দ্র কুমার রায়ও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। এইভাবে কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তারপর ১৯৬৮-তে অভিরূপ এসে 'শতভিষা'য় যোগ দেয়। অভিরূপ ইস্কুলের ছাত্র কিন্তু তার সক্রিয় সাহায্য না পেলে 'শতভিষা' তখন প্রকাশ করাই সম্ভব ছিলো না। আমি ভিতরে ভিতরে তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, প্রুফ দেখা প্রেসে দৌড়োদৌড়ি অভিরূপ ছাড়া আর কেই-বা করবে! এইভাবেই কয়েকবছর এবং আমার ক্লান্তি আমার অবসাদ আরো ঘনীভূত। ঠিক সেই সময় এলো তরুণ কবি সুরজিৎ ঘোষ, যে না এলে 'শতভিষা'র প্রকাশ চিরদিনের জন্যই বন্ধ হয়ে যেত। সুরজিতের সঙ্গে 'শতভিষা'র পরিচয় করিয়ে দেন অলোকরঞ্জন, তার দু-একটি কবিতা 'শত-ভিষায় প্রকাশিত হয়েছে, সেই 'শতভিষা'র সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলো, সঙ্গে অভিরূপ। এ-কাজ একদিকে যেমন সাহসের, তেমনি 'শতভিষা'র প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসাও প্রমাণ করছে। 'শতভিষা' তাদের শ্রম এবং আন্তরিকতায় যে ক্রমশই পরিণত সার্থক হয়ে উঠছে এ-কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমরা যা চেয়েছিলুম অথচ পারিনি, সুরজিৎ-অভিরূপ আমাদের সেই স্বপ্নকেই সফল ক'রে তুলছে।

'শতভিষা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর পঁচিশ বছর পার হয়ে গেলো, 'শতভিষা'র রজতজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হতে চলেছে। অনেক আনন্দ অনেক সার্থকতা অনেক বেদনা অনেক ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে এই দীর্ঘ সময় পার

হওয়া। সে আলোচনা করতে চাই না, নতুন সম্পাদকদের হাতে 'শতভিষা' আরো অনেক দিন এবং আরো সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হবে, সন্দেহ নেই। আমরা যতদিন 'শতভিষা' প্রকাশ করেছিলুম তার সত্যিকারের কোনো সার্থকতা কোথাও আছে কিনা জানি না, কেবল এটুকুই বুঝতে পারি আমাদের যতো সাধ ছিলো সাধ্য ততোটা ছিলো না। অল্প পরিসর, অনিয়মিত প্রকাশ এইসব কারণে কোনো কবির প্রতিই আমরা অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে পারিনি। এ ছাড়া 'শতভিষা'র বিলি ব্যবস্থা বিশেষ দুর্বল ছিলো, কোনো রকম অতিকথন অমিতকথন পছন্দ না করায় 'শতভিষা' কোনোদিনই যাকে বলে হৈ হৈ তা করতে পারে নি। এই কারণেই হয়তো অনেক কবি, যাঁরা 'শতভিষা'কে প্রথম দিকে আশ্রয় করেছিলেন, 'শতভিষা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরে অন্যত্র চলে গেলেন। তবু গোপনে সকলেই 'শতভিষা'কে ভালবাসে, 'শতভিষা' এটা জানে, আজ রজত জয়ন্তী উৎসবে শতভিষা তাদের ভালোবাসাকে স্মরণ করছে।

আলোক সরকার

প্রেক্ষিত

'শতভিষা'র পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। তার তেইশ বছর বয়েস থেকে সম্পাদক হিসেবে আমাদের নাম যুক্ত—অভিরূপের আর আমার। ভালোবাসার যন্ত্রণার মধ্যে যে আনন্দটুকু বিঁধে গিয়ে তিরতির ক'রে কাঁপছে, তাকে কি ক'রে বোঝাই ?

প্রকাশ এখনও অনিয়মিত, কিন্তু নিয়মিত প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন তেমন সংকলন বার ক'রলে বোধহয় ভালো হতো না।

শংকর চট্টোপাধ্যায় চলে গেলেন। এই সংখ্যায় তাঁর নামে প্রকাশিত সংযোজনে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে, কবি জানিয়েছেন সেটি লিখবার সময়ে তাঁর সামনে শংকর ছাড়া আরও কয়েক জনের মুখ এসেছিল প্রসঙ্গত।

কিছু পুরোনো ছবির এলোমেলো সংগ্রহ "পঁচিশ বছরের অ্যাল্‌বাম্‌"। অনেক ধুলো পড়লেও বোঝা যায় সে কত দামী ছিল। এতে শংকর চট্টোপাধ্যায়ের যে কবিতাটির ছবি আছে তা শুধু তাঁর প্রথম প্রকাশিত নয়, প্রথম রচিত কবিতাও বটে।

একই দহনের আত্মীয়তায় অন্বিত বিভিন্ন শিল্প-মাধ্যমের উপরে একটি বিশেষ প্রবন্ধ-সংযোজন 'কবিতা বিকীর্ণ শিল্প'।

এবারের 'কবিতা' সংগ্রহের কবি-নির্বাচনে পঁচিশ বছরের স্মৃতি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। দুঃখ রয়ে গেল, অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে উৎপল কুমার বসু বা বিনয় মজুমদারের কবিতা সংগ্রহ ক'রতে না পারার জন্য।

পত্রিকার চারিত্রিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে নিয়মিত বিভাগগুলি সবই রইল। সঙ্গে রইল দুটি বিশেষ রচনা।

নন্দলাল বসুর চিঠিটির জন্য কৃতজ্ঞতা বিশ্বজিৎ রায়-এর কাছে। চিঠিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের পুরো নাম ব'লে দিয়ে অশেষ উপকার করেছেন শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ। সম্পূর্ণ এই সংখ্যাটির জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন সমস্ত বন্ধুজন। সবচেয়ে বেশী বোধ হয় শ্রীপার্থ রাহা।

সুরজিৎ ঘোষ

পঁচিশ বছরের অ্যাল্‌বাম্‌

পঁচিশ বছরে 'শতভিষা'র পাতায় প্রকাশিত কিছু
স্মরণীয় কবিতা ও গদ্যের এলোমেলো ছবি

সময়ের হাতে তিরিশের দশকের কবিদের ব্যবহৃত কৌশলগুলির দিন যে ফুরিয়ে গিয়েছে 'শতভিষা' তা উপলব্ধি করেছিলো। তিরিশের দশকের কবিদের যৌন-কাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজ-ভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাত-লক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয় এ-সত্য অভ্রান্ত জেনে কবিতার মুক্তির জন্য শতভিষা প্রয়োজন অনুভব করেছিলো নতুন পথ-সন্ধানের। 'আধুনিক ক্লিসে'গুলি পরিত্যাগ করে কবিতার শরীরে নতুন প্রাণস্পন্দন আনার প্রচেষ্টাই ছিলো 'শতভিষা'র প্রথমতম দায়িত্ব।

[সম্পাদকীয় (অংশ) : শতভিষা : ত্রয়স্ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭২]

কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিয়ে বাতি
বল্লে আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী
তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে ;
তবুও দূরে স'রে গিয়ে তুমি
হারিয়ে যেতে চাও কি আত্মপ্রশ্নে ঘুরে ফিরে ?
অথবা জনগণসেবার ভিতরে শিশিরে
লুপ্ত ক'রে দেবে কি জ্ঞানকামীর মরুভূমি ?
সবের উপর সত্য আগুন—অমেয় মোম শুধু ;
আর সকলই শূন্য আশা, অন্ধ অনুমিতির মত ধু-ধু।

[কে এসে যেন : জীবনানন্দ দাশ : শতভিষা : অষ্টম সংকলন : ১৩৬০]

শোনো তবে সই শৈবলিনী
আমি প্রিয় স্বামী নই বলিনি,
আমি ত কুমার তোমার চুমার প্রতাপ কতো
সইব বলোনা শৈবলিনী
কপালকুণ্ডলারে চায় শিখী চণ্ডব্রত
কাপালিক তার হও নলিনী।

হতে যদি তুমি শৈবালিনী !
বৈশালী-বালী কই, মালিনী
মলিন কন্যা হরিৎ বন্যা অন্ধকারে
কই সে হৃদয় শৈবালিনী
দ্বীপের দীপ্তি চোখের প্রদীপ বন্ধ দ্বারে
শ্রীনালনন্দা, বৈকালিনী !

হায় বৈশাখী শৈবলিনী
তক্ষশীলার রুমী বলিনী
কোথায় আষাঢ়-আকাশের দ্যুতি-পবন-জ্বালা
শৈলশিখরে শৈবলিনী
কেন এ প্রেমের আয়াস আয়েষা যবন বালা
হংস-বলাকা-সাধ, দলনী ?

[বাঁকাজাল : সঞ্জয় ভট্টাচার্য : শতভিষা : পঞ্চম সংকলন : ১৩৫৯]

আমার কৈশোরে একদল পাশ্চাত্য দার্শনিক 'স্পীশস্ প্রেসেণ্ট' নাম দিয়ে এক চির-মুহূর্তের কল্পনা করতেন ; এবং আমাদের চেতনা সেই রকম সর্বময় নিমেষে অহরহ আবদ্ধ। তাতে যা কিছু প্রত্যক্ষ, তা তো আছেই, যা দূর, যা অনাগত, যা অতীত, তাও অন্তত ভাবচ্ছবিরূপে উপস্থিত ; এবং সেই 'অবিকল' লহমা আর সোহংবাদীর সলিপ্সিজম্ বোধহয় এক। তবে তার মধ্যে আমরা খুশী হয়ে থাকতে পারিনা : চাঁদ যার সঙ্গে কল্পনা বা বিকল্পনার সম্পর্ক সর্ববাদীসম্মত, সে আমাদের প্রলুব্ধ করে ; সূর্য যার মরীচিকা থেকে উপনিষদের ঋষিরা বাঁচতে চেয়েছিলেন, সে আমাদের বাইরে ডাকে ; অসম্ভূত অমায় নীহারিকা রটায় নূতন সৃষ্টির বারতা ; এবং বিজ্ঞানী বলেন যে আমাদের অন্ত্রে ও নাড়ীতে ধরা পড়ে ভূত থেকে ভবিষ্যতে উধাও কালের পদক্ষেপ। কিন্তু নিজের নাড়ী বা অন্ত্রের দোলকে কালযাত্রার পরিমাপ আমাদের চৈতন্যগত নয়, এবং অন্ধবিশ্বাসের বশেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তথা ভূত প্রকৃতির মধ্যে গতির ও কালাতিপাতের সন্ধান পাই। উপরন্তু সে-সন্ধানের শেষেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাক্ষাত নেই,

আছে বিমূর্ত প্রত্যয়, কিংবা ভাবচ্ছবি। তাহলে চির-মুহূর্তে আটকে থাকতে সোহংবাদীর আপত্তি কি? এবং সে ভোলেই বা কেন যে সে ক্ষণস্থায়ী, তথা নাস্তিরই অংশভাক্।

[একটি চিঠি (অংশ): সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: শতভিষা: পঞ্চত্রিংশ সংকলন: ১৩৭৩]

কোথায়, কোথায় তুমি? আনন্দের আবেশে তোমার
মাতাল, অথচ মোর ক্ষীণ প্রাণে আঁধার ঘনায়।
মনে হয়, এইতো এখনই আমি
শুনেছিনু কেমন সোনালী স্বরে কিশোর পূষণ

তুলেছেন সান্ধ্যসুর পরিপ্লুত স্বর্গীয় বীণায়,
চারিদিকে অরণ্যে শিখরশৈলে তুলে প্রতিধ্বনি।
কিছু দূরে, বহুদূরে, সেখানে তন্ময় সাধকেরা
আজো তাঁর পূজা করে এইমাত্র গিয়েছেন চ'লে।

[হেণ্ডারলিন অবলম্বনে, সূর্যাস্ত: বুদ্ধদেব বসু: শতভিষা: দ্বাদশ সংকলন: ১৩৬১]

কাঙালী! কাঙালী!
কাছারি, বাজারে, দপ্তরে
মূলধন কী লোভে ভাঙালি?

মাঠের মোড়ক চলে খুলে,
টিলায়, সমানে, জলকূলে,
এখনো অনেক জায়গা খালি,
কাঙালী, কাঙালী!

অ-সনাক্ত শাক, পাতলা ফুল,
কড়াই, খেজুর, জাম, কুল—

র'য়েছে গাছের গেরস্থালি
কাঙালী, কাঙালী !

রোদে সেঁকা, ভেজা, হিমে কাঁপা,
বৃহৎ দিবস রাত যাপা…
কি হবে গঞ্জের চতুরালি,
ফিরে যা কাঙালী !

ওরে ফেল, ফেল এঁটোপাতা,
তোরে কিছু দিয়েছে বিধাতা—
নর্দমায় নাই বা আঁচালি,
হায়রে কাঙালী !

বেঁচে যা উদার বে-দখলে
মরে যা পতিতে স্বচ্ছন্দে—
ঠিক তোকে নেবে মাটি বালি,
ওরে ও কাঙালী !

[কাঙালী : সুনীলচন্দ্র সরকার : শতভিষা : একাদশ সংকলন : ১৩৬১]

……গদ্যের পক্ষে বাগ্‌ভঙ্গির অনুসরণ যতখানি প্রয়োজন, পদ্যের পক্ষে তার থেকে আরও বেশী প্রয়োজন,……………………………………………

……………ছন্দোরচনার উদ্দেশ্য হল বিবিধ উপায়ে প্রস্বর, যতি, মাত্রা ও মিল স্থাপনের দ্বারা ভাষায় একরকম তরঙ্গভঙ্গি বা স্পন্দলীলা (rhythm) উৎপন্ন করা। এই স্পন্দলীলাই ছন্দের প্রাণ। দেখা গিয়েছে ছন্দোরচনায় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন না মেনেও কবিতার ভাষায় ছন্দের স্পন্দনটুকু রক্ষা করা যায়। এই প্রকার ছন্দো-বন্ধহীন স্পন্দনময় ভাষাকে গদ্যই বলতে হয়, পদ্য বলা যায় না। তথাপি একটু শিথিল পরিভাষায় কবিতার ভাষার এই স্পন্দভঙ্গিকেই বলা হয় 'গদ্য কবিতার

ছন্দ', সংক্ষেপে 'গদ্যছন্দ'। এইরকম স্পন্দনময় গদ্যভাষাতে কবিতারচনার রীতি প্রচলিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। .....

[বাংলাছন্দের ক্রমবিকাশ (অংশ) : প্রবোধচন্দ্র সেন : শতভিষা :
ত্রিচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৮২]

চেয়েছি আলোর ঘরে এই দিন
দাঁড়িয়ো সিঁড়িতে—প্রীতা,
মাধুর্য সংসারে মঙ্গলিতা
এই দিন।
সানাই নাই বা থাকে, রঙিন পত্রালি শ্লোকধ্বনি,
জেরেনিয়মের সারি, নীচে রাস্তা, কার্নিসের কোণ ঐ জেগে
নীলাক্ষী দিগন্তে ফুল-তোলা
নাইলন জরির পাড় মেঘে মেঘে,
গুঞ্জনিত এরোপ্লেনে দূরদেশী —
তোমার নতুন লগ্ন হোক।

এই দিন
পার হয়ে বহুশ্রুতি জনতার কোটি চিত্রলোক
জটিল সহর চাক শান্ত মুখে ;
দেশের চন্দনী ধূপ-লাগা
প্রবাসী আশ্চর্য খনে
সোনার চাবিতে মনে মনে

দুজনে দরজা খুলো :
সবুজ দেয়ালে শঙ্খ আঁকা
ইলেক্‌ট্রিক আলো নীল সিল্কে ঢাকা
অভিনন্দিত ছোট ঘরে :

উন্মুক্ত সেখানে জেনো এই দিন
চিরদিন,—স্মিতা,
যুগ্মতারা জ্বলজ্বল
তোমার সংসারে মঙ্গলিতা।

[ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্তস্য অমৃতা গৃহে—অথর্ববেদ : অমিয় চক্রবর্তী :
শতভিষা : দশম সংকলন : ১৩৬১]

অনেক দিনের চেনা সে আমার মন
জানি তার প্রায় নিজেরই হৃদয় সম
যতো কিছু কথা শুনেছি দূর আপন
মধুরতম তো তারই, সেই প্রিয়তম

কাছে যবে থাকে, তবু থাকে কতোদূরে
দূরে যবে যায়, কাছের হাওয়ায় নিশিদিন রাখে ভ'রে
আকাশ যেমন ফাল্গুনে সুরে সুরে।

কতোকাল চেনা, তবুও জানা অশেষ
প্রতিদিন তার—আমারও রূপান্তরে,
আমাদের প্রেমে দোঁহার কাল ও দেশ।

আমাদের প্রেম খরতোয়া আর দুই পাড়ে ধারে ধারে
বটের ছায়ায় গ্রামে হাটে বাটে কখনো পাহাড়ে কোথাও শহরে
কোথাও বা প্রান্তরে

এ-জীবনে বুঝি ঢেউ ভেঙে ভেঙে ফুরোয় না তাই রেশ।

আমার জীবন বেঁধেছি তো তার ঘাটে

[আলেখ্য (৩) : বিষ্ণু দে : শতভিষা : অষ্টম সংকলন : ১৩৬০]

তাহলে কেন তিনি এই কঠিন শিল্পের পথ বেছে নিয়েছেন, কেন পুরুষের সজ্জা ও রীতি গ্রহণ করেছেন, এই প্রশ্ন আমার মনে অনিবার্য হয়েছিল। কেন নিজেকে পুরুষের সমভূমিতে দাঁড় করানো, পুরুষ ক্ষমতার সঙ্গে টক্কর দেবার জন্যে নিজের শিল্প-প্রতিভাকে কেন দুর্গমে নিয়ে যাওয়া? তাঁর রমণী-সত্তায় কোথায় এই বৈপরীত্যের ভিত? একি কোনো প্রতিবাদ? মানবিক স্তরে তাঁর জীবনের ইতিকথা শুনবার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়েছিলাম। স্বভাবতই আমার পক্ষে তখন তা শোনা সম্ভব ছিল না এবং তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হবার সম্ভাবনাও ছিল না। অতএব আমি কল্পনা করেছিলাম…রসাতলে যাক আমার কল্পনা, যেখানে রক্তের অতল ঘূর্ণি সেখানে সে কোথায় থই পাবে? আমার শুধু এইটুকুই বলার যে, সেই সন্ধ্যার কারুকক্ষে শিল্পের গুণ সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে ওঠা সত্ত্বেও আমাকে বেশী নাড়া দিয়েছিল শিল্পী। সেকি আমি শিল্প ঠিক বুঝিনি ব'লে, না শিল্পের চেয়ে মানুষ আমাকে বেশী স্পর্শ করেছিল ব'লে, করে ব'লে?

[কেন এই কঠিন পাথর (অংশ) : অরুণ মিত্র : শতভিষা : দ্বিচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৮২)]

'শতভিষা' নামক ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রটির কয়েকটি সংখ্যা একসঙ্গে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় ক'রে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে।…এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে 'শতভিষা'র অন্তর্গত কবিতাগুলি থেকেই বাছাই ক'রে যদি একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহলে বাংলা কবিতার যে স্বতন্ত্র ধারার কথা আমি উল্লেখ করেছি তা পাঠক-সাধারণের কাছে স্পষ্টতর হবে। আপাতত এই গোষ্ঠীর কয়েকজনের প্রতি আমার উৎসাহ না দেখিয়ে পারছি না। যে-কজন কবির কথা উল্লেখ করবো, লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁদের কারুর রচনাতেই জৈব-যন্ত্রণা নেই, অথচ একটা মৌল জীবনবেদনায় তা ওতোপ্রোত। আধুনিক জীবনের বাইরের উপকরণ—যন্ত্র, শহর, শোষিতের সংগ্রাম, বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি এদের কাব্যের উপজীব্য নয়। অথচ একটা সুস্থ মানব-সম্বন্ধের উত্তাপ এদের কবিতায় সার্বজনীন।

স্পষ্টতই সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, অন্য এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। কোন উৎস থেকে, কীভাবে—সেটা সমাজ-তাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হতে পারে কিন্তু নিঃসন্দেহেই এটা চেঁচিয়ে বলবার মতো একটা সদ্‌গুণ। যাঁদের যৌবনকাল অসার রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনায়, অনেক অবদমন এবং ততোধিক অপচয়ের বিশৃঙ্খলায় সংশয়ে যন্ত্রণায় অপব্যয়িত হয়েছে, একালের তরুণ কবিদের প্রশান্তি তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এঁদের রচনার সম্মুখীন হলে বুঝতে পারা যায় স্বাভাবিকতার কোনো স্থির সংজ্ঞা নেই; সভামিছিল এবং শায়াশেমিজের পিছনে ছোটাই সকলকালের সব যুবকের স্বধর্ম হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একালের কবিরা কেউই কিছু চিন্তাহীন আশাবাদ নিয়ে বোকার স্বর্গে বাস করছেন না, মনের যে অসুখ না থাকলে কবিতাই লেখা যায় না তার লক্ষণ এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান, এবং এঁরা কেউই ভূদেব মুখুজ্যের নতুন সংস্করণ নন। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ভিতর দিয়ে আগের যুগের কবিরা যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন, কালধর্মে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় সেখান থেকেই এঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তাই আধুনিক হবার প্রয়োজনে এদের কাউকে নালা-নর্দমায় স্নান করতে হয়নি, নৌকো পুড়িয়ে দেবার ভান করতে হয়নি, আশ্রয় নিতে হয়নি উপরচালাকির।

[বাংলাকবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা (অংশ) : অরুণকুমার সরকার :
শতভিষা : অষ্টাদশ সংকলন : ১৩৬৩]

পাষাণে বুক রাখিস, কল্যাণি
শুনিস মত্ত বাঘিণী ডাকে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত
দেখিস জীবন-মরণ লড়াই রক্তমাখা পায়ের ছাপ ;
বুক জুড়ে তোর তবু তৃষ্ণার জল
নরখাদক পশুর রক্ত ধুয়ে।

[নদী : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শতভিষা : সপ্তত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৬]

শতভিষা

তুমি ফল পাবে ব'লে
এই বৃক্ষ রোপন করছি।
যখন সবুজ পাতা
ঝিকমিক ক'রে উঠবে
শীতশেষ নরম রোদ্দুরে
তখন থাকবো না আমি
তুমি থাকবে, বাতাসও থাকবে,
ক্ষণিক অচেনা পাখি
ডালে ব'সে ফের উড়ে যাবে।
রোজ একটু জল দিও গাছে,
জল দিও।

[আমার ছেলেকে—১ : অরুণকুমার সরকার : শতভিষা : উনচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৭৮]

একই ভাষায় রচিত দুটি রচনার, অথবা একই ভাষাভাষী দুটি সামাজিক গোষ্ঠীর কিংবা পরিবারের বা ব্যক্তির ভাষার, কিংবা দুটি উপভাষার যে পার্থক্য তা কমবেশী উপরের স্তরের। দুটি ব্যক্তির ভাষা যত বিভিন্নই হোক না কেন যদি তাদের ভাষার অন্তর্লীন নিয়মগুলি 'এক' থাকে, তাহ'লে তাদের ভাষাও এক। এই অন্তর্লীন নিয়মগুলিই, যাকে ভাষার ভিতরের স্তর বলেছি তার ভিত্তি। অন্তর্লীন নিয়মগুলি লঙ্ঘিত হ'লে 'ভাষা' কাজ করে না, ভাষার নমনীয়তা তার উপরের স্তরেই। ভাষার উপরের স্তরের বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্লীন নিয়মগুলি প্রতিফলিত হয়ে থাকে—ভাষার উপরের স্তর তার ভিতরের স্তরেরই রূপান্তর, যা বলা যায়, ভিতরের স্তর থেকেই উপরের স্তরের বৈচিত্র্য জন্মলাভ করে বা উদ্ভূত হয়। যেহেতু চিন্তা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ভাষা নিরপেক্ষ না, একটি ভাষা-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গিও সেই ভাষার অন্তর্লীন নিয়মগুলির দ্বারা প্রভাবিত।

[ভাষা : শিল্পের উপাদান (অংশ) : দীপঙ্কর দাশগুপ্ত : শতভিষা : উনচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৭৮]

শিশিরের জল মেখে পথ হেঁটে বিকেল পেলাম
ওগো মেয়ে কাছে তো এলাম।
এত কাছে আমার নিশ্বাস ঘন জঙ্ঘির আঁচল টেনে
বুকে পিঠ দিলে।
তারপর রাত এলে, নক্ষত্রের ইশারায় চিনে
ওগো মেয়ে, তোমার বিশীর্ণ কোলে মাথা গুঁজে নীলমনে গাঢ়
ঢেউ তুলে
স্বাতী বিশাখার হাওয়া ঝরে গেলে তোমার নিঃশ্বাসে
ঘাসেদের ঘুম পেলে আর যদি তোমার শিথিল দেহে
ঘুম নামে মেয়ে
সেইক্ষণে চিন্তা দিও ওগো মেয়ে, চিন্তা দিও আমার হৃদয়ে
সেই চিন্তা ঠোঁটে গুঁজে, ভাবি যেন, বিকেলটা কত আগে ছিল।

[তোমাকে তোমাকেই : শংকর চট্টোপাধ্যায় : শতভিষা : প্রথম সংকলন : ১৩৫৮]

যদিও শরীর কৃষ্ণাশাড়ীতে ঢাকো,
সুদূর দুচোখে কাজলের রেখা আঁকো,
নগরান্তের ঠিকানার ঘরে থাকো,—
তুমি বিচিত্র তৃষ্ণার সরোবর।
সরোবর নও? হয়তো আমার ভুল।
কপালে লুটায় চূর্ণ চূর্ণ চুল।
উপহার দেবে উপমার শাদাফুল
তোমাকে আমার বিনীত কণ্ঠস্বর।

[স্বর্গের স্বাক্ষর (অংশ) : অরবিন্দ গুহ : শতভিষা : সপ্তম সংকলন : ১৩৬০]

পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে-থাকা,
ত্রিজগৎ রুষ্ট যখন ভ্রূকুঞ্চিত,
পাতাহীন শিউলি-ডালে একলা-একা
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে-থাকা।

শতভিষা

চারিদিক ঘুরিয়ে মারে একই ঘানি
আবেগের, অনাবেগের ; এমন কি আজ
বাসনা বাসনা নয়, আশ্লেষেও
নতুনের আস্বাদ নেই, উষ্ণ প্রথা ;
প্রজনন প্রজাপালন যুদ্ধ এবং
সনাতন যুদ্ধরতি, অন্যভাষা ;
পাতাহীন শিউলিগাছের খিন্ন শাখে
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে-থাকা।

[পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত :
শতভিষা : ষট্‌ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৪]

সমৃদ্ধ ঘরের পাশে আমবাগান, শোনো
তুমি অমন চারলক্ষ সমুদ্র জ্বালিয়ো না।
সাতলক্ষ সমুদ্রের অবিনীত বিবেকী বিদ্রোহ
ঘরের আসবাব সব অহরহ খানখান করে। আমার সান্ত্বনা
তোমার-ই মাটির বুকে ছিলো। দীর্ঘ সমারোহ
ছায়ার দরিদ্র ভীরু সংসারে রেখেছ। সেইখানে শিশুর মতন
সকলের মমতা কাড়ে অবিমিশ্র হাসির যৌতুকে
আজো সে সম্পন্ন শিউলি। শিউলির মালার নির্জন
বইএর আলমারি তার ওপারের দেয়ালের বুকে
সঠিক রেখেছিলুম। তুমি ভুল বুঝে
প্রতিবাদী তরঙ্গের চীৎকারে সেই নিবিড় সংসার
এবং সে শিশুটিকে অকারণ অপমান করো।
আমার ঘর-ও ভাঙে, ভাঙে তার সরল আব্দার।

[আর্তি : আলোক সরকার : শতভিষা : বিংশ সংকলন : ১৩৬৪]

কবিতা ঘটছে বহু নানাদিকে। কিন্তু খুব অল্প কবিকেই
বাবার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হয় ক্রমান্বয়ে

একমাস—পনেরদিন বা—খুব অল্প কবিকেই
হাসপাতালের মাঠে শাদা জামাগুলি মেলে দিতে হয়।
দারোয়ান, পেয়াদার কানের ফুটোর মধ্যে
টাকাটা সিকিটা চুপে ফেলে দিতে হয় খুব অল্প কবিকেই।
অথচ, কবিতা ঘটছে বহু এদিকে ওদিকে। কবিতায়
সেঁদিয়ে গেছে অনেকের ভবিষ্যৎ রমণীয় আলোছায়াময়
টানা দিনগুলি
'সুখের পায়রা' বলে পরস্পর মুখ চুম্বনের আগে
—ওর দিকে বারবার চাইছে সন্ত্রাসে
মানুষ ঘটছে বলে কবিতাও লেখা হচ্ছে বহু
মানুষ মরছে বলে অতিরিক্ত বাজ পড়ছে এদিকে ওদিকে।

[নিশির সঙ্গে আমার গোপন মিষ্টিক আলোচনা (অংশ) : উৎপলকুমার বসু : শতভিষা : ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭০]

আক্ষেপ না ক'রে উপায় থাকে না যে ইতিহাস পুনরুক্ত হয় না জেনেও ঘড়ির কাঁটা কৃত্রিম আগ্রহে আবার পিছনে ফিরেছে : বর্তমান নবীন কবিদের বড়ো একটি অংশ আবার বিগত প্রথম ও তৎপরবর্তী কবিতার কাছে আধুনিকতার সহজ পাঠ নিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। সেই অনুগামিতার ফল এই স্বকপোলকল্পিত অবক্ষয়, শস্তা দেহাত্মবাদ, বিকারোক্তি প্রবণতা, অতিকথন, বাইরে থেকে কথা বলা, কুড়িয়ে-পাওয়া অপ্রেমে জীবাত্মাকে ঝালিয়ে নেওয়া এবং ক্লিশে-নিঃস্ব আরো অগণিত ইত্যাদি।……

[স্থির বিষয়ের দিকে (অংশ) : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : শতভিষা : ঊনত্রিংশ সংকলন : ১৩৬৯]

প্রিয় উচ্চারণগুলি ম্লান হলো যে সময়ে, তার
অসতর্ক কোন চিহ্ন ঢেকে দিয়ে যায় নাকি ছবি

যে ছবি পুরনো খুব গৃহধর্মে : ছেলেবেলাকার
পথময়, আজ অবধি কতো ফুল কুড়ালে বৈষ্ণবী !
এ কোন বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ নয়। জীবন মৃত্যু বা
যাই বলো, তার কতোটুকু জানি, তাই যে সুখের—
তোমার সুখের অর্থ জেনে যাবো দুর্দিনের যুবা
একক ইঙ্গিত দেখবো কতো স্মৃতি আছে লাজুকের।
[বৈষ্ণবী : সুধেন্দু মল্লিক : শতভিষা : একত্রিংশ সংকলন : ১৩৭১]

ঠিক জানি, আবার সে ডাক দেবে। দরজা খুলবো না।
বলবে করুণ কণ্ঠে কথা শোনো। না, না, ভুলবো না—
কিছুতে ভুলবো না।
আমার এ-ঘর ভালো। আমি ভালোবেসেছি রাত্রিকে ;
তারই প্রতীক্ষায় থাকি। যখন চারদিকে
নিঃশব্দে তরল ছায়া গাঢ় হয়, গোপন গুহার
দরজা খোলে, অন্ধকারে মিশে যায় এপার-ওপার :
অদৃশ্য মূর্তিরা সব ছাড়া পায়, দূর থেকে ডাকে,
কাছে এসে ভীড় করে, সর্পিণীর মত পাকে পাকে
আমাকে জড়িয়ে ধরে—সেই স্পর্শ পিচ্ছিল ঘৃণিত ;
তথাপি নিজেকে সঁপি : আমি নিশ্চেতন, সম্মোহিত,
ভেসে যাই রাত্রির অতলে—সেইখানে যেন তুমি স্থির
নীলপদ্ম ; কণ্টকমৃণাল ঘিরে ঢেউ কী অস্থির।
[নীলপদ্ম : দীপঙ্কর দাশগুপ্ত : শতভিষা : দ্বাবিংশ সংকলন : ১৩৬৫]

শিল্পের অঙ্গনে শিলার কথিত প্রকৃতি এবং শিল্পের যে দ্বান্দিক ক্রিয়া যা বিভিন্ন ছদ্ম আবরণে গ্যোয়েটে থেকে টমাস মান্ পর্যন্ত জর্মন সাহিত্যের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পরিবর্তিত রূপ ও প্রকারে সেই মৌল ঐতিহ্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে অত্যাপি ক্ষেত্রবিশেষে বর্তমান, তারও স্মরণ অপরিহার্য। যুদ্ধোত্তর দ্রুত পরিবর্তমান পৃথিবীতে ঐতিহ্য, প্রমূল্যবোধ, সংস্কৃতি

ও বিশ্বাসের অবক্ষয়ের পটভূমিকায় শিল্পী যেখানে Priest এবং Commissar-এর মধ্যে বিবেকী সংশয়ে পীড়িত সেখানে অনন্যনির্ভর শিল্পই শিল্পীর একমাত্র বিশ্বাস।

['আলোকিত সমন্বয়' প্রসঙ্গে : তরুণ মিত্র : শতভিষা : ত্রয়োবিংশ সংকলন : ১৩৬৫]

তা'হলে এসো পুরনো ফাগ দিয়ে
স্মৃতির হোলি খেলি।
ভালোবাসা ওখানে আছে জমা—
মায়ের সেই জরির বেনারসী
তোরঙ্গেতে সঙ্গোপনে ভাবে,
ভাবে শুধু চেনাশোনার কথা,
সে-কথা আর কখনো উব্‌বে না;
ভালোবাসার ওখানে শুধু জমা,
খরচ কিছু নেই।

[তা'হলে এসো (অংশ) : সুকুমার রায় : শতভিষা : দ্বাবিংশ সংকলন : ১৩৬৫]

এরা মাঝে মাঝে খুব ভালোবেসে ধীরে ধীরে সহজ বৃষ্টির গল্প বলে।
উনিশ শ আটাশ সালে একবার হয়েছিল, তারপরে বিয়াল্লিশ সালে।
অবশ্য সাতান্ন সালে যে বৃষ্টি হয়েছে সেটি আরও ভালো, উত্তরের থেকে
প্রচুর প্রচুর মেঘ এসেছিল, কালো কালো, সকলে তাদের দিকে চেয়ে
বসেছিল সারাদিন সেই ভোরবেলা থেকে বিকেল অবধি,
সব কাজ ভুলে গিয়ে; মেঘদের কাছে আর্ত আবেদন করতে গিয়েও
গলায় আটকে গেছে, চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছে।
অকস্মাৎ বৃষ্টিধারা থেমে গেল, তারপর যা হল তা ভেবে ভেবে এদের জীবন
চ'লে যায় চলে যাবে সেই ঘণ্টাখানেকের মানে ও প্রয়োজনের কথা
ভেবে ভেবে।
এভাবে সারাজীবনে মাত্র পাঁচ ছয় বার বৃষ্টিপাত দেখা
এই লোকগুলো আছে, রয়েছে পৃথিবীতেই ঈশ্বরের কাছে।

[বৃষ্টির গল্প : বিনয় মজুমদার : শতভিষা : একচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৮১]

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান !

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মত প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্না জানো, তারি নাম তো বাঁচা।

[ঝর্না-কে : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : শতভিষা : ষষ্ঠ সংকলন : ১৩৫৯]

দৃশ্যত সবুজ, শুধু বাতাসের সামান্য অভাবে
দেখানো গেল না গাছে যৌবনের দুলে-ওঠা বিখ্যাত বেদনা।
তুমি নেই, কখনো ছিলে না, তাই শব্দ শব্দ শব্দ
তবু বোঝানো গেল না কেন যে একাকী
মন্ত্র নিয়ে বসে থাকে দেবতার কাছে পুরোহিত।

[পাঁচলাইন : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত : শতভিষা : চতুস্ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৩]

গত ২৯ শে 'নভেম্বর 'বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন' ও 'শতভিষা'র পক্ষ থেকে স্টিফেন স্পেণ্ডারকে চায়ের আসরে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। যাঁরা এই ঘরোয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন—একথা লিখতে আমি প্রলুব্ধ—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কবি, বিশেষত তরুণ কবি এবং অনেকেই আন্তর-অর্থে কাব্যানুরাগী। 'শতভিষা'র পক্ষ থেকে কবিকে 'শতভিষা'র প্রতিটি প্রকাশিত সংখ্যা ছাড়াও বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের শান্তি-প্রতীক একটি সুচিত্রিত মঙ্গলঘট উপহার দেওয়া হয়। শেষোক্ত উপহারের চিত্রকার শ্রীমণীন্দ্র মিত্র। কবি শিল্পীকে উচ্ছসিত অভিনন্দন-জ্ঞাপন করে 'শতভিষা'কে ধন্যবাদ দিলেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে তার আজন্ম সঙ্গী ও লেখক শ্রীতরুণ মিত্র সেটি কবির হাতে তুলে দিলেন। প্রাসঙ্গিক সূত্রে শ্রীযুক্ত মিত্র বাংলার সাম্প্রতিক কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ পরিচয় দান করেন তা

স্পেণ্ডারকে এতই উদ্বুদ্ধ করেছিলো যে তিনি বক্তাকে স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন পৌঁছে দিয়ে সেই বক্তব্যের সারসংকলন কবিসম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশার্থে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত বক্তার সুচারু কথনশৈলীর প্রশংসায় স্পেণ্ডার অভিভূত হয়ে উঠেছিলেন।

[স্টিফেন স্পেণ্ডার (অংশ) : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : শতভিষা : দ্বাদশ সংকলন : ১৩৬১]

অফুরন্ত সন্ধ্যায় আমার
ঘর ভরে আছে।
কোথাও দেখিনা দিশা, নদী ধুধু করে চারিপাশে
ঘুমের জড়িমা। আমি তার
মায়াবী জঠর ছেড়ে দরোজা পেরিয়ে নিরবধি
আকাশতলায় স্থির তটের আশ্রয় পেতে চাই।

[কুয়াশা (অংশ) : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : শতভিষা : অষ্টবিংশ সংকলন : ১৩৬৮]

ছ্যাঁচড়াচোরেরা কাল রাতে রান্নাঘর থেকে
বাসনকোসন সব নিয়ে গেছে।
গৃহলক্ষ্মী দুঃসহ মুখরা
যেন বা কর্তাই দোষী।
তবু অফিসের মুখে খুব তাড়াতাড়ি
কলাপাতে খেতে খেতে
মনে পড়লো
কবে সে স্টীমারে দেখা নদীর ও-পাড়ে
কলাগাছ, আঙিনায় নগ্নশিশু
কৃষকবধূর চোখ; স্থির শান্ত দূর কুঁড়েঘর।

[চোর : তারাপদ রায় : শতভিষা : দ্বাবিংশ সংকলন : ১৩৬৫]

যে চায় তাকে আনিস
যে যায় তাকে আনিস
যে চায় তাকে আনিস ডেকে আনিস—
ঘরের কাছে আছে অনেক মানুষ।

যে যায় দূরে অনেক দূরে অনেক দূরে দূরে
অনেক ঘুরে ঘুরে
যে যায় তাকে আনিস ডেকে আনিস ঘরে আনিস
ঘরের কাছে আছে ঘরের মানুষ!

তুজন যেতে উজান পথে উজান যেতে যেতে
ঘরের মুখে আগুন কেন জ্বালিস?

[ঘর : শঙ্খ ঘোষ : শতভিষা : চতুর্বিংশ সংকলন : ১৩৬৬]

আমি জানালা দিয়ে দেখছি
ঘুরে ঘুরে কাক উড়ছে আকাশে,
তারো কিছু ওপরে, দু'একটা মন্থর চিল—
টেলিগ্রাফের তার সরাসরি চলে আসছে
বাড়ির দিকে,
এই গ্রীষ্মেও, মৃদু মৃদু হিম-হাওয়া দিচ্ছে চারপাশে,
মনে হচ্ছে, খুব কাছেই সমুদ্র।

[জানালা দিয়ে (অংশ) : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : শতভিষা : দ্বিচত্বারিংশ সংকলন : ১৩৮২]

তারপর শীত এলো। চেয়ে দেখি উত্তুরে বাতাসে
কেবলি হিমের স্বাদ; তীক্ষ্ণতার জ্বালা নিয়ে
ছুটে আসে দস্যু হাওয়া গাছে, ঘাসে। এখানে আবার
আর্তির করুণ চিহ্ন, মেঘে মেঘে অনুক্ষণ সজল কান্নার
স্বর ব্যাপ্ত হয়। আহা, বৃষ্টি-ধোয়া সোনালী আকাশে
শ্বাপদ মৃত্যুর ছায়া নামে।

[উপলব্ধি (অংশ) : মানস রায়চৌধুরী : শতভিষা : তৃতীয় সংকলন : ১৩৫৯]

অরণ্য কি গ্রামাফোন বাজাতে শিখেছে
নাকি তুমি গোপন আঙুলে
রুপোলি পিনের চাপে ঘুরিয়েছ সবুজ রেকর্ড ?
দীঘায় জোয়ার
নাকি তুমি খুলে দিলে হঠাৎ দুয়ার ?
ঝংকার দিয়ে ওঠে ঘরের বাতাস
উড়ন্ত চুলের রঙে কেঁপে ওঠে মুখের দুপাশ।

[সবুজ রেকর্ড (অংশ) : মোহিত চট্টোপাধ্যায় : শতভিষা : চতুস্ত্রিংশ সংকলন : ১৩৭৩]

প্রতিদিন যথেষ্ট বেলায় আমি উঠি
যেন রাত জাগা নটী ! নিঃস্বপ্ন ঘুমিয়ে খুব ক্লান্ত মনে হয়
আয়নায় যাই না আমি, আমার আয়নাকে বড় ভয়,

সারারাত কালো ফাগ ছড়িয়েছে পাপ মুঠি-মুঠি !

[একটি নিজস্ব পাপ (অংশ) : কবিতা সিংহ : শতভিষা: চতুর্বিংশ সংকলন ১৩৬৬]

শিল্প অর্থই নির্মিত শিল্প। শিল্প প্রকৃতির অনুলিপি রচনা করে না, শিল্প প্রকৃতির দ্বিতীয় বিন্যাস, সজ্জিত উপস্থিতিকে কামনা করে। শিল্প অর্থই মিথ্যার, অলীকের উপাসনা। প্রকৃতি বড়ো জোর শিল্পের উপাদান হ'তে পারে, শিল্প নয়—প্রকৃতির যা কিছু সত্য শিল্পী তাকে ব্যবহার করেন, কখনো দুইটি ছবির সমাহারে তৃতীয় ছবি আঁকেন, কখনো বা তাকে পোশাক পরান, নতুন রঙ দেন, এমনকি নতুন রেখা। যা কিছু প্রাকৃতিক, তা-ই পরাজয়, সেখানে বিজিতের আজ্ঞাবহ চেতনা আছে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত পটভূমিতে আত্মপলব্ধির গৌরব নেই। যা কিছু প্রাকৃতিক তাই ঘৃণার, সেখানে হীনতম দাসত্ব আছে, ব্যক্তিত্বের আত্মময় উজ্জীবন নেই। শিল্প তাই প্রকৃতি নয়, শিল্প অলীকের, অমূর্তের, মিথ্যার অনুধ্যানে একাগ্র।

[শিকড় অভিলাষী চৈতন্য (অংশ) : আলোক সরকার : শতভিষা : ঊনত্রিংশ সংকলন : ১৩৬৯]

কবিতা

পঁচিশ বছরের 'শতভিষা' থেকে নির্বাচিত
কবিদের নতুন কবিতার সংকলন

জীবনানন্দ দাশ

জার্নাল : '৩৬

বিস্মৃতি ধুলোর মতো জড়ো হয় যেইখানে—
সেই হিম নিস্তব্ধ আঁধারে
একবার—আধবার—চেয়ে দেখি
আজো আমি সেইখানে তাকে
খুঁজে পাই ;—
নিচের তলায় ঠাণ্ডা রোগা অন্ধকারে
রেলিঙের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—

আলোর বেগের মতো প্রাণ
ছিল সেই যুবকের :
সূর্য আর নক্ষত্রের যেন সে সন্তান।

তবু তার ভালো লাগে আজ স্থবিরতা ;
সেখানে সময় শুধু ধূসর ঘড়ির মুখে কথা
ব'লে ক্লান্ত—ক্লান্ত ক'রে রাখছে হৃদয় ;
ব'সে থেকে ব'সে থেকে ব'সে থেকে মানুষের ক্ষয়
সেখানে একটি নারীর জন্য হয়।

আমার এ-জীবনের দীর্ঘ—দীর্ঘতর স্তর—অলিগলি ঘিরে
ঈশ্বর বাসনা স্বপ্ন—কতবার গেছে সব ছিঁড়ে।
শুধু তার প্রতীক্ষা আমাকে
কুশপুত্তলীর মতো বারবার সৃষ্টি ক'রে চলে।
ব্রহ্মাণ্ডের কত সৃষ্টি—কত প্রলয়ের কোলাহলে
টলে না তবুও তার প্রেমিকের মন।
তবু সে খাতক, আহা, সময়ই প্রকৃত মহাজন।

জীবনানন্দ দাশের এই কবিতাটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

অজিত দত্ত

ছড়া

কড়া কথা ছড়া ভালোবাসে না।
তাড়া দিলে ছড়া কাছে আসে না।
ছড়া আনি ভুলিয়ে ভালিয়ে।
তবু যেতে চায় সে পালিয়ে।
ছড়া লেখা হয় অনায়াসে না।
ছড়া লেখা সোজা ভাবো না সে না।

অরুণ মিত্র

পারাপার

চোখ দুটো আমাকে তাড়া করে। পেছনে কি বন, না, ঝকমকে শহর? চোখ দুটো তাড়া ক'রেই আসে। হয়তো কোনো জানোয়ার। কিম্বা কোনো মোটর গাড়ি হয়তো। আমি দৌড়তে দৌড়তে মজা গাঙের ধারে পৌঁছই, কাঠের সাঁকোটার উপর উঠে যাই। মাঝখান পর্যন্ত গেলে সেটা দাপাদাপি জোড়ে, আমি বুঝি অসহ্য হ'য়ে উঠেছি। নিচে কচুরির দামে হিলহিলে বিষ এবং ফাঁকফোকরে রাত গুড়ি মেরে। সাবধানে আল্‌তো ভর রেখে আমি বিস্মরণ পার হ'য়ে যাই, যেমন সার্কাসে টান-দড়ির খেলা দেখায়। একবার পড়লেই হয়, আরো কয়েকটা নীল ফুল ফুটবে বৃষ্টিতে আর কবিতার বুদ্বুদে পচা জল চনমন করবে। তাকেই কি মৃত্যুর মহিমা বলে?

আমি পার হ'য়ে যাই। এবার? রাস্তাঘাট ফেটে চৌচির হ'য়ে আছে। চাষবাসের চিহ্নগুলো এলোমেলো ছড়ানো। একটা খড় আমি উঠিয়ে নিই। আহ্‌……কি উত্তাপের স্মৃতি! ভাত ফোটার গন্ধ, শীতবর্ষার ছাউনি। আমি পায়ে পায়ে ক্রমে এক অন্ধকারে, যেখানে সকালদুপুরবিকেলের মুখগুলো আর নেই। অথচ পাতায় বাকলে ধুলোর পরতে শব্দ লেগে আছে। যেন সকলে ঘর ছাড়ার পর এইখানে তাদের হৃদ্‌যন্ত্র রেখে গিয়েছে। তারা কি সাঁকোর দিকে, সাঁকোর মাঝখানে, ওপারে? তাহলে আমাকেও ফিরতে হবে। হাজা কাঠের উপর শিউরে শিউরে, জঙ্গলে, না, শহরে, সেই চোখ দুটোর সামনে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটি অসমাপ্ত কবিতা

আদিম অন্ধকারের মুখোস-দেবতা!
তোমার একটিই আনন্দ,
আমাদের মুখ ম্লান ক'রে দিতে।

তুমি আমাদের ভয় দেখাও ; দিন নেই রাত নেই
তুমি দু'চোখ লাল ক'রে আমাদের ভয় দেখাও
কেননা, আমাদের পূর্বপুরুষ স্বর্গ থেকে আগুন চুরি ক'রে এনেছিলেন ;
কেননা আমাদের মুখে ক্রীতদাসের শীতের মুখোস নেই।

তুমি আমাদের পৃথিবীকে আড়াল করো দারুণ অপ্রেমে
আর লেলিয়ে দাও তোমার মানুষখেকো বাঘেদের।

তবু মানুষের মুখের লাবণ্য থেকে যায় .....

অরুণকুমার সরকার

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি রাত

মাতাল হ'য়ে শুয়েছিলুম ঘাসের ওপর
হাড়কাঁপানো শীতের রাতে।
সারাটা রাত বুকের মধ্যে হাড়ের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে
মোচড় দিয়ে গেল
নিখিল বাঁড়ুজ্যে।

শব্দ শুধু শব্দ সেই শব্দ যেটা
রক্ত এবং শিরায় শিরায় গুমরে গুমরে
জানায় আমি একলা ভীষণ একলা একা
অনেক দূরের বহু যুগের কোন জন্মের
কান্না আটখানা হ'য়ে ছড়িয়ে গেল ভিতর দিকে
বুকের মধ্যে হাড়ের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে
আমি এবং
আমার কান্না তোমার আঙুল
নিখিল বাঁড়ুজ্যে।

নরেশ গুহ

সম্পাদক সমীপেষু

পাড়ায় বড়ো হট্টগোল, কিছু শোনা যায় না কে কোথায় কী বলছে, শুনলেও বোঝা কঠিন, বুঝলেও করার কিছু নেই। ভারি অসহায় লাগে নিজেকে: বলুন, আমি এখন কী করি? কাউকে খবর করতে পারি না, প্রতিবেশীর টেলিফোন অচল, রিসিভার ভাঙা, লাইন তুলে নিয়ে গেছে। তাছাড়া খবর করার মতো সংসারে আছেই বা কে!

ভাড়া-বাড়ির সিঁড়িতে কুকুরের হল্‌দে পেচ্ছাবের ঢল, নামতে উঠতে পা পিছ্‌লে যায়: তবুতো আশ্রয় একটা? এবং কে না জানে যে লোকটা আমি ভীতু ধরনের নির্বিবাদী। অজ্ঞাতকুলশীল লোমশ যুবার উদোম বুক দেখতে-দেখতে অবোধ পিশুন যুবতী উরু চুলকোয়, তাও এমনকি দাঁড়িয়ে দেখার সময় নিই না আমি। অবেলায় এই ধূসর শহরের জটিল রাস্তাঘাটে কোন দিকের কত নম্বর বাস কখন আমার নেওয়া দরকার সেটাই তো আগে আমাকে জানতে হবে? এসব গোপনীয় কথা কা'কে আমি নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি?

প্রভাতের শোকসংবাদ হ'য়ে বাসি খবরকাগজের পাতায় হারিয়ে ফুরিয়ে গেছে হৃদয়ের সব আত্মীয়েরা:
চেনা মনে হয় না হালের কোনো গলা,
জানা লাগে না শহরের কোনো ঠিকানা,
ক্রয়যোগ্য ঠেকে না দোকানের কোনো খাদ্য।
দাড়ি-গোঁফের ছোপানো ঝোপ থেকে শিশুরা ভ্যাংচায়, যাদের সেদিনও এর ভাই কি তার ছেলে ব'লে চিনতাম।

টাক মাথায় পরচুলা পেঁচিয়ে বিনিদ্র-পরী মেয়েটি ওমুকের বৌ কিনা দেখতে গেলে, জানি আরো ফ্যাশাদে পড়ব আমি।
আমার একমাত্র চিন্তা—কোন কৌশল এই মুহূর্তে অবলম্বন করা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আমারও দাঁতে ধার নেই,
চোখে দৃষ্টি নেই,
ঘ্রাণশক্তি শিথিল।
তাতে আমি কী দোষ ক'রেছি? আমি কেন দায়ী হ'তে যাব?

অথচ টের পাই, আড়াল থেকে টিপ রাখছে নাছোড় খুনে এক দারুণ মাস্তান:
রোয়াকে শুয়ে ছুরি দিয়ে সে দাঁত খোঁচায়, আমার কেনা দেশলাই নিয়ে বিড়ি ধরায় গলির মোড়ে, আমাকে চোখের পাহারায় দাঁড় করিয়ে রেখে ডাকঘর থেকে দিগ্বিদিকে সে টেলিফোন করে—

উপুড় ক'রে ঢেলে দেওয়া বিখ্যাত এই নীল আকাশের তলায়,
কোন লালবাজারের ঠিকানা খুঁজে
একে নিয়ে আমি গ্রেপ্তার করাতে পারবো জানি না।
আমাকে আইনের ধন্বন্তরী একটা ধারা কেউ ব'লে দিন, ন্যায্য ভাড়া দিয়ে আরো কয়েকটা মাস এই শহরে আমি যাতে থেকে যেতে পারি, বাড়িঅলার কোনো উটকো লোক বিনা নোটিশে হঠাৎ আমাকে যাতে তুলে না দেয়।

অরবিন্দ গুহ

ফুলবাগান

পুকুরের ধারে পাতাবাহারের নতুন চারা,
বহুদিন বাদে দেখাসাক্ষাৎ ;
এই নিয়মের রাজত্বে ধ্রুব বৃষ্টিধারা
সমানে ভেজায় হরিণ, কিরাত।

কোথাও যাওয়ার তাগাদা ছিল না, অথচ এসে
পাওয়া গেল এই বিশ্রামঘর।
কিছু উপদেশ নগদ দিয়েছে দূর বিদেশে
ঘন জঙ্গল, মস্ত শিখর।

পাকা অনুমতি পেয়েছি ব'লেই একটু বসি,
নিরাপদ দূরে কড়া দেয়াল ;
পুণ্যলগ্নে ধরতে পারিনি রথের রশি,
মনে পড়ে গেল, পুরনো কাল।

রথের চাকার ব্যাঘাত ঘটেনি, রথের চাকা
নিজের নিয়মে ঘূর্ণমান।
আমার প্রাপ্য যা ছিল পেয়েছি—কাগজে আঁকা
বাতিল ব্যর্থ ফুলবাগান।

শঙ্খ ঘোষ

জীবনবন্দী

করুণা চেয়েছি ভাবো ?   তোমাদের সমর্থন ?   ভুল।
অনুমোদনের জন্য হৃদয়ে অপেক্ষা নেই আর।
সে জানে ভুলের মাত্রা, সে জানে ধ্বংসের সব সূচী,
এ হাতে ছুঁলে সে জানে ভস্ম হয়ে যাবে ওই মুখ।
কার কাছে কথা তবে ?   কারো কাছে নয়।   এ কেবল
যেভাবে জীবনবন্দী বুকচাপা কুঠুরিতে ব'সে
দিনের রাতের চিহ্ন এঁকে রাখে দেয়ালের গায়ে
সেইমতো দিন গোনা রাত জাগা মাথা খুঁড়ে যাওয়া,
লোহাতে লোহার ধ্বনি জাগানো, বাজানো, বিফলতা।
যে দেখে সে দেখে শুধু একজন খুলে দিয়ে চুল
সবারই পাঁজর চেপে দাঁড়িয়েছে লোল রসনায়
এ কেবল তারই নাচ বলয়ে বলয়ে বুনে যাওয়া
ভালো যদি বলো একে ভালো তবে, না বলো তো নয় !

দীপংকর দাশগুপ্ত

যখনই নিজের কাছে

অনেকদিন তো ছায়ার মতো ছিলে,
তোমাকে খুশি করতে পারিনি,
ভেবেছিলাম, তুমি আর আসবে না।
কিন্তু নিজের কাছে ফিরে এলেই
দেখতে পাই, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছো দূরে,
নতমুখে।
কখনো বা ট্রেনে যেতে যেতে দেখি,
উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী-বটের ছায়ায়
কাঠবেরালির সঙ্গে ;
দেখি, শুভ্র শরতের শিশির-সকালে
পদ্ম আর শালুকের স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায়
তুলে নিচ্ছো ফুল ;
দেখি, ফাল্গুনের বিকেলে

শতভিষা

পাপড়ি-ছড়ানো পলাশের নিচে
হাওয়ায় উড়ছে আঁচল।
ভেবেছিলাম, তুমি আর আসবে না।
এইমাত্র তোমাকে দেখলাম,
বৃষ্টিভেজা অশ্বত্থের নিচে
মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছো,
বর্ষার হাওয়ায় ঝ'রে পড়ছে বকুল।
বার বার ঘুরে ফিরে আসো,
মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো
একটু দূরে,
তোমাকে খুশি করতে পারে
এমন কিছু আমার নেই,
যখনই নিজের কাছে আসি
মলিন মুখে সজল চোখে
দাঁড়িয়ে আছো, দেখতে পাই ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

একরাশ নামহীন তুষারের মাঝখানে ময়ূর

একাদশী নেচে ওঠো ইওরোপের মাষমঞ্চে
—একরাশ নামহীন তুষারের মাঝখানে ময়ূর
ফেলিনির আমারকর্ডে—
এবং আমার শর্তে
ফেরাও সূর্যকে ব্রোঞ্জে
ক্ষোদিত বুদ্ধের মতো ভয়ানক দূর
এই সূর্য
সুদে-আসলে খুব করে খাটিয়ে নাও ওকে

কারো কাজে না লাগলে সূর্য নিজে-নিজে কষ্ট পায়
আত্মলীনতার কুষ্ঠরোগে
পড়ে থাকে, আর তার কণ্ঠে তখনও যে
বিজ্ঞাপনী ঘণ্টা এক সোঽহং সদর্পে রটায় ;
একাদশী একমাত্র তোমার বেলায়
'দয়া করো' চিৎকার করুক ভিক্ষাতুর
এই সূর্য
উদয়াচল একবার কাঁদুক দুর্ভোগে !

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সে কোথায় যাবে

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—
সে কোথায় যাবে?
নিঝুম মাঠের মধ্যে সে এখন রাজা
একা একা দুন্দুভি বাজাবে?

ছিল বটে রৌদ্রালোকে তারও রাজ্যপাট
সোনালী কৈশোরে?
আজ উল্লুকের পাল হয়েছে স্বরাট
চৌরাস্তার মোড়ে

দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি নোখের টংকার
এরকম ভাষা
সে শেখেনি, তাই এই রূপকথায় তার
জন্ম কীর্তিনাশা!

গায়ে সে মেখেছে ধুলো, গূঢ় ছদ্মবেশে
বোবা ভ্রাম্যমাণ
অদৃশ্য সহস্র চোখ তবু নির্নিমেষে
ছিলা রাখে টান।

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা
সে কোথায় যাবে?
যেতে সে চায়নি? কেউ খুলেছে দরোজা
পুনরায় মনুষ্য স্বভাবে?

আলোক সরকার

প্রণাম

এই আমার প্রণাম প্রস্তুত ছিলো অনেকদিন
আজ তোমাকে দিলাম।
বিবেচনা ছিলো অনেক দ্বিধা ছিলো অনেক।

বলতে পারো অভিমান এখন তা-ই মনে হয়
আর কিছুই মনে হয় না।
সেদিন ছিলো ক্রোধ সেদিন ছিলো প্রত্যাখ্যান।

আর বারবার ফিরে-আসা তাকিয়ে থাকা মুখ নিচু
পা এগিয়ে যায় না পেছিয়ে যায় না পা।
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম স্তব্ধতা গমগম ক'রে বাজছে।

অতলান্ত পর্বতমালা অন্ধকার পাইন বন আর কিছুই নয়
কোথাও নেই অশ্রুজল স্মিত হাসির করুণা—

শতভিষা

স্তব্ধতা গমগম ক'রে বাজছে আত্মলীন দাম্ভিকতা।

আর বারবার আক্রোশ ঘৃণা আর অবজ্ঞা আর
বানিয়ে-তোলা পুতুল রঙ ঢেলে-দেওয়া ছবি
কতদিন একধরনের মগ্নতাও, বুঝতেই পারিনি

ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছিল প্রণাম ভিতরে ভিতরে
পুতুলগুলো স'রে যাচ্ছিল দূরে ছবিগুলো উড়ে যাচ্ছিল
হাওয়ায়।
আজ হঠাৎ সূর্যাস্তের আলোয় আকাশ উথলে নামলো শূন্যতা।

আর কতো বড়ো একটা ভয় আর কতো বড়ো একটা কান্না
শূন্যতার ভিতরেই স্পষ্ট দেখলুম পা
পা এগিয়ে যায় না পেছিয়ে যায় না পা, আমার

পিঠ আপনি বাঁকা হলো দিলুম আমার প্রণাম
শাঁখ কোথাও বেজে উঠলো না—
শূন্যময় দাম্ভিকতা গমগম ক'রে বেজে উঠলো শুধু।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নিজের জন্য বেঁচে নেই

সারাদিন যেমন তেমন, সূর্যাস্তের পরই হয় সুরু।
কি করবো কোথায় যাবো
ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে
নানারকম ট্রাম বাস ট্যাকসী পাল্টাপাল্টি
কিন্তু কোথাও পৌঁছুই না।
একটা বিছানা আছে শারীরিক,
মোটামুটি একটি বালিশ
যেখানে এখানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘুম
কিংবা মৃত্যু, কিংবা
বলা যাবে না এমন কিছু
অভ্যাস হয়েছে, হচ্ছে :
আলমারীর গভীরে প্রত্নতত্ত্বের সমান
গম্বুজ খিলানভাঙ্গা বই
লক্ষ লক্ষ প্রসিদ্ধ অক্ষর—না
আজকাল আর ভাল লাগে না
ঐ সব স্মৃতি নিয়ে উবু হয়ে বসে থাকতে, অথচ
একদা তো কতো কথা বলেছি তাদের সঙ্গে
সমস্ত সামাজিকতাকে বাইরে রেখে

নারীর মতন ভিতরে নিয়েই
দরজা করেছি বন্ধ !
এখন
সকাল হলেই দাড়ি কামাই নিপুণ ; ঐ
লৌকিক সার্জারিতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না কোথাও,
আগে মাঝে মধ্যে কেটে ছড়ে রক্ত বেরুতো
ভাবতাম আহ্ !
তাহলে তো ঠিকঠাকই রক্ত তৈরী হচ্ছে !
আর এখন নিখুঁত ;
তারপর স্নান করি, কিছু একটা খাই
শীত-নিয়ন্ত্রিত অফিসচেয়ারে বসে
শুদ্ধ কিংবা ভুল একক দশক শতকের
পরিসংখ্যান করি
মনে পড়ে আমি আমার নিজের জন্য
বেঁচে নেই। ঘড়ি ডানদিকে যথোচিত ঘোরে
ঘণ্টায় ঘণ্টায় শব্দ করে শোনায় মানুষকে, হাঃ
আয়ু মাত্র দুটি দক্ষিণপন্থী কাঁটা দিয়েই এখনো মাপার নিয়ম ··

যা বলছিলাম
সারাদিন যেমন তেমন, সূর্যাস্তের পর হয় সুরু

তীব্র আক্রাশে জ্বলতে থাকে আশিরপদনখ, বুকের
অরিকুল ভেনট্রিকুলে জাগে
রক্তের সশব্দ হাঁক
সুরাসারে সুপাচ্য হয় না, ক্ষণিকের অংশ মাংসে
জাগে অগ্নিমান্দ্য !
ঘাড় বেঁকিয়ে তাকানো দীর্ঘ হর্মসারির ওপর
দলছুট পাখির মতো
কয়েকটি অচেনা নক্ষত্রকে বসতে দেখে
চীৎকার করি
ঢিল ছুড়ি
তারা নড়েনা ! কোথায় যাবো
এই অন্তের কারণে বাঁচার অরণ্যে আমি কবে
মৃত্যুর বিশ্বাসে পাবো
টুকরো টুকরো অশ্বঅণ্ড বেঁচে থাকার হিসাব ?
সুতরাং অন্ধকার আসে
বিছানা আমাকে ডাকে
অক্ষরের অঙ্গ থেকে 'আ'-কার 'ই'-কার
হ্রস্ব 'উ' সুদীর্ঘ 'ঊ' ঝরে পড়তে থাকে
আমার কিছুই বদলায় না
আমার কিছুই হারায় না
শুধু সূর্য দ্বিতীয় গোলার্ধে চলে যায়।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আত্মজীবনীর খসড়া

(শ্রীমান নিখিলেশ গুহ সমালোচকেষু)

আমার ঠাণ্ডা-গলার ডাক
তোমরা কেউ শুনতে পারোনি।
তাই আমি ফিরে গেছি।

আমি কিন্তু কাছেই ছিলাম।
চুল উশ্‌কো, চোখে চশমা, গায়ে হয়তো
একটু বেশি মেদ,
আর পাঁচজন লোকে যেভাবে জীবন বাঁচে, ঠিক সেইভাবে,
পাপ-পুণ্য-কামনা-বাসনা-ঠিক-ভুল, সব একধাঁচে,
বাস থেকে রাস্তায় সুন্দরী দেখে একইভাবে
হঠাৎ চঞ্চল···
মানছি, কখনো আমি তেমন চিৎকার ক'রে
উঠতে পারিনি,
বলিনি, হাজার হাজার ঢেউ বিচূর্ণ স্তনের মতো
আছ্‌ড়ে পড়েছে পাম-বীচে,
বা এরকম কিছু।
তবু সমস্ত জিনিস আমি ভালোভাবে লক্ষ করেছি,
তোমাদের কূট প্রশ্ন আজীবন জেনেছি মগজে।

আমার আগুন আমি একটু বা ভেতরে রেখেছি,
তফাৎ এখানে—
সর্বস্ব পুড়িয়ে দিয়ে একটু একটু আলো জেলেছি যখনই,
তোমরা কোনো আলো-তাপ-রং দেখতে পারোনি,
কিন্তু আমি তো দেখেছি!
নিঃশব্দ আলোর স্রোত ব'য়ে গেছে আমার ভেতরে॥

সুধেন্দু মল্লিক

কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং

চল্লিশ বাঁক পথে পথে ঘুরে
জোনাকির মতো জ্বলে পুড়ে উড়ে
দেখি রাত শেষ দেহ-লঘুভার
ধুয়ে মুছে গেছে যতো চিৎকার
এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই
এইখানে থামি ওদিকেও ধাই
করি গুঞ্জন গুনগুন গান
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

শালিখ শুধায় ফড়িং শুধায়
কোন লেখা নেই পূজা সংখ্যায় ?
তবে আর তুই কবিটা কিযেই
মরা ভালো তোর কলম পিষেই
বাঘে খাক তোকে সজারুতে খাক
ওরা বলে ছ্যা ছ্যা ওয়াক ওয়াক—
এমনি তামাসা চলে দিনমান
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

এর ওর দুয়োরে দিয়ে যাই উঁকি
আলাপ বন্ধ, নেই কোন ঝুঁকি
শত্রু রয়েছে বন্ধুও ঢের
উত্তর যায় পত্রাঘাতের
বিছানায় রোদ জানলায় হাওয়া
অনন্ত দান অনন্ত পাওয়া

ক্ষমা ক'রো, আমি ক্ষমা করলাম
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

মা আমায় বকে ঈষৎ সতত
কি বকিস তুই পাগলের মতো
আমি বলি মাগো চুপ করে শোনো
না হয় দূরের তারাদের গোনো
জীবনে আমার নেই কোন ফাঁকি
নিরেট সত্যে জমে গেছে আঁখি
সেই বোঝে মাগো আছে যার প্রাণ
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

হা-হা হাসি পায় হো-হো হাসি পায়
আকাশ পথের শেষ সীমানায়
বসেছে বাজার রাজার শহরে
আদরে ধমকে প্রহরে প্রহরে
চাবুকে সোহাগে কেনা-বেচা হয়
কারো লোকসান কারো সাশ্রয়
চেঁচায় কৃপণ খোয়া গেছে দাম
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

বেজেছে ঘণ্টা তবে সখা যাই
বলার মাত্র এই কথাটাই
ক্ষতও সত্য ক্ষতিও সত্য
তুই দে উড়িয়ে তথ্যাতথ্য
কে জানতে চায় তুই কি প্রাচীন
জীবিত কি মৃত অমর নবীন
সেটা নিজস্ব যেন ভোর স্নান
কুয়োমিণ্টাং কুয়োমিণ্টাং ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ঋত্বিক ঘটক

নক্ষত্রমালার দিকে উড়ে যায় একটি মানুষ,
তার নীল জামা উড়ে হয়ে যায় প্রকৃত আকাশ—
সেই আকাশের নীচে অন্য সব মানুষেরা থাকে।
গ্রীষ্ম ও শীতের ফাঁকে, নিটোল কাজের ফাঁকে ফাঁকে
হঠাৎ দেখেছে তারা বা হঠাৎ দেখতে চেয়েছে—
নক্ষত্রমালার দিকে উড়ে যায় একটি মানুষ।

নতুন নক্ষত্রোপম সেই মানুষের দিকে চেয়ে
কখন ধানের বুক টনটন দুধে ফুলে ওঠে,
ঈর্ষায় সুনীল হয়ে আসে সপ্ত সাগরের মুখ,
কুয়াশার অভিমানে ঢেকে যায় সম্পূর্ণ পাহাড়,
নীলিমায় ভাসমান সেই মানুষের দিকে চেয়ে
মানুষ সমস্ত ভুলে নারীকে 'নীলিমা' বলে ডাকে।

পৃথিবীর কাছে ছিল। আমাদের চেয়ে কিছু কাছে।
আয়তনবান হয়ে স্বদেশের মানচিত্র হয়ে
বহতা নদীর ঢলে, উদার সবুজে, রুক্ষ মাঠে
ভাঙা বাঙলার রক্তে ললাটে উদয়ভানু জ্বেলে
প্রেমের, জ্বালার মত গভীরে আসক্ত হয়ে ছিল।

আকাশ কি ভুল ক'রে এসেছিল পৃথিবীর কাছে ?
আকাশের ঘাসে ঘাসে তার নীল জামা শুয়ে আছে।

তারাপদ রায়

ফুল হবে

আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনি
মাধবীলতার কেটে ফেলা ডাল
সবাই বলে লাগিয়ে দিলেই গাছ হবে,
গাছ হবে, ফুল হবে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়
আমাদের যত্নে লাগানো গাছে
কোনো শিকড় গজায় না,
পাতা শুকিয়ে ঝরে ঝরে শুকনো কাঠির মত
আমাদের মাধবীলতার গাছ,
আমরা বারবার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনি।

মঞ্জুশ্রী দাশ

একটি কবিতা

কালো জলে যখন ছিটেফোটা ঝিলিক
ভেসে যাওয়া লিলির মত
কিছু সৌগন্ধ কুড়িয়ে পেয়েছি
        রাত্রির ভেজা বাতাসে
                কুঁড়ি
        একটু একটু খুলছিল।
উইলো গাছের ঝরো-ঝরো শাখায়
কেমন এক নীড়ের আস্বাদ
   মুঠো মুঠো ঝরছিল।
মুখে লাগছিল
শিশির থেকে কিছুটা কনিয়াক সময়
নদীর হলুদ চলা
      ঘাসের কাছে উপচে পড়ছিল।
খোয়াই-এর আশেপাশে মুচকুন্দ পাতায়
            বৃষ্টির ছাঁট
চারধারে বৃষ্টির ছটা।
ফোঁটা ফোঁটা নিবিড় গাছের ছায়া
পুঁই মাচানে—সরু মেঠো পথে—
জলপাইবন আর পিয়া শালপিয়ালের
            আনাচেকানাচে
গোধূলি ঘাসের কোন নীলচে গেলাস থেকে
            বাতাবীলেবুর মত আস্বাদ
মোরগ ফুলের পাপড়ির ভেজাভেজা স্বর
        মুঠো মুঠো কুড়িয়ে পেয়েছি।

শান্তিকুমার ঘোষ

অভিযাত্রা

তিমি উপসাগর ছাড়িয়ে কবে শুরু হয়েছে যাত্রা
পিছনে প'ড়ে রইলো দুর্গের মতো বরফের পাহাড়
গ্রীষ্মের আরম্ভে তখন সিন্ধুঘোটক খেলা করছিল জলে
বরফের উপর মিছিল বেঁধে হেঁটে গেল পেঙ্গুইন
হিমবাহের মধ্য দিয়ে টানা পথ গেছে দক্ষিণ দিকে
কালো হীরা আর তেলের সন্ধানে

একে-একে নেমে এল তুষার-ঝঞ্ঝা, হাড়-কাঁপানো শৈত্য
অভিযাত্রার পথে
কুয়াশা অন্ধকার ক'রে ফেললো দিক-দেশ
তবু এগিয়ে চলে দল
একটার পর আরো একটা······
কেননা, জলদস্যুর রক্ত তাদের ধমনীতে
যদিও ঝড়ে অকেজো হ'য়ে গেছে জাহাজ
তুষারে ডুবে যাচ্ছে পা
অসাড় আঙুল
যদিও স্লেজ ঝুঁকে পড়েছে খাদের উপর
খানিক আগে যেখানে অদৃশ্য হ'ল শেষ মঙ্গোলিয়ান টাট্টু

তবু চুম্বকের মতো টানছে মেরুকেন্দ্র
টানছে নিস্তব্ধ চিরশীতের গোটা রাজ্য
এমন কি প্রিয় কুকুরগুলো চাইছে
সবার আগে পৌঁছতে মেরুবিন্দুতে

সামসুল হক

প্রতিবাদ

অরণ্যে ফোটাবো জ্যোৎস্না বলো কার বিরোধিতা আছে
পাতালে ওড়াবো পাখি বলো কার বিরোধিতা আছে
আমি কি আঁকিনি ভল্লে চুম্বকের যোগ্য ব্যবহার
আমি কি ধরিনি দাঁতে হলুদ শস্যের ব্রহ্মগ্রীবা
মরুভূমি নিঙড়ে নিয়ে সমুদ্রকে দিয়েছি অঞ্জলি
বৃক্ষের শিকড় কেটে মালা গেঁথে বনদেবতাকে
উপহার দিয়ে বর পাই পুষ্পশোভিত পৃথিবী
সত্যকে দিয়েছি দীক্ষা ছাখো হাতে সোনার ত্রিশূল
অরণ্যে ফোটাবো জ্যোৎস্না বলো কার বিরোধিতা আছে
পাতালে ওড়াবো পাখি বলো কার বিরোধিতা আছে
হঠাৎ আড়াল থেকে ব্রহ্মণ্য গর্জন শোনা যায়
বুনো তেতো কচুপাতা বলে আমি বিরোধিতা করি
জলের গর্জনে যেন রোদের বারান্দা ভেঙে পড়ে
পচা ডোবা বলে ওঠে আমি এর বিরোধিতা করি
আর কাঁধে অন্ধ খঞ্জ বুড়ি মাকে আঁকড়ে ধ'রে রেখে
কবিতাও বলে ওঠে আমি এর বিরোধিতা করি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলিধূলোয়

মুখে ভুষো কালি, মাথা অর্ধেক কামানো, খচ্চরের পিঠে পিছমুখো—
তিন দিকে একশো উল্লাস—
সোজা দিয়েসো ফটক পার করে—এইভাবেই
আড়াআড়ি বাঁধা হাত, এইভাবেই বৈরিতার মোকাবিলা—আর
মাৎস্য বা জিঘাংসা নেই : শফরীর জরিপাড় কাঁচের পর্দায় লেগে আছে—
স্বর্ণগর্ভ
চলেছে উটের সার সীমানা ডিঙিয়ে, পেটকোঁচড়ের মধ্যে আলো······
আজকের মতন
ঝরকা বুজছে, ঠিক ৫টা ২৬ শে
সূর্যের দফতর বন্ধ ! ভয় নেই, বিদ্যুৎহীনতা রুধতে আনাচেকানাচে জেনারেটর···
দেরাজ
খুলতে বেরিয়ে পড়ল স্যান্দ্যমানা পূর্ণ যুবতী—হাস্যমুখী······বিশ শতাংশ শস্তায়
মেয়েদের হালফ্যাশন, না-হোক অর্ধেক ছাড় দিয়ে
আস্ত লোম, তেজীয়ান ওষুধ ·····

কাঁচের পাতের মতো শান্ত পাড়া—অগভীর কাকচক্ষু মীনপথ—আর
কিছু নেই—মাৎস্য, অন্তর্ঘাত, ছুঁচ পড়ার আওয়াজ কানে বাজে—
ঠিক ৫টা ২৬ শে-ই দোরে দোরে—অন্ধকার ঝুলছে,
খাঁ খাঁ পথ··· ··
কোথায় গিয়েছে সব ?—সার্থবাহ, পুঁটির রূপালি, যুবতীর
মোমকাঁপা ঠার রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায় গোধূলিধূলোয়
ফটক পেরিয়ে—আরো—শহরতলির গেঁয়ো পথ নিঃসঙ্গ জন্তুর মতো ম্লান
চলেছে, সর্বাঙ্গ তারও গোধূলিধূলোয় ভরে গেছে······

সত্যেন্দ্র আচার্য

মধ্যাহ্নেই রজনীগন্ধা

(শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতি-কে স্মরণে রেখে)

সন্ধ্যায় সাজাব ফুল কথা ছিল
মধ্যাহ্নেই রজনীগন্ধা কিনে আনি।
বিপুল সম্ভারে বসিয়ে রেখেছি মূর্তি
সিংহাসনে। ঋষির সম্মানে।
সবাক চিত্রের নিচে
নীরব দর্শক বসে গেছি।

স্বতন্ত্র স্রষ্টার মত অকম্পিত ছায়া
জুড়ে থাকে দর্পণ। সৃষ্টি বেদীমূলে
দুঃসাহসিক স্পর্ধায় নিরুপম দ্যুতি হয়ে জ্বলে।
দর্পণে তাকালে চোখে পড়ে—
বৃহদারণ্যের বনস্পতি গতিরুদ্ধ। তারপর
অনন্ত আলোকে আনন্দের ধারা
ছড়িয়ে দিতে দিতে
বনস্পতির ভালবাসা আগামীকালের স্মৃতি হয়ে গেল।

বন্ধ দরজা খুলে কোনদিন মুখোমুখি দাঁড়াবে না সে
বন্ধ কপাট খুললেই চোখাচোখি।

কালীকৃষ্ণ গুহ

দেখা

(অশোক দত্তচৌধুরী-কে)

অনেকদিন পর আমাদের দেখা হ'লো।

'কবিতা লিখে কিছুই হয়নি আমাদের' এইকথা ব'লে তুমি কুঁজো হ'য়ে
হেঁটে যেতে লাগলে
'কবিতা লিখে কিছুই হয়নি আমাদের' এইকথা ব'লে আমি কুঁজো হ'য়ে
পাশাপাশি হেঁটে যেতে লাগলুম।

চারদিকে তখন চৈত্রমাস সূচিত হ'য়েছে—অন্য কোনো ভাষা নেই—স্মৃতিহীনতার
মতো চৈত্রমাস।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পশুপক্ষী বিষয়ক

উট

কী ভীষণ একা তুমি, চলমান নিস্তব্ধতা— যেনবা পতনশীল নক্ষত্র
শূন্যেতে ঝরে যায়...
সহযাত্রী নিজেরই দেহের ছায়া—ক্লান্তিতে মন্থর, হাঁটো অনাসক্ত
দৈবের নির্ভর
অস্পৃশ্য জেনেই দূরে সরে গেছো মানুষের, জীবিতের বিস্তীর্ণ মৃত্যুর খুব কাছে ?
নগর বা দেবালয় থেকে দূরে অনন্তের কোলে শুয়ে থাকা বিশ্বের নিষ্কাম নির্জনে ?
গূঢ় কোনো অভিমানে ?   কে জানে পৌঁছোবে তুমি কোনোখানে কোনোদিন !
কিসের সন্ধানে
পোড়াও শরীর, তৃষ্ণা আকণ্ঠ বহন করো ?   জ্বলন্ত বালুকা পায়ে দলে
হাঁটো আদিগন্ত জুড়ে ঘুরে ঘুরে ; ঝড়ের কঠিন ক্রোধে স্থৈর্য না হারিয়ে
হও মুখোমুখি, আর

শতভিষা

ঘৃণাকে শাসন করো রিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ—এইভাবে বক্তৃতা জানাও
দৈবে, দুর্দৈবে, প্রভুত্বকামী মানুষের কাছে ;

এমত বিরামহীন পা ফেলা, টিকিয়ে রাখা অস্তিত্ব নামীয় ছেঁড়া পোশাক
নিঃশব্দে ধুঁকে ধুঁকে
পার হয়ে যাওয়া ক্ষণমুহূর্তের ফলভারে নতজীবনের পাদপাদপের দেশ
ক্রমক্রমে
বৈরপ্রকৃতির মুগ্ধ আপাতসম্মোহে আত্মবিসর্জনই কাম্য বলে মনে হয় ;
মরে
জীবনে জৈবিক রীতি ; সত্তার সার্বিক ঋতুসত্তার ক্রমশ মৃত ;
পাণ্ডুর বিধানে মর্ষকামী
একক সত্তার ভার গুরুভার মনে হয় ; নুয়ে পড়ে, পদে পদে মরে !
'কে নেবে দুর্বহ বোঝা অভিশপ্ত অস্তিত্বের ?'—প্রতিধ্বনি ফেরে
শূন্য চরাচরে, নিঃশব্দ প্রান্তরে !

রত্নেশ্বর হাজরা

পার্কে—বিকেলে

শিশুরা বেড়াতে গেছে পার্কে   বিকেলে
সঞ্চয় জমেছে খুব   পাতাদের
দেহের উপরে রৌদ্র—পড়ে আছে স্পষ্ট দৃশ্যমান
যেহেতু অবেলা তাই প্রধানত   ভ্রমণের বেলা
পাতার শরীরে হাওয়া পার্কে—বিকেলে
সঞ্চয় জমেছে খুব
পাখিদের
প্রত্যাবর্তনের
সময়ও হয়েছে—

শিশুরা বেড়াতে গেছে   পার্কে   বিকেলে
সঞ্চয় কমেছে খুব
রোদ্দুরের
যাবার সময় হলো—স্পষ্ট দৃশ্যমান
বুড়োরা হয়েছে আরো বুড়ো
তথাপি ঘোষণা করে কারা
সময় হয়েছে
পাখিদের
প্রত্যাবর্তনের—

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

লাল-পিঁপড়ে

লাল-পিঁপড়ে, যখনই তোমাকে দেখি
মনে পড়ে আমার পিঁপড়ে জন্মের কথা।
তোমার চেয়েও কত আস্তে আস্তে আমি
ঠেলে নিয়ে যেতাম ছোট্ট এক চিনির দানা
আর এইটুকু এক ছোট পিঁপড়ে-বৌ
অপেক্ষা করতো কখন, কখন ফিরে আসবো
ঝুরঝুরে ঘরে,
কোনদিনই এসে পৌঁছতে পারতাম না আমি।
লাল-পিঁপড়ে, আমি সেই জন্মের কথা লিখিনি কখনো,—
আজ যখনই তোমাকে দেখি, আমার মনে পড়ে
আর একটা সামনের জন্ম, পিঠের দুপাশ দিয়ে
ঝুলে পড়েছে বিশাল চিনির বোঝা, টলতে টলতে
এগিয়ে চলেছে বলদ, পৃথিবীটা হয়ে উঠেছে
বিশাল, চৌকো এবং লম্বা আর তার ঠাণ্ডা মরা চোখের ভেতর
ভেসে উঠছে তার গত জন্মের কথা, যখন
সে হাঁটতো দু'পায়ে, যখন
তার দুটো হাত ছিল, যখন
খবরের কাগজ না এলে কিড়মিড় করে উঠতো দাঁত, যখন
হাজার হাজার ঘণ্টা অদ্ভুতভাবে বেঁচে থেকে
একদিন তাকিয়ে থাকতো লাল-পিঁপড়ের দিকে, যে ছিল
তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী পরিশ্রমী, যে
করতো কাজের মত কাজ—একটা চিনির দানাকে
ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে নিয়ে যেতো
আর ফিরে এসে
আবার বেরিয়ে যেতো আরো একটা চিনির দানার খোঁজে।

পরেশ মণ্ডল

মন্দির

একলা মন্দির
তার চূড়ায় পড়েছে চাঁদের আলো
হলুদ জোৎস্না—
প্রার্থনার সময় পার হয়ে যায়
কেউ আসে না
তখন ছিল এখন নেই
পথ
সেই পথ
হারিয়ে আছে ঘাসের আড়ালে
আলো জ্বলে না
শাঁখ বাজে না
ফুল না ধূপ না
প্রার্থনার সময় পার হয়ে যায়

অশোক দত্ত চৌধুরী

সেই ঘর

(প্রিয় কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর অকাল মৃত্যুর উদ্দেশ্যে)

এই বেঁচে থাকা, যতদিন আসে হাওয়া বিকেলে অলস
একটি দুটি পাখী অথবা সেই কাক অভুক্ত দিনমান, উড়ে আসে
খুঁটে খুঁটে খায় হলুদ বাদাম, চারিধার।
আর যেন সেই ঘর, ক্রমশ ছায়ার দীর্ঘায়ত হাত
স্পর্শ করে সোনালী কলম, ডায়রীর শেষ লেখা
যে-রকম সেও জেনেছিলো একদিন, চৌকাঠে দু-এক পাটি চটিজুতো
পড়ে থাক নির্জীব, আমাদের ছেড়ে যেতে হয়, হবে

কেউ নেই, এক বিকেলের থেকে অন্য বিকেল দীর্ঘ করে ছায়া
আরো কতদিন
মাঝে-মাঝে মনে হবে সেই ঘর, ঘুম, মৃত্যুর নির্বেদ।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

ভেজা গাছ, নক্ষত্রে মিশে যায় সুখ

সুখ এখন ধরাশায়ী তোমার হাতে
বৃষ্টির ভেতর ভিজে যায় শরীর, ঘরে ফিরি—বিদ্যুৎ চমকায়
প্রতিচ্ছবি কাঁপে—অন্ধকার রাত ভেজা গাছ থেকে ঝরে পল্লব
দুঃখ পারিজাত মালা হয়ে মিশে যায় কোথায় ?

ভয় নেই কেউ তোমার সুখ ছিনিয়ে নেবে না।
আমি নিয়েছি রাত তোমায় দিলাম সেঁজুতি ব্রত
আহত পাখির ডানায় তুমি দিও ডেটল···

আমার প্রতীক্ষা সুখের জন্য, ভেজা গাছ
যৌবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া প্রসিদ্ধ রমণী,
অলস দিন যায়
বৈশাখের শেষে থমথমে আকাশের মুখ, ঝড় ওঠে
ধুলোর ঝড়, আমার মন খারাপ করে

শতভিষা

অকারণ হেঁটে যাই সীমান্ত অবধি, দেখি নক্ষত্রে মিশে যায় সুখ !

কেউ ডাকেনা আমায়, বুকে রাখে না হাত
বলে না তুমি রাজা হবে, রাজা, রাজা,
এখন তাই শুয়ে থাকি বিকেল বেলায়, ফিরে আসে শৈশব
ছোট্ট ঘরে মা যখন পুরান তোরঙ্গ খুলে
সুখ বার করতেন, শৈশবের সুখ
যখন লাঠিম নিয়ে চলে যেতাম সাহেব বাগানে
কে যেন আমায় বলতো ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার ভেতর
ভেজা গাছ থেকে টুপ-টাপ দুঃখের শব্দে
তুমি রাজা, দুঃখের রাজা, রাজা···

সুখ এখন ধরাশায়ী তোমার হাতে
আমি দেখি ভেজা গাছ, দূরে অস্পষ্ট ছায়া সুখের বয়স
নক্ষত্রে মিশে যায়···

সুনীথ মজুমদার

আমার করার যা তাই করছি

আমার করার যা তাই করছি, এবার তোমার দায়
কেমন ক'রে রাখবে তুমি, কেমন ক'রে পথের মধ্যে আমায়
নিয়ে যাবে রোদ্দুরে হোক, বৃষ্টিতে হোক, কিংবা
অমাবস্যা আর পূর্ণিমায়, আমার দারুণ সুখের দিনেও ভাবা
তুমিই আমায় নিয়ে চলো তোমার ছায়ার নিচে
আগলে আছ দিন-রাত্তিরে, গুরু হয়ে, সুহৃদ হয়ে নিজে
রক্ষা করছ সব মুহূর্তে, আমার ভয়ের দিনে হাসছ দূর
থেকে, আমার কাজের বেলা যখন হঠাৎ বেসুর
বেজে ওঠে, বুঝি তুমি ইচ্ছে করেই খেলছ আমায় ঘিরে
আমার করার যা তাই করছি, এবার আছি তোমার দিকে ফিরে
এবার তুমি শান্তি নামাও, স্পষ্ট ক'রে এবার জীবনভর
প্রাণে আমার তোমার আলো নামুক নিরন্তর।

রথীন্দ্র মজুমদার

স্মৃতি, তুমি স্থির হও

তোমাকে কোথায় রাখি ?
বুকের ওপর উঠিয়ে নিয়েছি যেন মূর্তি
নামাতে পারিনা···
খেলা ? বাল্যকাল চলে গেছে, কবে ?
স্তরে-স্তরে স্নায়ু-শিখা নিশ্বাস, উত্তাপ জ্বলে, নেভে
আজ বাতাস উঠেছে
ডাল-পাতা, শিরায়, শরীরে ঢেউ
ভিতরের দিকে রন্ধ্রে চলে যাই
ফুঁ দিই বাঁশি—
দাঁতের কামড়, কোথায়, কে ডাকে ?
আমাকে দেখতে দাও দীর্ঘকাল আড়ালে রয়েছি
তবক ছিঁড়তে চাই দুই হাতে, তবকের পরের তবক :
জিভে, ঠোঁটের চোষনে শাঁস, শুদ্ধ সত্তাটুকু
অন্ধকার রক্তে কাঁপে প্রাণ
একটু সময়, রাত যায়-যায়, আরো একটু, কয়েকটি মুহূর্ত
ভেসে যেতে যেতে টান শিকড়ের বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে···
কে এসেছে, রোমকূপ-জাগা-বুকে মুখ, চেখে জল ?
স্মৃতি, তুমি স্থির হও !

পার্থ রাহা

তখন রাত্রি নেমেছিল

তখন সমস্ত আকাশ জুড়ে রাত্রি নেমেছিল
আর সময় সে সময়
তার বিশাল ছায়ায়
প্রত্যেক মানুষ তার বুকের ভিতরের
চোদ্দ বিঘা জমির
তার নির্ধারিত রমণীর প্রাত্যহিক ব্যবহার
দলিল-দস্তাবেজ হিসেব নিকেশ
বংশানুক্রমিক সিন্দুকের
দরজা খোলার শব্দে
দুশো ছত্রিশটা অস্থি-র
সম্মিলিত আর্তনাদ

প্রত্যেক মুহূর্তে যেন প্রত্যেকেই নতুন জন্মের স্বাদ
নিতে চায়

অথচ রাত্রির ছায়া ত্যাখো
টেলিগ্রাফ তারের মত
এদেশ-বিদেশ জুড়ে সাবেকি সটান
কে জানে কখন বুকের ভিতরের সেই
সযত্নে লালিত লাল হিসেবের খাতা
বিরাট সিন্দুকের কোন
অন্ধকার কোণে
একমাত্র নিজেকেই চিনে নিতে হয়
হয়তো সে ভাঁজ করা লাল খাতা কোনদিনই
সিন্দুকের দরজা পেরিয়ে
হিসেবী চোখের সামনে
কোনদিনই ধরা দেবে না

অথচ প্রত্যেক মুহূর্ত জুড়ে অস্থির ঘটনাবলী চিরদিন স্থির হয়ে আছে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বিষয়

কেউ কেউ স্বাভাবিক নয়
সমস্ত বয়েস আর স্রোতের আড়ালে
কোন সহজ সবুজ দ্বীপ জেগে থাকে
হাওয়া থাকে রোদ থাকে পাখী গান গায়
পাখীর অফিস নেই বাড়ী নেই রাত নেই
মাঝরাতে ট্যাক্সি পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নেই
ঘড়ি নেই এরোপ্লেন নেই
পাখী প্রবন্ধ লেখে না
কিন্তু এসব কোন বিষয় নয়

সেই রাজবাড়ী সাজানো বাগান
শ্যাওলাধরা উলঙ্গ রমণী
সেতুগুলো ভেঙে গেছে
পূর্তমন্ত্রী অত্যন্ত তৎপর
কিন্তু এসব তাঁর বিষয় নয়

যেখানে পাখীও ওড়েনা
সময় শুধু সময়ের বিরুদ্ধতা
কথায় কথায় গড়ে ওঠে
রাজবাড়ী বাগান মন্দির মন্দিরের কারুকাজ
কিভাবে সমস্ত কিছু গড়ে ওঠে ভেঙে যায়
আবার ভাঙার জন্য গড়া শুরু হয়

এসবই সহজে ঘটে তবু এসব কোন বিষয় নয়
যা দিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়

সুব্রত রুদ্র

এই দিন ১৯৭৬

কঠোর বিরোধ তাঁর সপরিবার, উত্তাল এ কোন্ ঝলসানো
শ্মশান ?
চণ্ডাল বিকোয় না কাঠ, শুধু ধু ধু চিতা সর্বাঙ্গ সুন্দর।
কে কাকে পোড়াবে এবার ?
—দেশ ছেড়ে কিনা তর্ক করে না ; শ্মশান ছাড়ারও পাড়ি !
এ রকম মাঝে হ'লে নিরাশ্রয়,
আর্তনাদ থেমে যায় পুরোপুরি ভাবে।
এই দিন ব্যথার গৌরব নিয়ে চলেছে।

প্রমোদ বসু

ঐশ্বরিক অনুভূতিমালা

প্রভু আড়াল করলেন ঐশ্বর্য, আলো ধরলেন
অহংকারের মুখে

গর্বোদ্ধত চোখ হারিয়ে ফেললো দৃষ্টি
গর্বোদ্ধত বুক পুড়ে হল ছাই

প্রভু নিঃস্ব করলেন স্বপ্নের আধিপত্য
ঘুম চাইলো ভুল
যার ভুলই বিস্মরণ

স্মৃতি দেখলো তাঁর গোপন সর্বজ্ঞ কাঙালী বসন !

শেখর গঙ্গোপাধ্যায়

পারাপার

মাঠটুকুই বিপদ।
সারাক্ষণ সূর্যের অক্লান্ত হিংস্রতা
দহন করে শব্দকে নির্মম।
তার ওপারেই আছে বাড়ির
স্নিগ্ধ অবকাশ, সন্ধ্যার
নির্জন শান্তি।
কামিনী ফুলের ম-ম গন্ধে উত্তাল জ্যোৎস্না।
এপারে ঘোরলাগা অশেষ দুপুর
চোরাগর্তের ফাঁদ পেতেছে নিষ্ঠুর,
রক্তপাতহীন হত্যার শেষ উপকরণের চিতা
জ্বলছে আমাদের সব থেকে দুঃখের দিনে,
অথচ ওদিকে
ঝর্ণার রূপোলী অবসরে মুখ দ্যাখে প্রিয়তম চাঁদ,
মাঠটুকুই বিপদ।

গৌতম বসু

চিঠি

১.

খোলা বই, গত পুজোর পাপড়ি।
বন্ধ বই, মলাটের পুরোনো খবর।
মলাটের পুরোনো পাপড়ি, গত পুজোর খবর
পঙ্গু কাঁচ, গর্তে বাদামী জ্বলছে।

২.

হিমচোখে সেও এনেছে
    হাত ভ'রে বালির নিশ্বাস
প্রতিদিন ; দোরগোড়ায় এলোমেলো ছাঁট
কেউ আনন্দ নই   এতো সহজ প্রবেশ
    কেউ আর কথা নই

৩.

মেঘলা ছুটি,
        দেখা হবে আরাধনায়
তুমি মন্ত্র ডেকে আনো. সিঁড়িতে দুপুর ব'সে
পরিচয় খসে আসা একরাশ পাতার প্রণাম
    অচেনায়
        উদগ্র চূড়ায় বেড়ে ওঠে ঋণ
গোলপোষ্ট, পরিত্যক্ত চটি
পরিত্যক্ত শবের মতো মাঠ—
পেরিয়ে যান ধর্মরাজ, পায়ে পায়ে বিশোক কুকুর

অভিরূপ সরকার

আবর্তিত ভ্রমণ

আমপাতা, মৃন্ময় পাথর, সহজ আগুন
কতদিন ঢেউ জ্বলছে, কতদিন শৃঙ্খলা জ্বলছে
আমপাতা, বিস্তীর্ণ পাথর, ক্লান্ত আগুন
অনেক মাঙ্গলিক পেরিয়ে এলুম।

কবে একদিন বৃষ্টি হলো
এখনও একটা মাধবীলতার একা-একা নিরাসক্ত উদ্যম
ঋতুবদল, তাও শেষ নেই, ধুলো ঘুরছে
আবর্তিত মাঙ্গলিক, পঙ্গু মাটি একটা, বৃষ্টি

(২)

ঘরের ভিতর আমরা যখন এ-ওকে ডাকছি,
ঝড় উঠলো। দেখতে পেলুম না কেমন ক'রে
বৃষ্টি এগিয়ে আসছে, ধুলো-ছাই, সবুজ বনানী উড়ছে
ঘরের ভিতর আমরা যখন

এ-ওকে ডাকছি, আমাদের জন্মদিন বড়ো হলো।
বিকেল হলে দিঘি অব্দি হেঁটে যাওয়া, ফেরার পথে
ধানক্ষেত, নির্জনতা, মগ্ন ধানক্ষেত
ধুলো আমার রাখাল, আমি চাইব না।

সুরজিৎ ঘোষ

অসামাজিক

আমরা দু'জনে থাকি বসবার ঘরে থাকে তিনটে চেয়ার
কখন অতিথি এলে ব্যবহার হবে বলে চুপচাপ শূন্য সেজে থাকে
কেউ কারো আত্মীয় হয় না। শুধু যারা যারা এসে বসে
তাদের ওজন মতো কাৎ হয়, হেলে পড়ে আনন্দে প্রগল্‌ভ দুলে ওঠে।
আর যখন সপ্তাহব্যাপী ব্যস্ত থাকি নিজেদের বাগানের কাজে
গৃহিণী সমুদ্র হয়ে আনাচ কানাচ ভ'রে রাখে
বহুদিন বাইরে যাই না বাইরে থেকে মানুষ কি সৌহার্দ্য আসে না
তখন গভীর রাতে কারা যেন জড়ো হয় বসবার ঘরে,
সকলে জায়গা পায় না কেউ কেউ মেঝের ওপরে জোড়াসন
কেটে বসে, শুরু হয় ফিস্‌ফিস্ গম্ভীর আলাপ……

সকালে দরজা খুলে ঢুকে দেখি দু'জন চেয়ার খুব গলাগলি
বসে আছে তৃতীয়টি জানলার ধারে মুখ ঘুরিয়ে পেছন ফিরে
যেন গতরাতে সভাশেষে এ'রকম অবস্থান সাব্যস্ত হয়েছে।

বিশেষ নিবন্ধ চিঠিপত্র আলোচনা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রবোধচন্দ্র সেন শঙ্খ ঘোষ দীপংকর দাশগুপ্ত
আলোক সরকার অভিরূপ সরকার সুরজিৎ ঘোষ

একটি ব্যক্তিগত গদ্য রচনা

পৃথিবীতে কোনো বিশুদ্ধ চাকুরী নেই, শুদ্ধ ছুটিও কি আছে! আজকাল ছুটি শব্দটাকে তো আমার প্রায় গুজবের মতো মনে হয়। এবং গুজবে যখন কান দিতেই হবে তখন ছুটির জন্য একটা ক্রমবর্দ্ধমান আকুলতা, একটা গোপন সম্ভাবনা বাঁচিয়ে না রেখে উপায় নেই।

আমার আটবছরের ছেলে প্রতি শনিবার রাতে শুতে যাবার আগে বলে, কাল রবিবার, কাল আমার স্কুল ছুটি। অর্থাৎ তার মা তাকে কাল অন্যান্য দিনের মতো সূর্যের সঙ্গে ডেকে তুলবেন না। অথচ আমি তো জানি দুচারদিন অসুখবিসুখ বা যে কোন কারণে তাকে স্কুলে যেতে না দিলে সে হাঁপিয়ে ওঠে, ডাকঘরের বিষণ্ণ অমলের মতো জানলা দিয়ে কলকাতার অবশিষ্ট আকাশকে ছাখে। সুতরাং রবিবারকে ভালবাসলেও তার মনে ছুটি সম্পর্কে কোনো স্থির ধারণা গড়ে ওঠেনি। এই অস্থিরতারই কি অপর নাম শৈশব! একটা বয়সের পরে আমরা কি সবাই অল্পবিস্তর শৈশবে প্রত্যাবর্তন করি না। গাঁয়ের অঞ্চল প্রধান নদীটির পাশে মনভ্রমণে বেরিয়ে বলি নদী আমার সেই কিশোর সাঁতার মনে আছে? বালকসখা গাছটির নিচে বসে জানাই গাছ আমি তেমন ভাল নেই, তুমি কেমন? নদী কথা বলেনা, তবে স্রোত ও নৌকা দেখে বুঝি এখনো পারাপার চলেছে ছুটিহীন মানুষের। গাছের ফুল দেখে ভাবি এবারেও বসন্ত এলো। হয়তো এসবই ঘুমের মধ্যে ঘটে, কিন্তু এ সেই ঘুম যার মধ্যে স্বপ্ন নামক জাগরণটি রয়েছে। রয়েছে বলেই মেঘের কোলে রোদ হাসলে, বাদল টুটে গেলে ছুটির কথা মনে পড়তে পারে। অথচ ছুটি নেই, পরিপূর্ণ একটি স্বাধীন রবিবার, একটি নিটোল হলিডে আজ কতদিন কাছে আসেনি। কী ভীষণ ভালবাসতাম মানুষজনের সঙ্গ, বন্ধুর সঙ্গে তুলকালাম আড্ডা দিতে দিতে একবারও মনে পড়তো না ঘড়ি নামক গরীব সময়রক্ষীটির কথা। তখনতো আপাদমস্তক যৌবন, চলে যায় মরি হায় যৌবন নয় একেবারে দারুন দহন জ্বালা। চতুর্দিকে ছন্দ, ধ্বনি, শব্দের কস্তুরী, প্রতিটি পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথের গান। মনে হ'তো আমরা সবাই আছি, সবাই এরকমই থাকবো প্রিয় হোমো সেপিয়েন।

কিন্তু তারপরই একটানে গভীর সেই নিরাকার দিনযাপন থেকে কঠিন কঠোর

সংসারের সাকারে উঠে আসা! আজ বুঝতে পারি কি প্রবল ছিল সেই কারেন্সীপ্রবণ পৃথিবীর টান। একেবারে সটান দাঁড় করিয়ে দেখা চাকুরী নামক ধর্মাবতারের মুখোমুখী। দাঁড় করিয়ে দেয়া না বলে বোধ হয় দৌড় স্থরু করানো বললেই ভাল হতো। কেননা তারপর থেকেই আমি কেবলই দৌড়াচ্ছি, আর সে কি দৌড়, মাটিতে ছায়া পড়ছে কিনা তাও লক্ষ্য করবার সময় নেই। অথচ ছায়ার মতো কাছাকাছি থাকা ছেলে এখনো নতুন নতুন রবিবারের স্বপ্ন দেখে শনিবারে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যায়। রবিবার আসে। বিশাল এই কলকাতা সহরের অভিভাবক যে একটা রোগা নদী সেটা তাকে বিশ্বাস করাবো ভেবে গঙ্গাতীরে বেড়াতে নিয়ে যাই, দেখাই পণ্যবাহী জাহাজের বিদেশী মাস্তুল, বহুবার বলা আমার শৈশবের প্রাক্তন নদীটির গল্প আরো একবার বলি। এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে অন্য নদীর গল্প বলতে বলতে মনে পড়ে সেই অসম্ভব কাশফুল, চরের নতুন মাটিতে চীৎ হয়ে শুয়ে থাকা এক স্কুল পালানো নটবালকের কথা। দুচোখে ছোট ছোট অবাক অবিশ্বাস মাখিয়ে স্কুল পালানো অতীতের দিকে স্কুল না পালানো বর্তমান তাকিয়ে থাকে। এভাবেই রবিবার আসে, চলে যায়। জন্মদিন থেকে আমার দূরত্ব বাড়ে। অপঠিত থাকে একমাস আগের কেনা বই। অভিমানী রেকর্ডগুলোয় ধুলো গাছ হয়। গানের ভিতর দিয়ে কোথাও যাওয়া হয় না। আমার রয়েছে কাজ, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। কাজ মানে হয়তো কালকের একজিকিউটিভ মিটিং-এর প্রিপারেশন, আর বিশ্বলোক বলতে চোখের মণির মতো প্রিয় দুই শিশু, তাদের জননী, আমার আজন্মের চেনা পরিজন। আলমারির কাঁচের ভেতর থেকে কত প্রিয় কবি, কত ভাষাসিদ্ধ পুরোহিত আমাকে ডাকেন, আমি একবারও তাকাই না সেই মোহের দিকে। ছুটি কার আছে? গ্রহ, তারা, ধমনীর বহমান রক্ত, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস কারো ছুটি নেই। তাছাড়া আমি চল্লিশোর্ধ, পৃথিবীতে প্রায় তো প্রবাসী হয়ে এলাম। প্রতিটি ভুলের জন্য এখন ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়, কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না কাউকেই। সাতদিনের উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের পরেও তাই ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে যাই, রবিবাসরীয় বাজারের প্রতিটি জিনিস স্ত্রীর কথামত কিনে আনি। তার ভুল মাপের কেনা অঙ্গাভরণ নির্বিকার ফেরৎ দিয়ে বদলে নিয়ে আসতে দ্বিধা বোধ করি না। প্রায় প্রবাসী হয়ে ওঠা এজীবন আর কারো সঙ্গে বদলানো যাবে না। অপ্রয়োজনে

কথা বলতে তাই লাগে না ভাল। তবু কারণ অকারণে ছোট ছেলে আপনমনে গান গায়, সেই সুরের ভগ্নাংশে ঘরের মধ্যে উথলে ওঠে এক ভয়ংকর সুদূরতা! লোভীর মতো তার অংশ চাই, কিন্তু কাছে গেলেই লজ্জায় সে মুখ লুকোয়। আমি তাকে না থেমে গেয়ে যেতে বলি, চুপ করে থাকা তার দুষ্টু চোখ হাসে। ওকে কোলে নিয়ে ঠাকুরঘরে যাই, ওর দাদু দিদা অর্থাৎ আমার মা বাবার ছবির পাশে প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি ; আশেপাশে বংশানুক্রমে জমে ওঠা আরো নানান ভারতীয় ভগবানের ছবি। আমার স্ত্রীও ঘরে ঢুকে ওকে গাইতে বলে, আধভাঙ্গা উচ্চারণে রামকৃষ্ণের প্রিয় একটা গান। কিন্তু গানের বদলে হঠাৎ ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করে 'মা দাদু দিদা কি ঠাকুর? দাদু দিদার ছবি কেন ঠাকুরের পাশে রেখেছো মা?' মা বলেন, 'যাঁরা বেঁচে নেই তাদের ছবি ভগবানের পাশে রাখতে হয়।' ছেলের প্রশ্ন 'ভগবান কবে মরে গেছে মা?'

দার্শনিক, অদ্ভুত, কিন্তু আমি তড়িতাহতের মতো কেঁপে উঠি পবিত্র এই প্রশ্নে। তৎক্ষণাৎ শিশুকে কোলে নিয়ে ছাদে যাই। খুব আস্তে বলি 'দাদু দিদার তো ছুটি হয়েছে বাবা, তাই তাঁরা তাঁদের বাড়িতে গেছেন ; 'দেখো একদিন আমারও ছুটি হবে।'

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চিঠিপত্র

[শতভিষার দ্বিচত্বারিংশ সংকলনে প্রকাশিত শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত-এর প্রবন্ধ "বাংলা ছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর" প্রসঙ্গে মান্যবর প্রবোধচন্দ্র সেনের মূল্যবান চিঠিটি এবারে প্রকাশিত হলো। কথা প্রসঙ্গে শ্রীসেন শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ-এর ছন্দ বিষয়ক রচনার প্রতিও দু-একটি মন্তব্য করেছেন। আমরা চিঠিটি তাঁদের দেখিয়েছিলাম। শ্রীচক্রবর্তী কোন উত্তর দেননি। শঙ্খ ঘোষ এবং দীপংকর দাশগুপ্ত-এর উত্তর দুটি এখানে প্রকাশিত হলো। ঐ একই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে শ্রীপবিত্র সরকারের যে চিঠিটি গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো তার যে উত্তর লেখক দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে শ্রীসরকার একটি প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছেন। লেখকের এবারের উত্তরসহ সেই চিঠিটি শতভিষার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রতিদিন আমাদের দপ্তরে বিভিন্ন লেখার বিষয়ে অজস্র চিঠিপত্র আসছে। যোগ্য লেখাগুলি যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শতভিষা]

উদীয়মান ছান্দসিকদের প্রতি—*

শতভিষায় (১৮৮২ আষাঢ়) প্রকাশিত 'বাঙলা ছন্দ' প্রবন্ধটি সম্পর্কে সেদিন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে বড় ভাল লেগেছিল। বোধ করি তোমাদেরও ভাল লেগেছিল। তাই তো অনুরোধ করেছিলে আলোচনার সারমর্ম লিখে দিতে। দ্বিধান্বিত মনে সম্মতিও জানালাম। দ্বিধা, কেন না মুখে বলা যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়—বিশেষত: এই বয়সে যখন 'পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে।' কিন্তু কথা যখন দিয়েছি তখন লিখতেই হবে। কিন্তু কলম নিয়ে যখন বসলাম তখন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় আশি সত্যিই আসি-আসি করছে। মন এগিয়ে চললেও হাতের কলম এগোতে চায় না। রসনা চালনা যত সহজ, লেখনী চালনা তত সহজ নয়।

* শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত ও শ্রীআলোক সরকারকে লেখা চিঠি।

তাই ঠিক করেছি সংক্ষেপে কাজ সেরেই কথারক্ষা করব। অর্থাৎ লাঠি না ভেঙেই সাপ মারব। উদ্দেশ্যটা মহৎ সন্দেহ নেই।

প্রথম চিন্তা কাজের কথাটা শুরু করি কি দিয়ে। প্রবন্ধটা পড়ে এক দিকে যেমন মনটা খুসিতে ভরে গিয়েছে, অন্য দিকে মনটা তেমনি কতকগুলি বিষয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে 'গুঞ্জরিয়া কহে—নহে, নহে, নহে।' কাজেই স্থির করেছি —'মনেরে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে'। কিন্তু ভাল আগে, না মন্দ আগে ? সেও এক সমস্যা। শেষে কপাল ঠুকে ঠিক করলাম বাঙালির ভোজের নীতি অনুসরণ করাই সমীচীন। শুক্ত দিয়ে শুরু, আর মধুরেণ সমাপয়েৎ। এই চিরন্তর নীতি অনুসরণ করলে কারও কিছু বলার থাকে না। বিশেষতঃ পরিবেশনের শেষাংশে যখন ঢালাও উপকরণের সমাবেশ।

প্রথমেই মনে এল আমাদের আধুনিক ছান্দসিকরা কি সত্যিই প্রগতিশীল ? কেমন যেন সন্দেহ হয়, মুখে প্রগতিবাদী হলেও চিন্তায় তাঁরা প্রগতিশীল নয়। প্রাচীন ভারতের এক রাজাকে সেকালে বলা হত 'ধর্মবাদী অধার্মিকঃ'। আধুনিক বাঙলা ছান্দসিকদেরও কি তেমনি বলা যায়, কথায় প্রগতিবাদী হলেও চিন্তায় তাঁরা প্রগতিহীন ? একজন অস্তায়মান জরাজীর্ণ ছান্দসিকের পক্ষে উদীয়মান তরুণ ছান্দসিকদের সমন্ধে এমন নির্মম মন্তব্য করা হয়তো খুবই দুঃসাহসের, এমন কি নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে গন্য হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পরপারের দিকে যে এক পা এগিয়ে দিয়েছে তার আর ভয় কিসের ? অতএব—'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।' প্রথমেই বলতে হয় কথায় প্রগতিবাদী হওয়া সহজ, কিন্তু চিন্তায় প্রগতিশীল হওয়া সহজ নয়, বরং কঠিন শ্রম, অধ্যাবসায় ও সাহসের কাজ। আধুনিক ছান্দসিকদের চিন্তায় তারুণ্যোচিত সাহসের পরিচয় পাই না, তাঁদের মন যেন বার্ধক্যসুলভ ভীরুতাগ্রস্ত। ভাবলে অবাক হতে হয় এঁদের তুলনায় সুপরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা কত বেশি প্রগতিশীল ছিল, তাঁর মন কত সহজে সাহসিকতায় পূর্ণ ছিল। এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বোঝাতে চেষ্টা করি।

ছন্দশাস্ত্র একটি পরিভাষা-নির্ভর প্রাকরণিক বিদ্যা। তাই পরিভাষা-প্রয়োগে অসতর্কতা ঘটলে ছন্দশাস্ত্রের কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। দীপংকর দাশগুপ্তের লেখায় এই অসতর্কতাই ঘটেছে বারবার। তার একটা লক্ষণ দুই

চিন্তাধারার দু-রকম পরিভাষার একত্র সমাবেশ ঘটানো। ফলে দুই নৌকায় পা-রাখার যা অনিবার্য পরিণাম, তাই ঘটেছে নানা স্থানে। তিনি স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"এই প্রবন্ধে 'অক্ষর' শব্দটি **সর্বদাই** 'Syllable' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।" কিন্তু তিনি 'অক্ষরবৃত্ত' শব্দটি তো syllabic অর্থে প্রয়োগ করেন নি। কি অর্থে যে করেছেন তাও কোথাও বুঝিয়ে বলেন নি। এই নামে যে 'ছন্দের সঠিক প্রকৃতি চেনা যায় না', তাও অস্বীকার করেন নি। তবু তিনি এই নামটিই বহাল রেখেছেন তার কারণ "নামটি অত্যন্ত পরিচিত"। এই মনোভাব কি রক্ষণশীলতারই পরিচয় নয়? নীরেন্দ্র চক্রবর্তী এবং শঙ্খ ঘোষের আলোচনাতেও এই রক্ষণশীলতাই সুপ্রকট। অথচ বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অসংকোচেই বলেছেন (১৯৩২)—"আক্ষরিক [অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত] ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।...অক্ষরের সংখ্যাগণনা ক'রে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।" মজা এই যে, সিলেব্‌ল্ অর্থেই হক আর প্রচলিত বাংলা অর্থেই হক, অক্ষরসংখ্যা গণনা ক'রে যে তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দেরও মাত্রাসংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, এ বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ ও দীপংকর, তিনজনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত। অথচ উক্ত তিনজনই অক্ষরবৃত্ত নামটিকে পরম মমতা সহকারে আগলে রেখেছেন। কিমাশ্চর্যম্ অতঃ পরম্। প্রচলিত রীতি-নীতি বা পরিভাষার প্রতি এই যে মমত্ববোধ, তাকে আর যাই বলা যাক প্রগতিশীলতা বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলা যায় না।

দীপংকর open ও closed syllable অর্থে যথাক্রমে মুক্ত অক্ষর ও রুদ্ধ অক্ষর কথা-দুটি ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় ভাষায় যুক্তাক্ষর ও অযুক্তাক্ষর আছে, মুক্তাক্ষর ও রুদ্ধাক্ষর বলে কোনো বস্তু ভারতীয় ভাষায় নেই। মুক্তাক্ষর ও অযুক্তাক্ষর কথা-দুটির ইংরেজি হতে পারে, এটুকু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে অক্ষর শব্দ সিলেব্‌ল্-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ ভারতীয় মনে আধুনিক সিলেব্‌ল্-এর কোনো ধারণাই ছিল না। ফলে ভারতীয় ভাষায় মুক্তরুদ্ধ-নির্বিশেষে সিলেব্‌ল্‌বোধক কোনো শব্দের অভাবও অনুভূত হয় নি। অক্ষর শব্দের দ্বারা অনেক সময় open syllable বোঝালেও কখনও closed syllable বোঝায় না। 'প্রতী' শব্দের 'প্র' যুক্তাক্ষর, 'তী' অযুক্তাক্ষর; দুটিই open syllable। 'তীব্র' শব্দেও দুটি অক্ষর—তী, ব্র, যথাক্রমে অযুক্ত ও যুক্ত;

দুটিই open। কিন্তু 'তীব্র' শব্দের উচ্চারণরূপ ('তীব্' 'র') অনুসারে এই শব্দের দুটি উচ্চারণ বিভাগের কোনো ভারতীয় নাম নেই। শব্দের উচ্চারণ বিভাগ মানেই syllable। আমি তাই syllable অর্থে 'দল' শব্দ ব্যবহার করি। 'দল' শব্দের ধাতুগত আসল অর্থ অংশ, খণ্ড, বিভাগ, সোজা বাংলায় টুকরো। 'তীব্র'শব্দকে উচ্চারণ অনুসারে ভাঙলে পাই 'তীব্' ও'র' এই দুই টুকরো। সুতরাং তীব্র শব্দের এই দুই টুকরোকে (অর্থাৎ উচ্চারণবিভাগ বা সিলেব্‌ল্‌কে) দুই দল বলা অসংগত নয়। তাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ-অভিধানের নির্দেশ অব্যাহতই থাকে। ফলে 'দিন', 'মেঘনাদ', 'বিন্ধ্যাচল' ও 'রবীন্দ্রনাথ'. শব্দকে যথাক্রমে একদল, দ্বিদল, ত্রিদল ও চতুর্দল শব্দ বলে বর্ণনা করলে কারও মনে খটকা লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু উক্ত চারিটি শব্দকে যথাক্রমে একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করলে বিভ্রান্তি ঘটা অবশ্যম্ভাবী। দীপংকর বলেছেন—"ভাষাবিজ্ঞানে 'অক্ষর' শব্দটি syllable-এর একটি স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দ।" আমার প্রশ্ন স্বীকৃত কবে থেকে ও কোন্ যুক্তিতে? আমি মনে করি 'অক্ষর' শব্দ সিলেব্‌ল্-এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ বলে স্বীকার্য নয়, কারণ তার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। অক্ষর-কে সিলেব্‌ল্ অর্থে গ্রহণের পক্ষে কেউ কখনও কোনো যুক্তি দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আমি যতদূর জানি আচার্য সুনীতিকুমারই ভাষা-বিজ্ঞান আলোচনায় সর্বপ্রথম 'অক্ষর' শব্দকে সিলেব্‌ল্ অর্থে প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তার অনুকূলে কোনো বিচারসহ যুক্তি দেখান নি। তার বয়সও খুব বেশি নয়, বোধকরি পঞ্চাশ বছরও হয় নি। সুনীতিকুমারের অনুবর্তী ভাষাবিজ্ঞানপন্থীরা ছাড়া আর কেউ অক্ষর শব্দকে সিলেব্‌ল্ অর্থে প্রয়োগ করেন নি,এখনও করেন না। যাঁরা 'অক্ষর'কে সিলেব্‌ল্-এর'স্বীকৃত' প্রতিশব্দ বলে মেনে নেন তাঁদের মনোভাব রক্ষণশীলতারই পরিচায়ক, প্রগতিশীলতার বা বিচার-পরায়ণতার নয়। আর যদি একান্তই ভাষাবিজ্ঞানের দোহাই দিতে হয় তবে আমি বলব, তা হলে সিলেব্‌ল্‌বোধক 'অক্ষর' শব্দটা একান্তই ভাষাবিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকুক, ছন্দের এলাকায় তার অনধিকার-প্রবেশ কেন? যদি তর্কটা এই হয় যে—ছন্দশাস্ত্রও তো ভাষাবিজ্ঞানেরই অঙ্গ, তা হলে আমার পাণ্টা উত্তর হবে—ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 'অক্ষর' শব্দের বদলে 'দল' শব্দ চালানোই যুক্তি-সংগত। কারণ সিলেব্‌ল্ বোঝাবার পক্ষে 'অক্ষর' শব্দের চেয়ে

'দল' শব্দেরই যোগ্যতা বেশি। মোট কথা, ভাষাবিজ্ঞানেই হক আর ছন্দশাস্ত্রেই হক, আমি 'অক্ষর' শব্দকে নির্বিচারে সিলেব্‌ল্ অর্থে মেনে নেবার পক্ষপাতী নই; কেন নই, তা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

মজার কথা এই যে, আধুনিক ছান্দসিকদের মধ্যে মতবৈষম্য দেখা যায় যথেষ্ট, তাঁদের বিচারপরায়ণতা তথা প্রগতিশীলতার তারতম্যও কম নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। দীপংকর যাকে বলেন মুক্ত অক্ষর ও রুদ্ধ অক্ষর, নীরেন্দ্রনাথ তাকেই বলেন মুক্ত সিলেব্‌ল ও রুদ্ধ সিলেব্‌ল্ আর শঙ্খ ঘোষ বলেন মুক্তদল ও রুদ্ধদল। দেখা যাচ্ছে সিলেব্‌ল্ অর্থে 'দল' শব্দ গ্রহণে নীরেন্দ্রনাথের দ্বিধা আছে, শঙ্খ ঘোষের নেই। অন্যান্য বিষয়ের বিচারেও মনে হয় ছন্দবিচারের ক্ষেত্রে শঙ্খ ঘোষের মনোভাবই যেন মোটের উপর সর্বাধিক যুক্তিনিষ্ঠ। কিন্তু এই শঙ্খ ঘোষও যখন বলেন—"অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলি আরো কিছুদিন বাঙলা ছন্দ-বিচারের আসর জুড়ে থাকবে বলে অনুমান করা অসংগত নয়" তিনিও তাই চালাতে চান—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়। হায় রে, বিচারযুক্তির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে বৃদ্ধ ছান্দসিকের দ্বিধা নেই, কিন্তু সাহসিকতম তরুণ ছান্দসিকেরও কেন এই দ্বিধাজড়িত চরণক্ষেপ? কেন তাঁর কম্পিত কণ্ঠে এই ভীরু স্বীকারোক্তি? হায় শঙ্খ, তুমিও যদি বলিষ্ঠতর লেখনী হস্তে এগিয়ে না আস তবে এই বৃদ্ধ ছান্দসিক বল পাবে কোথায়? নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে তাঁর কানে কি একটুও সাহসিকতার বাণী পৌঁছবে না? শুধু শঙ্খ কেন? নীরেন্দ্রনাথ, দীপংকর, বীরেন রক্ষিত, নির্ভীক ছন্দচিন্তার রথরশ্মি তো তোমাদের হাতেও। তোমরাই বা কেন, কোন্ অজানা জুজুর ভয়ে এমন দ্বিধান্বিত? তোমরাও কি শাণিত চিন্তার খড়্গাঘাতে রক্ষণশীল সংস্কারের জড়তাকে ছিন্ন ক'রে নিঃসংকোচ বিচারনিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে পার না? তোমাদের কণ্ঠে তো নিয়তই ছন্দোমুক্তির বাণী শুনতে পাই উচ্চগ্রামে, কিন্তু চিন্তামুক্তির ক্ষেত্রে তোমাদের কণ্ঠস্বরে এমন ক্ষীণতা কেন?

ওই দেখ, চিঠি লিখতে বসে চিন্তার বল্‌গা কখন যে আলগা হয়ে গেছে, আর কলম ছুটেছে অপথে বিপথে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। এবার মূল কথায় ফিরে আসি। নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ, দীপংকর, তিনজনেই লেখেন 'স্বরবৃত্ত'। কিন্তু 'স্বরবৃত্ত' কথাটার মানে কি, কেন স্বরবৃত্ত নাম দেওয়া হয়েছিল, আর কেনই বা

তার বদলে এখন 'দলবৃত্ত' বলা হয়, তার কোনো আভাসও তাঁরা দেন নি তাঁদের আলোচনায়। নীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, যে রীতির ছন্দ মূলতঃ সিলেব্‌ল্‌-মাত্রার হিসাবেই গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তারই নাম স্বরবৃত্ত। এ রীতির ছন্দকে সিলে-ব্‌ল্‌বৃত্ত' না বলে 'স্বরবৃত্ত' বলা হবে কেন, তা তিনি বলেন নি। সিলেব্‌ল্‌কে 'দল' বলতে শঙ্খ ঘোষের দ্বিধা নেই। কিন্তু তবু এ রীতির ছন্দকে 'দলবৃত্ত' বলতে তাঁর দ্বিধা! তাও এক বিস্ময়। আমার চেয়েও বয়সে কিছু বড় দিলীপ-কুমার এ বিষয়ে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, শঙ্খ ঘোষের সে সাহসটুকুও হল না কেন ভাবলে দুঃখ ও নৈরাশ্য বোধ হয়।

'মাত্রা' শব্দের প্রয়োগেও ওই একই শৈথিল্য দেখা যায়। নীরেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের রীতিভেদে দু-রকম মাত্রার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন—অক্ষর-মাত্রা ও সিলেব্‌ল্‌-মাত্রা। অর্থাৎ তিনি 'মাত্রা' শব্দকে unit of measure অর্থেই ব্যবহার করেন। তাঁর মতে কোনো কোনো ছন্দের মাত্রা 'অক্ষর' (বিশুদ্ধ বাংলা অর্থে), আর-এক শ্রেণীর ছন্দের মাত্রা সিলেব্‌ল্‌। মানে এক শ্রেণীর ছন্দকে বলা যায় অক্ষরমাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত, আর অন্য শ্রেণীর ছন্দকে বলা যায় সিলেব্‌ল্‌-মাত্রক বা সিলেব্‌ল্‌বৃত্ত। এ পর্যন্ত তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা সুস্পষ্ট, বুঝতে কষ্ট হয় না। তার পরেই পাঠকের মনে খটকা লাগে। প্রথমতঃ মনে প্রশ্ন জাগে সিলে-ব্‌ল্‌বৃত্তকে 'স্বরবৃত্ত' বলা হয় কেন? তার উত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, নীরেন্দ্রনাথের মতে অক্ষরমাত্রিক ছন্দেরও দুটি শাখা। এক শাখায় 'পশ্চিম' শব্দে 'প' 'শ্চি' 'ম্‌' এই তিন অক্ষরমাত্রা (বাংলার চিরাগত রীতি অনুসারে), আর অন্য শাখায় 'পশ্চিম' শব্দে চার অক্ষরমাত্রা—'প' 'শ' 'চি' 'ম্‌' (রবীন্দ্রস্বীকৃত রীতি অনুসারে)। এ ক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন জাগে অক্ষরমাত্রিক ছন্দের দুই শাখায় অক্ষর সংখ্যা গণনায় এই পার্থক্য ঘটে কেন? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, বাংলার ছন্দে এই শাখাই যদি অক্ষরমাত্রিক হয়, তবে এই দুই শাখাকেই 'অক্ষরবৃত্ত' না বলে এক শাখাকে 'অক্ষরবৃত্ত' আর অন্য শাখাকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলার সার্থকতা কি? নীরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে রবীন্দ্রনাথও 'মাত্রা' শব্দটি unit of measure অর্থেই ব্যবহার করেছেন সর্বত্র, সমভাবে। তবে তিনি সিলেব্‌ল্‌মাত্রা বা সিলেব্‌ল্‌মাত্রক ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। এই শ্রেণীর ছন্দকে তিনি বলতেন 'বাংলা প্রাকৃত' রীতির ছন্দ। অন্য দুই শ্রেণীর

ছন্দকে তিনিও এক সময়ে অক্ষরমাত্রক বলে মনে করতেন, তাই ওই দুই শ্রেণীকে দুই নাম দেন নি। উভয়কেই তিনি বলতেন 'সাধু' রীতির ছন্দ। এই হিসাবে তাঁর মনোভাব ছিল অধিকতর যুক্তিসংগত। পরবর্তীকালে তিনি 'অক্ষরমাত্রা'র ধারণা ত্যাগ ক'রে ছন্দের পরিমাপ করতেন 'ধ্বনিমাত্রা'র হিসাবে। যাকে আমি বলি 'কলা' (mora), তাকেই তিনি বলতেন 'ধ্বনিমাত্রা'। উচ্চারণভেদে এক শ্রেণীর সাধু ছন্দে 'পশ্চিম' শব্দে তিন ধ্বনিমাত্রা, অন্য শ্রেণীর সাধু ছন্দে ওই শব্দই হয় চার ধ্বনিমাত্রা।

দীপংকরও 'মাত্রা' শব্দকে unit of measure অর্থেই প্রয়োগ করেন। যেমন, তাঁর মতে 'অক্ষরবৃত্ত' পয়ারে থাকে ৮+৬ মাত্রা। কিন্তু কোন্ বস্তুকে তিনি মাত্রা (unit) হিসাবে গ্রহণ ক'রে পয়ার-পঙ্‌ক্তিতে ১৪ মাত্রা গঠন করেন তা বোঝার উপায় নেই। 'অক্ষরমাত্রা' নিশ্চয়ই নয়, কারণ তাঁর মতে 'অক্ষর' মানে সিলেব্‌ল্। তবু তিনি এই ছন্দোরীতিকে কেন 'অক্ষরবৃত্ত' বলেন বোঝা কঠিন। যে ছন্দোরীতিকে তিনি বলেন 'মাত্রাবৃত্ত', তার unit কি তাও বোঝা দুঃসাধ্য। আর যে ছন্দোরীতিকে তিনি বলেন 'স্বরবৃত্ত', তাকেই কেন তাঁর স্বীকৃত পরিভাষায় 'অক্ষরবৃত্ত' বলা হবে না তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শঙ্খ ঘোষের ন্যায় অসামান্য শ্রুতিধর ছন্দোদর্শী ছন্দের বিশ্লেষণে যে বিস্ময়কর বিচারপরায়ণতা ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, পরিভাষা নির্বাচন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সে বিচার প্রতিভা ও ধীশক্তি সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় হয়ে সনাতন নাম-মালার আড়ালেই আশ্রয় গ্রহণ করল, এটা শুধু যে ক্ষোভের বিষয় তা নয়, তার ফলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিও শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ছন্দপ্রতিভার এই দ্বিমুখী আচরণের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি।

এই তো গেল প্রধান পরিভাষাগুলির কথা। এবার দীপংকরের কয়েকটি গৌণ পরিভাষার কথা বলি! 'বৃত্ত' শব্দের প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র মতে ছন্দের দুটি প্রধান শাখার নাম অক্ষরবৃত্ত (বা বর্ণবৃত্ত) ও মাত্রাবৃত্ত। 'বৃত্তছন্দ' নামে স্বতন্ত্র শাখার অস্তিত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি সব ছন্দশাস্ত্রেই 'ছেদ' ও 'যতি' অভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। অভিধানেও তাই। ভাবযতি ও ছন্দোযতির জন্য দুই নাম অনাবশ্যক,

অভিন্নার্থক দুই শব্দকে দুই ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করলে বিভ্রান্তি ঘটে। এক জাতীয় গাছকে বৃক্ষ আর অন্য জাতীয় গাছকে তরু বলা চলে না। ইংরেজিতে sense pause ও metrical pause-এর জন্য দুই নাম দরকার হয় না। বাংলাতেও ভাবযতি ও ছন্দোযতি বললেই কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না। 'সুর-প্রস্বর' কথাটা সুষ্ঠু নয়। 'সুর' শব্দ আসলে 'স্বর' শব্দের তদ্‌ভব রূপ। তাই 'সুরলিপি' না বলে 'স্বরলিপি' বলা হয়। কিন্তু 'স্বর প্রস্বর' কথাটা বিভ্রান্তিকর। 'গীতিপ্রস্বর' বললেই উদ্দিষ্ট অর্থ (pitch accent = musical accent) বুঝতে কষ্ট হয় না। Duration accent স্বতন্ত্র বস্তু। বাংলায় বলা যায় 'ব্যাপ্তি প্রস্বর'। 'পর্বাঘাত' বলবার প্রয়োজন কি ? পর্ব প্রস্বর (Foot accent বা foot stress) বললেই তো পর্বসূচক প্রস্বর বোঝা যায়। 'পর্বাঙ্গ' শব্দটাকে সুষ্ঠু মনে করি না। 'উপপর্ব' বললেই অভিপ্রেত অর্থ বোঝা সহজ হয়, অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে না। সবচেয়ে আপত্তিজনক উক্তি "অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত"। কাঁঠালের আমসত্ত্ব যেমন অসম্ভব, অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্তও তেমনি অসম্ভব। দীপংকর নিজেই বলেছেন, "তখনকার মাত্রাবৃত্ত ছিল প্রকৃতপক্ষে অক্ষরবৃত্ত" ; অন্যত্র বলেছেন, "অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্তকে আমরা মাত্রাবৃত্ত মনেই করি না।" তাই যদি হয় তবে অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত নামে কোনো অদ্ভুত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজনই বা কি ? "অক্ষরবৃত্ত- দু-রকমের—পয়ারভিত্তিক ও অ-পয়ারভিত্তিক"—এই উক্তিটাও বিভ্রান্তিকর। মনে হয় দীপংকরের মনে 'পয়ার' নামের অর্থ নিয়েই একটা বিভ্রান্তিকর জটিলতা দেখা দিয়েছে। 'পয়ার' আসলে ত্রিপদী চৌপদীর ন্যায় একটা ছন্দোবন্ধের নাম। কেন না, আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী ছন্দোবন্ধেরই প্রচলিত নাম পয়ার'। আজকাল আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী বন্ধ 'মহাপয়ার' নামে পরিচিত হয়েছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও পরে বুদ্ধদেব 'পয়ার' শব্দকে বিশেষ ছন্দোরীতির নাম হিসাবে ব্যবহার করার ফলে আমাদের ছন্দচিন্তায় একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। 'ছন্দ পরিক্রমা' গ্রন্থে বারবার এই ভ্রান্তিমোচনের প্রয়াস করেছি। 'কবিতার ক্লাস' বই-এর শেষ অধ্যায়ে নীরেন্দ্রনাথ নিঃশেষে এই ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়েছেন। তার পরেও দীপংকর কেমন ক'রে 'পয়ার' নামে এমন অস্পষ্টতা ঘটালেন সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। 'পয়ার' একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধের (৮+৬ মাত্রার অথবা ৮+১০ মাত্রার)

নাম একথা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে—শুধু তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত নয়, তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত রীতির ছন্দকেও পয়ার ও অ-পয়ার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। সহজ সত্য কথা এই যে দীপংকরের প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অস্পষ্টতা প্রায় সর্বত্রই তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে অবিশেষজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ভাষার অস্বচ্ছতা ভেদ করে লেখকের মূল্যবান্ সিদ্ধান্তগুলির মর্মোদ্ঘাটন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাঁরা তা করতে সমর্থ হবেন তাঁরা যে এই প্রবন্ধ পড়ে প্রসন্ন হবেন তাতে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ আমি যে অনেক নূতনতর তথ্যের সন্ধান পেয়ে উপকৃত হয়েছি, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতায় আনন্দিত হয়েছি, তা অসংকোচেই স্বীকার করব। কিন্তু চিঠির দৈর্ঘ্য এর মধ্যেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' পর্বটা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবু এটুকু বলা উচিত যে, দীপংকর পর্বযতিলোপের বিষয়টা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করেছেন দেখে খুশি হয়েছি,যদিও 'যতিলোপের প্রত্যাঘাত' স্বীকারের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। আবার রবীন্দ্রকথিত 'তিন মাত্রার ছন্দে' উপযতি-লোপের (পর্বযতিলোপের নয়) সার্থকতা অস্বীকার করার কারণও দেখি না। অনেক কাল আগেই এ বিষয়ের আভাস দিয়েছিলাম (দ্র 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা', পৃ ৯৩)। প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে পুনরুত্থাপন করা যাবে। আজ এখানেই সংযম অবলম্বন করছি।

রুচিরা
শান্তিনিকেতন
১৮ই কার্তিক, ১৩৮২

অস্তায়মান ছান্দসিক
প্রবোধচন্দ্র সেন

সম্পাদক সমীপেষু

ছন্দ নিয়ে যদি দুচার লাইনও লিখে বসেন কেউ, আর সে-লেখা যদি চোখে পড়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের, সন্দেহ নেই যে তাহলে খুশী তিনি হয়ে উঠবেন একেবারে ছেলেমানুষের মতো। হয়তো তাঁর মনে হয় তখন, তাঁর নিঃসঙ্গ ছন্দ-চর্চার জগতে এই বুঝি একজন সঙ্গী মিলল শেষ পর্যন্ত। এই সঙ্গীর অধিকার কতদূর, সামর্থ্য কতদূর, সে বিচার করবার আর ইচ্ছে থাকে না তাঁর। তিনি হাত বাড়িয়ে টেনে নেন এই আগন্তুককে, আর তারপর, বড়োই বেশি আশা করে বসেন তার সম্পর্কে। আমিও সেইরকমই একজন, অযোগ্য, কিন্তু তাঁর অলীক আশার পাত্র।

এই দশ-পনেরো বছর জুড়ে বাঙলা কবিতার ছন্দ নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আমি লিখেছি। লিখবার সময়ে আমাকে ভেবে নিতে হয়েছিল কয়েকটি কথা। আমি কী লিখতে চাই? বাঙলা ছন্দের আলোচনা নির্দিষ্ট একটা পথ পাবার চেষ্টা করছে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে। এই পথ তৈরি করবার কাজে প্রধানতম পুরুষ প্রবোধচন্দ্র সেন নিজেই। তর্কচ্ছলে সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, দিলীপকুমার। ছন্দসূত্র তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন অমূল্যধন কিংবা সুধাভূষণ অথবা তারাপদ ভট্টাচার্য। বাঙলা ছন্দের শ্রেণী কটি, কী তাদের চরিত্র, কী হওয়া উচিত এদের নাম : এ নিয়ে বিস্তর তর্ক আমরা শুনেছি। আমি মনে করি যে প্রবোধচন্দ্রই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাবে এ-সব প্রশ্নের মীমাংসার দিকে পৌঁছে দিচ্ছেন আমাদের, একদিনে নয়, ক্রমশ। তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন বিস্তর, পালটে নিচ্ছেন অনেক সময়ে তাঁর পূর্বতন কোনো সিদ্ধান্ত। আজ এই পরিণত বয়সেও সচল আর প্রশ্নাতুর তাঁর মন, অসম্ভব নয় যে তাঁর এই মুহূর্তের সিদ্ধান্তগুলিরও দু'একটি আবার পালটে যেতে পারে তাঁরই হাতে।

পূর্বতনদের এইসব লেখা, তর্ক, বিচার এ-সবই আমরা পড়ছি। কিন্তু আমি কী লিখব? আমার কী বিষয়? বাঙলা ছন্দের শ্রেণী বা নামের তর্ক নিয়ে আমার তেমন কিছু বলবার নেই। ছন্দের আলোচনায় আমার ছিল একটা অন্য আকর্ষণ। একজন কবি যখন লেখেন, সচেতন বা অবচেতন ভাবে তিনি ঝুঁকে পড়েন হয়তো বিশেষ কোনো ছন্দের প্রতি। কখনো কখনো এমনও হয় যে তিনি প্রচলিত ছন্দ-রূপগুলিকে ভিতর দিক থেকে ভাঙতে থাকেন নানা পদ্ধতিতে।

আমার কৌতূহল ছিল এইখানে, আমি দেখতে চেয়েছিলাম কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ছন্দের সম্পর্কের ধরনটা।

কিন্তু এই আলোচনায় পারিভাষিক নামগুলিকে তো আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। কী ভাবে তাহলে আমার পাঠকদের বোঝাব যে কোথায় কোন্ ছন্দের কথা আমি বলতে চাই? পারিভাষিক নাম তাই অবশ্যই চাই। আমাকে হয় বলতে হবে তানপ্রধান ধ্বনিপ্রধান শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ, নয়তো অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ছন্দ, আর নইলে মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত দলবৃত্ত ছন্দ। আরো নানা নামান্তর অবশ্য হতে পারে। প্রবোধচন্দ্র আমাকে ভর্ৎসনা করছেন এই বলে যে আমি ব্যবহার করেছি অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলি।

সে কথা ঠিক। অনেক ভেবে, আমার প্রবন্ধগুলিতে এই নামগুলিই আমি প্রয়োগ করছি। কেননা আমার অভিজ্ঞতায় এই দেখতে পাই যে, কবিতা বা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধের পাঠক যাঁরা তাঁরা সহজে বোঝেন এই নামগুলিই। বহু-দিনের ব্যবহারের ফলে এর একটা প্রয়োগযোগ্যতা দাঁড়িয়ে গেছে, খুব হাল আমলের বাঙলার ছাত্রছাত্রী ছাড়া কলাবৃত্ত-দলবৃত্ত নামগুলি এখনো সবার কাছে তত পরিচিত নয়। নামসমস্যাই যখন আমার মূল বিষয় নয়, তখন এই নবীন শব্দগুলি এনে কি পাঠকের সঙ্গে আরো অনেকখানি ব্যবধান তৈরি করব? সেটা আমার ঠিক সংগত মনে হয় নি। যেমন ABC-র বদলে XYZ বসিয়ে দিলেও একটি ত্রিভুজকে একই রকম-ভাবে বোঝানো যায়, তেমনি আমার প্রবন্ধে অক্ষর-বৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত নামগুলির বদলে যে-কোনোদিন মিশ্রবৃত্ত কলাবৃত্ত দলবৃত্ত অথবা ওইরকম আর-কিছু ব্যবহার করা সম্ভব বলে মনে হয়। মনে হয় বাঙলা ছন্দের আলোচনায় নামসমস্যা নিয়ে বড়ো বেশি সময় চলে যাচ্ছে! এ-বিষয়ে যাঁরা যোগ্য, তাঁরা সে-সমস্যা নিয়ে ভাবুন। ইতিমধ্যে আমরা আর দু'একটি কথা বলে নিতে চাই, দেখতে চাই অন্য ধরনের দু'একটি সমস্যা। সেইজন্যেই এই দুর্ঘট।

শঙ্খ ঘোষ

সম্পাদক সমীপেষু

আমি প্রথম পরিচয় থেকেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের স্নেহ-আশীর্বাদ-ধন্য। 'বাঙলাছন্দ : রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর' (শতভিষা, ৪২ সংকলন,

১৩৮২) পাঠান্তে আমার ও আলোক সরকারের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় ধ'রে ছন্দোবিষয়ক নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন. তাঁর স্নেহের সুযোগ নিয়ে আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর মতামত লিখে জানাতে অনুরোধ করেছিলাম। আমার মতো অর্বাচীন ছন্দোজিজ্ঞাসুকে তিনি উপেক্ষা করেন নি ; বরং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মূল্যবান সময় ব্যায় ক'রে তিনি তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি পত্রাকারে নিবন্ধ ক'রে আমাকে আরও বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন। এবং এই প্রশ্রয় পেয়েছি ব'লেই আমার কৈফিয়ৎ অসংকোচে নিবেদন করছি।

প্রথমেই বলি যে 'পরিভাষা' তার তত্ত্বগত পটভূমিতেই অর্থবহ, অর্থাৎ, তাত্ত্বিক প্রয়োজনে 'আরোপিত সংজ্ঞার্থ' ছাড়া 'পরিভাষা' কোনো অর্থ বহন করে না। পারিভাষা যে-তাত্ত্বিক 'ধারণা'-কে ব্যক্ত করে তা শব্দের তথাকথিত 'অর্থ' দিয়ে প্রকাশ করা সাধ্যের অতীত। যে-পরিভাষার তত্ত্বগত পটভূমি ও সংজ্ঞার্থ পরিচিত. নিতান্ত প্রয়োজন না-হ'লে সে-পরিভাষার পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়, যেহেতু নতুন পরিভাষাও শেষপর্যন্ত 'তাত্ত্বিক প্রয়োজনে আরোপিত' সংজ্ঞার্থের দ্বারা অর্থবহ। 'অক্ষরবৃত্ত' 'স্বরবৃত্ত' 'মাত্রাবৃত্ত' এই পারিভাষিক নামগুলি প্রবোধচন্দ্র সেনের সৌজন্যেই প্রচলিত হয়েছিলো, এখন এত সুপ্রচলিত যে বর্তমানে এমন কোনো ছান্দসিক আছেন ব'লে জানিনা যাঁর কাছে এই পারিভাষিক শব্দগুলির সংজ্ঞার্থ অপরিচিত, যদিও ছন্দের প্রকৃতি ঐ শব্দগুলির সাধারণ 'অর্থ' ব্যক্ত করতে অক্ষম। 'মিশ্র-কলা-বৃত্ত (-মাত্রিক)', '(সরল) কলা-বৃত্ত (-মাত্রিক)', 'দল-বৃত্ত (-মাত্রিক)' প্রভৃতি নতুন পরিভাষাও 'আরোপিত সংজ্ঞার্থের'. দ্বারা অর্থবহ। তত্ত্বগত পটভূমি ও আরোপিত সংজ্ঞার্থ জানা না থাকলে 'দল', 'কলা' 'বৃত্ত' (বিশেষ ক'রে 'মিশ্র') শব্দগুলি অর্থহীন, কেননা প্রত্যেকটি শব্দেরই তথাকথিত 'অর্থ' একাধিক। এর বিকল্প হলো দীর্ঘ বর্ণনাত্মক নাম (তুলনীয়: তানপ্রধান রীতির ছন্দ, যা প্রায় সংজ্ঞার্থের সমতুল্য)। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক 'ধারণা' গুলিকে বর্ণনাত্মক নাম দিয়ে সর্বদা ব্যবহার করতে গেলে অনেক অসুবিধে এবং বহুক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। তাই, যে-সব পারিভাষিক নামের সংজ্ঞার্থ সুপরিচিত, আমি সেগুলো বাতিল না-করাই সংগত মনে করি।

Syllable-কে আমি 'অক্ষর' বলি এই জন্য যে এই পারিভাষিক শব্দটির

'আরোপিত সংজ্ঞার্থ' ছান্দসিকদের কাছে সুপরিচিত—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, তারাপদ ভট্টাচার্য এঁরা সবাই syllable-কে 'অক্ষর' বলেছেন। ভাষাবিজ্ঞানেও (বাঙলা তো বটেই, হিন্দীতেও) অক্ষর syllable-কেই বোঝায়। 'দল' শব্দটিও 'আরোপিত সংজ্ঞার্থ' ছাড়া অচল, কারণ দ্ব্যর্থকতা—'খণ্ড' অর্থের চেয়ে 'সমূহ' অর্থেই শব্দটি বর্তমানে বাঙলায় বেশী প্রচলিত (যেমন, একদল লোক, লোকদল, দলের লোক, লোকের দল ইত্যাদি)। উপরন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন নিজেই লিখেছেন. "……বৈদিক সাহিত্যের রচনাভেদে দল মানে হয় তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ। অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে যে 'দল' শব্দের দ্বারা রচনাভেদে ছন্দোবন্ধের দ্বিতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ সূচিত হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে।" (দ্রষ্টব্য : সিলেব্‌ল্ কে 'দল' বলি কেন/অমৃত, ৫।১।৭৫, পৃঃ ৩৫)। 'দল' শব্দটিও যখন দ্ব্যর্থক এবং আরোপিত সংজ্ঞার্থের মুখাপেক্ষী তখন দ্ব্যর্থকতার অভিযোগে অক্ষর-কে বাতিল করবো কেন? ছন্দ-আলোচনায় উচ্চারণ-পদ্ধতিই আলোচিত হ'য়ে থাকে, লেখনপদ্ধতির সঙ্গে তার সরাসরি যোগ নেই, সুতরাং 'অক্ষর' নিয়ে বিভ্রান্তির আশংকা অমূলক ব'লেই মনে করি। ব্রাহ্মীলিপির মূল রীতি syllabic, সম্ভবত এই কারণে সংস্কৃত অভিধানে 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' তুল্যমূল্য। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত সংস্কৃত-ব্যাকরণ-প্রবেশিকা (পুনর্মুদ্রণ ১৯১১, পৃঃ ৫) বইটিতে লেখা আছে, "ইংরেজিতে যাহাকে সিলেবল্ (syllable) বলে তাহার সংস্কৃত নাম অক্ষর।" সংস্কৃত ছন্দোবিষয়ক প্রমাণিক গ্রন্থ গঙ্গাদাস সূরী-প্রণীত 'ছন্দোমঞ্জরী'-র প্রথম উদাহরণে দেখতে পাচ্ছি : সমবৃত্ত, গুরু বা দীর্ঘ একাক্ষর বৃত্ত (উক্‌থা। একাক্ষরা বৃত্তি:) 'শ্রী:' ছন্দের উদাহরণ

শ্রীস্তে। সাস্তাম্‌।।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ছন্দোমঞ্জরীকার 'শ্রীস্তে-র' মতোই 'সাস্তাম'-কে দুটো গুরু বা দীর্ঘ অক্ষর বলে গণ্য করেছেন। এবং একইভাবে ত্র্যক্ষরবৃত্ত (মধ্যা) 'নারী' ছন্দে 'শ্লিষ্টোৎব্যাৎ'-কে তিনটি গুরু বা দীর্ঘ অক্ষর ব'লে গণ্য করেছেন। সুতরাং সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তকে 'বর্ণ (letter) বৃত্ত' বলা চলে কি ? syllable-কে অক্ষর বললে ছন্দশাস্ত্রের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

syllable অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহারের সপক্ষে তারাপদ ভট্টাচার্যও আলোচনা করেছেন (ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিজ্ঞান পৃঃ ১৭-১৮ দ্রষ্টব্য); এই প্রসঙ্গে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত (৫।১২।৭৫)অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের চিঠিও দ্রষ্টব্য।

Syllable-কে যদি সর্বদাই অক্ষর বলি 'মুক্ত অক্ষর' ও 'রুদ্ধ অক্ষর' (আরো সংগতভাবে 'বদ্ধ অক্ষর') শব্দদুটির ব্যবহার দোষাবহ মনে করি না। (তুলনীয় : 'সুকুমার সেনের পরিভাষা 'বিবৃত অক্ষর' ও 'সংবৃত অক্ষর', মুহম্মদ আবদুল হাই-এর পরিভাষা 'মুক্তাক্ষর' ও 'বদ্ধাক্ষর'—পরিভাষাদুটি যথাক্রমে open syllable ও closed syllable-এর)।

'ছেদ' ও 'যতি' আমি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছি ব'লে মনে পড়ে না। sense pause ও metrical pause বোঝাতে আমি 'ভাবযতি'ও 'পর্বযতি' শব্দদুটির প্রয়োগ করেছি। pitch accent ও duration accent 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কখনো কখনো স্বরবৃত্ত ছন্দেও ; তাই pitch and duration accent একই সঙ্গে বোঝাতে 'সুরপ্রস্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছি। এখানে উল্লেখ করি, বাঙলায় 'সুর' ও 'স্বর' একার্থক নয়, যদিও স্বর থেকেই সুর উদ্ভূত।

'অক্ষরবৃত্ত' 'স্বরবৃত্ত' 'মাত্রাবৃত্ত' এই তিনটি ছন্দেরই unit of measure অক্ষর (syllable), কিন্তু তাই ব'লে অক্ষর বা 'দল'-এর সংখ্যা দিয়ে মাত্রা নির্ণয় করা যায় না—মাত্রা নির্ণয়ের ভিত্তি 'অক্ষর' বা 'দল-এর' উচ্চারণের কালগত স্থায়িত্ব এবং এই কালগত স্থায়িত্ব নির্ভর করে 'অক্ষর' বা দল উচ্চারণের রীতির উপর। 'দলবৃত্ত' ছন্দের মাত্রা নির্ণয়ের ভিত্তিও তো 'দল' বা 'অক্ষর' সংখ্যা নয়, সেখানেও 'দল' উচ্চারণের রীতিই বিবেচ্য ; তা না-হলে "মন্দিরেতে/কাঁসরঘণ্টা/বাজলো ঠং/ঠং" পঙ্‌ক্তিটি কানের সম্মতি পেতো না, তৃতীয় পর্বের দল সংখ্যা তিন, কিন্তু পরিমাপ চার মাত্রার।

'অক্ষরবৃত্ত একটি বিশেষ ছন্দোরীতির পারিভাষিক নাম, এবং 'পয়ার' একটি ছন্দোবন্ধের (৮।৬) নাম, সুতরাং পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত সেই 'অক্ষরবৃত্তকে বোঝাছে যে মূলত ৮।৬-এর যতি বিন্যাস মেনে চলে (জোড়-মাত্রার ত্রিপদী ও চৌপদী চরিত্রের দিক দিয়ে 'পয়ার'-এরই পরিবর্ধিত রূপ ; ৮।১০ [= ৪ + ৬] যতিযুক্ত 'মহাপয়ার' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য)।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে 'অক্ষরবৃত্ত' দুরকমের—'পয়ারভিত্তিক' ও 'অ-পয়ার ভিত্তিক' এই উক্তি হয়তো 'বিভ্রান্তিকর' নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত হবার পর 'মাত্রাবৃত্ত' শব্দটি একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ লাভ করেছে ('অক্ষরবৃত্ত' আর 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের ভিত্তিও তো মাত্রা সমকতা)। রবীন্দ্রনাথের বা আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' অ-পয়ারভিত্তিক 'অক্ষরবৃত্ত' থেকে উদ্গত বলেই আমার ধারণা (পার্থক্যটা মূলত অক্ষরের উচ্চারণরীতির)। আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে 'অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের যোগসূত্র ও 'পয়ার-ভিত্তিক' 'অক্ষরবৃত্ত' থেকে তার চরিত্রগত পার্থক্য (যা পর্বাঘাত বা পর্বপ্রস্বরের মধ্যে স্পষ্ট) বোঝাবার জন্যই 'অ-পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত'-কে 'অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত' বলেছি। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য পয়ারভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত-কে 'অ-পায়ারত্তিক অক্ষরবৃত্ত' থেকে পৃথক না করে উপায় নেই, এই কারণে আধুনিক 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দের উদ্‌গতির আলোচনা করতে গেলে **পারিভাষিক অর্থে** 'অক্ষরবৃত্ত রীতির মাত্রাবৃত্ত' স্বীকার করতে হয়।

'পর্বাঘাত' ও পর্বাঙ্গ' পারিভাষিক শব্দ সুতরাং 'পর্বপ্রস্বর' এবং 'উপপর্ব-এর মতোই আরোপিত সংজ্ঞার্থের দ্বারা অর্থবহ।

'যতিলোপ' স্বীকার করতে গেলে, আমার বিবেচনায়, যতিলোপ-এর প্রত্যাঘাত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তা না হলে ছ-মাত্রার ছন্দকে তিন মাত্রার কেন, দু-মাত্রার ছন্দও বলা চলে, চারমাত্রার ছন্দতে কেউ যদি আট মাত্রার ছন্দ বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে কি ?

দীপংকর দাশগুপ্ত

আলোচনা

অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা

আজ থেকে দশবছর আগে আরো দুজন কবির সঙ্গে পার্থ রাহার একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো, তার নাম অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা। ঠিক দশবছর পরে পার্থ রাহার আর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলো, তারও নাম অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা। বোঝা যায় এই অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা পার্থ রাহার চরিত্রের শিকড়ে প্রোথিত। এবং দশবছরের ব্যবধানে এই দুই কবির অনুভবের স্নায়ু যদিও বদলে গেছে, অন্বেষণের পদ্ধতি এবং পরিক্রমার ক্ষেত্রও আর ঠিক এক নেই, তবু মৌল প্রতিন্যাসের তেমন কিছু অদলবদল ঘটেনি। মৌল প্রতিন্যাসে পার্থ রাহা একজন জাগ্রত কবি—যে কোনো অনুভবই তাঁকে কাঁপায়, অন্বেষণ তাঁকে নিমগ্ন করে এবং পরিক্রমায় তিনি অক্লান্ত। দশবছর আগে যে তীব্র আর্তিতে তিনি বলে উঠতে পারতেন 'যারা আমার চার পাশের মানুষ আর মানুষের সভ্যতাকে প্রকাশ্যে অথবা ছদ্মবেশে হত্যা করতে চায়, যারা কবি ও কবিতাকে বিদ্রূপ করার কদাচারে লিপ্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমি আমার ওপ্‌চানো ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে বন্দুক হাতে কবিতা লিখতে চাই' এখন আর তেমন বলতে পারেন না, এখন তাঁর ক্রোধ অনেক শান্ত, ঘৃণা প্রশমিত, বন্দুক নয় সকরুণ ভালোবাসা নিয়ে তিনি মানুষ, মানুষের সমাজকে দেখেন। এক বিধুর শূন্যতার বোধ তাঁর ভিতরে ভিতরে কাজ করে। এইসব নিয়ে, দশবছর আগে যা ছিলো না, পার্থ রাহা কবিতার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন, তন্ময় নিমগ্ন তার কবিতায়।

'অনুভব অন্বেষণ পরিক্রমা' দীর্ঘ কবিতার বই। দীর্ঘ কবিতা কবিতাই নয়, এমন ধারণা এড্‌গার এ্যালান পো পোষণ করতেন এবং মালার্মের মতো অনেক কবিই তাঁর সমর্থক। কিন্তু দীর্ঘ কবিতা বলতে যথার্থ কী বোঝায় সেটা বোঝা দরকার, মনে রাখা দরকার দীর্ঘ কবিতার বিপরীত শব্দ ক্ষুদ্র কবিতা নয়, দীর্ঘ কবিতার বিপরীত শব্দ কবিতা। কবিতা তখনই দীর্ঘ কবিতা যখন তা আবেগ উচ্ছ্বাসের অতিকথনে পীড়িত, কবিতা তখনই দীর্ঘ কবিতা যখন অনিপুণ বিন্যাস, অথবা অশিক্ষিত বিন্যাসে তা অসংহত। দশ-বারো লাইনের কবিতাও দীর্ঘ

কবিতা যদি তা সংহতিকে আয়ত্ত করতে না পেরে থাকে এবং একশো লাইনের কবিতাও সার্থক কবিতা যদি তা সংহত এবং স্থিরলক্ষ্য হয়। পার্থ রাহা এই সংহতিকে সবসময় আয়ত্ত করতে পেরেছেন এমন নয় এবং যেহেতু তাঁর কবিতার মৌল পটভূমি আবেগ, ঠিকমতো হাল ধরা তাঁর পক্ষে সহজ কাজ হয়নি। তবু একথাও স্বীকার করতে হবে পার্থ এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং এই সচেতনতা তাঁর দীর্ঘ কবিতাকে কখনই অ-কবিতায় দাঁড় করায়নি।

পার্থ রাহা জানেন :

> একদিন পিকাসোর উক্তি ছিল,
> 'আমি খুঁজি না, আমি পেয়ে যাই' ;
> আমি জানি আমি কোনদিন
> এমন স্পর্ধিত উক্তির অধিকারী নই

পার্থ রাহা জানেন অনেক অন্ধকার অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে নচিকেতার উপলব্ধিকে পাওয়া যায়, তার জন্য চতুর্মুখ কুকুরের একটানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অবসন্ন হতে হয়। পার্থ রাহার জগৎ বিদ্যুৎময় অনুভবের, ক্ষুধিত জিজ্ঞাসার জগৎ। তাঁর পরিক্রমা অন্ধকারশাণিত বিষাদের অলিগলির ভিতর। এই চরিত্র একজন কবির চরিত্র। পার্থ রাহাকে কেবল সেই নিরাসক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যে নিরাসক্তি ব্যক্তিগত আবেগকে উচ্ছ্বাসকেও দূর থেকে দেখতে জানে।

আলোক সরকার

দুটি কবিতার বই

এক-অর্থে রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং রথীন্দ্র মজুমদার এই দুইজনের কবিতাই ষাট দশকের অন্যান্য, তথাকথিত প্রতিনিধি-মূলক কবিতার ব্যতিক্রম। যে সময়ে 'আধুনিকতা অভিলাষী' অধিকাংশ কবিই ব্যক্তিগত, আত্মকেন্দ্রিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্পৃথিবীর দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন, তুলনায় সরব হয়ে উঠেছিল তাঁদের কণ্ঠস্বর, ঠিক সেই মুহূর্তে রাণা এবং রথীন্দ্রের পুনরাবর্তিত উচ্চারণ ক্রমশ আরো নম্র অথচ ঋজু, আত্মকেন্দ্রিক এবং বিমূর্তধর্মী হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি এই দ্বিতীয় ধরনের কবিতার প্রতি আদর্শগত-অর্থে আবদ্ধ। এবং যে কোনো সমালোচনাই যেহেতু সমালোচকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ-নির্ভর, 'সামনে প্রিয়তম পথ' এবং 'তোমার নিঃশব্দ তরবারি' এই দুই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কবিতা হয়ে-ওঠার প্রাথমিক শর্ত পূরণ করছে এ-কথা ধ'রে নিয়েই আমি বর্তমান আলোচনা শুরু করব।

'সামনে প্রিয়তম পথ' রাণা চট্টোপাধ্যায়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। চৌত্রিশটি কবিতা ও একটি কাব্যনাটকের সংকলন এই বইটিকে কবিতাগুলির মেজাজ অনুযায়ী পরস্পর-যুক্ত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যদিও এই বিভাজন দৃশ্যত পারস্পরিক নয়। প্রথম বিভাগের কবিতাগুলিতে অতীতের প্রতি আকর্ষণ বা একধরনের নস্টালজিয়া ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে এমন মনে করা ভুল হবে না। 'পাহাড় আর পাতাল' কিংবা 'ঋতুবদল' জাতীয় কবিতাগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির ব্যক্তিগত অনুভব শুধুমাত্র অতীত-কাতরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, উত্তীর্ণ হয়েছে মৌল, আরো গোপন কোনো আশ্রয় অন্বেষণে — অতীত অথবা শৈশব এ-ক্ষেত্রে শাশ্বত প্রতীক হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র। 'ঋতুবদল' এবং 'তুমি ডাক, আমি ফিরে যাই' এই দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখলে ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যেতে পারে :

হাওয়া চতুর্দিকে হাওয়া
উড়িয়ে নেয় সব, গৃহস্থালি সংসার

আমার শীত-গ্রীষ্মের ঋতুবদল
যাওয়া আসার পথ

ট্রেন লাইন, হাটবাস ধুলো

*　　*　　*

তারারা পালটায় দিক যাওয়া আসার পথ,

অবিকল আগের মতন ফিরে আসে না

এবং এর পাশাপাশি

তুমি ডাক, তাই ফিরে আসা

ভাঙ্গাঘাট —অনেক যাত্রী

তোমার নৌকা বন্দরের দিকে

প্রতিদিন ফিরে আসা বেলা যায়···

দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুলিতে রাণা চট্টোপাধ্যায়-এর ব্যক্তিগত-আশ্রয়-অন্বেষণ আরো ব্যাপ্ত রূপ নিয়েছে। আশ্রয় একটা আছে সন্দেহ নেই, যে আশ্রয়কে পরম নিয়ন্ত্রা বললেও বোধহয় ভুল হবে না—কিন্তু তাকে খুঁজতে খুঁজতে 'নদী হয়ে যাচ্ছে মরুভূমি' আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত মন্দির হয়ে ওঠে 'রাতের ছায়া, প্রিয়তম পথের গভীরে অসুখ।'

'তোমার নিঃশব্দ তরবারি' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'তোমার নিঃশব্দ তরবারি'তে যে অন্তর্নিহিত মৃত্যুর বোধ আশ্চর্যরকম স্পর্শময় হয়ে উঠেছে তা অন্যান্য কবিতাগুলিতে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু এ-নিয়ে দুঃখ করার কিছু নই। ফলত, সমস্ত বইটি জুড়ে একধরনের বিষণ্ণ অনুভব কাজ করেছে এবং গ্রন্থের শেষ কবিতাটি এই সামগ্রিক অনুভবের একটি নিটোল পরিসমাপ্তি—এমন মনে করা ভুল হবে না। এই পরিসমাপ্তি এতই নিটোল যে উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছি না— রাস্তা জুড়ে মানুষ কিছুই দেখা যায় না/ এপার থেকে ওপার হয়ে ওঠে না/ আজও ব্রীজের পারাপার/ ··এপারে আলোয়/ক্যান্সার হাসপাতালের প্রস্তর ফলক/কর্কটের ওপর তোমার নিঃশব্দ তরবারি !

তবু বলব, 'তোমার নিঃশব্দ, তরবারি'-র অন্যান্য কবিতাগুলির সঙ্গে শেষের কবিতাটির একটি মেজাজ-গত ফারাক রয়ে গেছে, কবির মানসিক বিবর্তন সমান হয়নি ; নাকি এ-কোনো আরো মগ্ন ধ্যানময় ভবিষ্যতের সূচনা ?

অভিরূপ সরকার

প্রথম কবিতার বই

বইএর ভিতরে দীর্ঘ সরু সরু ফুটো করে পুরোনো রুপোলী কাটগুলি
কে জানে কেন যে করে, কিন্তু প্রায়ই করে থাকে।

নিভুর্ল এফোঁড় ওফোঁড়

এরকম স্পষ্ট উচ্চারণে অত্যন্ত চেনা প্রতীকের সাহায্যে বিশ্বদেব অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়-ক্ষতির কথা বলেন। ব্যক্তিগত রঙীন দুঃখের দাঁতে এইভাবে পরতে পরতে ছিদ্র করে। তার অর্থহীন কারণ খোঁজাও আমাদের একরকম অর্জিত অভ্যাস, আমরা বুঝতে চেষ্টা করি, নিজেদের বোঝাতে চেষ্টা করি এই রন্ধ্রগতির কোন উত্তীর্ণ অভিজ্ঞতা।

কিন্তু দৃশ্যত যেটা ঘটে থাকে—বই থেকে

পুনরায় আরো কিছু বই-এর ভেতরে ক্রমাগত

অন্ধকারে সরু সরু ফুটোর ভেতরে তারা এইভাবে কিছুকাল

বসবাস করে।

পুনরাবৃত্তির মতো এই ছিদ্র থেকে যায় বই থেকে বই-এর ভেতরে অর্থাৎ আমাদের উপলব্ধ জ্ঞানক্রমে। নরম জ্ঞান তার নিভুর্ল অঙ্গহানি নিয়ে অবশিষ্ট পড়ে থাকে দুঃখগুলির বসবাসের জন্য। অথচ এভাবেই নির্মাণ শুরু হয় বুকের ভিতরে,

একে একে
উঠোন, রান্নাঘর দেহলীতে নিমছায়া, রোদ্দুর, সিঁড়ির চাতাল,
দুয়োরে মাঙ্গলিক সুখভরা ধানের মরাই, ঢেঁকিশাল,
নবান্নের শালিধান, ভাঁড়ারের মেটে হাঁড়ি,

কুয়োর ফটিক-জলে ভ'রে ওঠা বালির সোরাই

মেঝেয় শেতল পাটি, খুব সুখে শিশুটি ঘুমায়, আমি সব
আমি সব দেখি ঘুরে ঘুরে।

সমস্ত এই আয়োজন যত অনায়াস তেমনি নির্লিপ্ত কিন্তু নয় এই দেখা। 'আমি সব' এই শব্দবন্ধের দ্বিত্বের ভিতরেই প্রস্ফুট এই বুকের ভিতরকার বাড়ি-ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার বেদনা। কিন্তু কবি জানেন সময়ের অনিবার্য পরিণাম। ঘুরে ঘুরে দেখা, এই আশ্চর্য ভ্রমণের পটভূমিকায় কখন,

পায়ে পায়ে
বয়স দুপুর হয়ে
দুপুর বিকেল হয়ে নেমে যায় খিড়কি পুকুরে ॥

এখানে লক্ষণীয় বিশ্বদেবের চেতনায় এই প্রস্থানও পেছন দিয়ে, চুপিসাড়ে, খিড়কি পুকুরে। আসলে 'ছায়া যার দশদিক' এই বইটিতে, যা কিনা বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই, দুঃখের এই অন্তর্লীন গোপন রূপটিই দশদিক ব্যাপ্ত ক'রে ছায়া ফেলেছে প্রতীকের কাব্যগুণ সম্পন্ন ব্যঞ্জনায়।

বইটির কবিতা-নির্বাচনের মধ্যে একটি সচেতন অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায় কোন অখণ্ড মানচিত্রের রচনার প্রতি। যে বিষাদ তার পটভূমি তা মূলত অস্তিত্বের অবক্ষয়ের ভিতরে চরিত্র নির্মাণের সংকট—যে অবক্ষয় "সখার সংসর্গে দুঃস্থ, আত্মীয়ের বিলাপে বিহ্বল।" কিন্তু কয়েকটি কবিতার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সম্ভবতঃ কবির ব্যক্তিগত মমত্ববোধ তাঁর সমালোচনার মানসতার চেয়ে প্রবলতর হ'য়ে কাজ করেছিলো। সেগুলি সবই ভালো কবিতা কিন্তু এই বই-এর মূল ছায়ার বাইরেই তাদের ডালপালা ছড়িয়েছে বেশী। কবিতাগুলির বহুল ব্যবহৃত নাগরিক পটভূমিকা, অভ্যস্ত উচ্চারণ পদ্ধতিই তার জন্য প্রধানত দায়ী। উদাহরণ স্বরূপ 'বিচ্ছিন্ন টেলিফোন' 'প্রেতপক্ষ' 'জোঁক', প্রভৃতি কবিতার নাম করা যায়। তবে যদি কোনরকম বৈচিত্র্যের জন্য এই কবিতাগুলির অবতারণা করা হয়ে থাকে, তা নয় বলেই আমার বিশ্বাস, তবে তা অন্তত আমার কাছে সমর্থন-যোগ্য নয়। কিন্তু এ-জাতীয় কবিতা এই বইয়ে খুবই কম। আসলে এই বইটির মৌল সমগ্রতা এতো নিটোল যে এবম্বিধ দু'চারটি স্খলন আমার কাছে পীড়াদায়ক হয়েছে। সম্পূর্ণ বইটির আলোচনার মধ্যে তাই সেই কথাটুকু জানিয়ে রাখা মাত্র।

নগর জীবনের পরিচিত অথচ স্বল্পপ্রচলিত শব্দের ঝংকারই বিশ্বদেবের কবিতার অন্তর্ভেদী আয়ুধ। কখনও কখনও তিনি স্বপ্রযুক্ত ধ্বনির সাহায্যেও অপূর্ব চিত্রকল্প রচনা করেছেন। 'ডোকলা', 'কুচুটে', 'হটোরহটোর', 'জুয়-কালো', 'পাথল শরীল', 'জিওল মাছ', 'পলুই' প্রভৃতি শব্দ বা 'ঢোল বাজে বাভোম্… বাভোম…'কিংবা 'বিসর্জনের রাতে' কবিতায়,

বাইরে ঝুম ঝুম করছে রাত ! বলি কোন্ পাড়ার দুগ্‌গা যায়—

সঙ্গে ঐ আগুপিছু তালকানা বিশটা মাতাল ?

ও…মা দিগম্বরী নাচ্ গো—কাঁসর ঘণ্টা

ওদিকে তো ঠনঠনাচ্ছে ঢাক-ঢোল-কর্তাল

পাঠক পাড়ায় তারা পাঁচজনায় বসে আছে

ও কেমন আজব আলোর হারিকেন

জ্বেলেছে দিঘির পার প্রতিমা নামিয়ে তোরা

কাক-ভোরে তামুকের আগুন নিবি না

মাথায় চিড়িক দিচ্ছে বড় ভয় সনাতন

এখনও জবর রাত, ঝুম ঝুম দু'পহর রাত।

এপ্রকার উচ্চারণভঙ্গী বিশ্বদেবকে সহজেই হট্টগোলের মধ্যে বিশিষ্ট ক'রে রাখে। কিন্তু আসলে এইসব পটভূমিকা বা শব্দ-চয়নের মোহজালে বিশ্বদেব তাঁর নাগরিক ঐতিহ্যের দিক থেকে মুখ ফেরাননি, আর সেইখানেই তাঁর সার্থকতা। পরিবেশের জটিলতা, ক্রমাগত পোশাক বদলাবদলির ভিতর দিয়ে ঐন্দ্রজালিক ছেলেবেলার অন্তর্ধান, নিভৃত অরণ্যে ঈশ্বরকৃত হত্যাকাণ্ড, ঘুমের মধ্যে আদিম বাজিকর রমণীর ভীষণ প্রলোভনের কণ্ঠ ক্রমশঃ তাঁর সরলতাকে মেরে ফেলে, 'কলকাতার সব হাওয়া' তখন 'মেডিক্যাল কলেজের দিকে' ঘুরে যায়। আর অর্জিত পাপবোধের অনুসঙ্গে কবি তখন লেখেন,

কলকাতার সমস্ত দিনের অবসাদ

বাক্সো-প্যাটরা নিয়ে

নেমে গেল সন্ধ্যার বস্তিবাটীতে।

* * * *

…আর অন্ধকারে

দু'একটা খিস্তি ছুঁড়ে, শৌখিন টেপা বাতি হাতে

কলকাতার দুঃখগুলি

নিষিদ্ধ পল্লীর দিকে চলে গেল ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে।

আসলে বস্তিবাটীর 'পায়ে পায়ে মোরাম-মাড়ানো শব্দে'র 'নিবিড় শান্তি' বা 'জোনাক জ্বালা শোক' এবং 'ধ্বংসের মুখোমুখি নষ্ট মেয়ের মত ভয়ঙ্কর পা ফাঁক

করে নীচের দিকে ঝুঁকে' থাকা 'হাওড়া ব্রীজ' এই দুই পটভূমির মধ্যস্থিত অসহায় বেদনা বোধের মধ্যে ফেলে বিশ্বদেবের দ্বিধাদীর্ণ কবি সত্তাকে যাচাই করতে হবে। যখন অবেলায় তাঁর অভিজ্ঞতাতিক্ত মন বলে 'যাই ?' তখন যে কোন নিষেধ ঝুপ ক'রে ডুবে যাওয়া হিংস্রুটী দিদির বয়সের কথা মনে করিয়ে দেবে। আপাতদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবীতার ভিতর থেকে উপলব্ধির এই চকিত আত্মোত্তরণের মধ্যেই নিহিত আছে বিশ্বদেবের হয়ে উঠবার বীজ। আশা রাখি বলেই সামান্যতম কথাটুকুও না বলা থাকে না, তারা দু'একটি ভয়ের কথা।

নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গীর মধ্যে কোন কোন সময় বিশ্বদেব নিজের অজান্তেই দু-একজন অগ্রজ কবির কণ্ঠস্বরে কথা বলে ফেলেছেন। সম্ভবতঃ সেই সব অনুভূতির প্রকাশরীতিতে তাঁরা বিশ্বদেবের প্রিয় কবি। কিন্তু এই সম্মোহজাল সচেতনভাবে পরিহারযোগ্য কবির নিজেরই আত্মবিকাশের কারণে। পঞ্চাশ-দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ তাঁর বিদগ্ধ শৈলীসহ বিশ্বদেবের সামনে বড় বেশী দাঁড়িয়ে আছেন। উদাহরণ দিয়ে সে আলোচনা দীর্ঘতর করবো না। তবে 'ভাঙা চাঁদ বাড়ীর উঠোনে' কবিতায়,

জ্যোৎস্না ঘুমিয়ে আছে কতকাল পুরোনো মাছের গন্ধে
হেঁসেলের হাঁড়ির ভেতরে
মাছের ঝোলের গন্ধ, ঝোল ছিল, কবে যেন
মাগুরের ঝোল ভাত খেয়েছিল কারা

এই জাতীয় পঙ্‌ক্তিগুলি যত প্রকট করে জীবনানন্দের উপস্থিতিকে তেমন আর কোথাও নয়। বস্তুতপক্ষে 'নষ্টচন্দ্রের রাতে' থেকে 'ভাঙাচাঁদ বাড়ীর উঠোনে' কবিতায় যে অনুধাবনযোগ্য প্রবাহমানতা তা নিয়ে আলোচনা করা হলো না এই একটি মাত্র অস্বস্তিতে।

বিশ্বদেব এই সীমাবদ্ধতা শিগ্‌গিরই তাঁর পরিমণ্ডলের দশদিক থেকে বিদূরিত ক'রতে পারবেন বিশ্বাস করি। আর বড় বেশী অনুভব সংলাপের আকারে সাজানো হয়েছে যার ফলে, আমার মনে হয় তার ব্যাপ্তি অনেক ক্ষেত্রে কমে গিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত কবিতায় দাঁড়িয়ে গেছে। এই বই-এর অন্তত বারো তেরোটি কবিতা এই সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত। সে প্রসঙ্গে বিশ্বদেব একবার ভেবেদেখবেন কি ?

সুরজিৎ ঘোষ

কবিতা বিকীর্ণ শিল্প

শতভিষা রজতজয়ন্তী বর্ষ বিশেষ প্রবন্ধ সংযোজন
আলোক সরকার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যশোধরা বাগচী
রমানাথ রায় গৌতম বসু অভিরূপ সরকার সুরজিৎ ঘোষ

আলোক সরকার
কবিতা

যে-কোন সৃষ্টিরই জন্মপ্রস্তুতি অন্ধকারের ভিতর। মৃত্তিকার অন্ধকারে বীজ নিজেকে প্রস্তুত করে, মাতৃগর্ভে প্রাণ। সেই প্রস্তুতি, সেই অন্ধকারের সাধনা একদিকে যেমন অসহায় অন্যনির্ভর ঠিক সেই রকম সেই সাধনা সত্তার স্বতন্ত্র জাগরণের সাধনা। মাতৃগর্ভে প্রাণ মাতার রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে আত্যন্তিক জড়িত, জননী মৃত্তিকার স্বভাবধর্মকে বীজ অস্বীকার করতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না বীজের স্বভাবধর্মকে। একই সঙ্গে প্রাণ তার হয়ে ওঠার উৎকাঙ্ক্ষায় নিলীন অন্ধকারে মাতাকে পরিত্যাগ করতে চায়, বিচ্ছিন্ন হতে চায়, জেগে উঠতে চায় স্বাধীন এবং অসম্পৃক্ত অনন্যনির্ভরতায়, মাটির ভিতর রোপিত বীজ উল্লোল ব্যাকুলতায় দুবাহু মেলে দিতে চায় আকাশের দিকে, পান করতে চায় সূর্যালোক, অনুভব করে নিতে চায় মুক্ত বিস্তৃত জীবনানন্দ। অন্ধকারের ভিতর চলেছে প্রস্তুতি—একদিকে পূর্বনির্দেশ পূর্বসংস্কার তার অনিবার্য আধিপত্য, অন্যদিকে স্বাধীন অসম্পৃক্ত প্রথম মৌলিক জাগরণ।

যে-কোন সৃষ্টিরই জন্মপ্রস্তুতি অন্ধকারে, সেই অন্ধকরে যেখানে সকল ধ্বনিই মূক, সকল বর্ণ ই দ্যুতিহীন, সকল রূপই শূন্যময় অনুপস্থিতি। তারই ভিতর চলেছে সাধনা, হয়ে-ওঠার সাধনা,যে-সাধনায় পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নেই পূর্বনির্দিষ্ট বর্ণের প্রতিফলন, যেখানে কোন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপই কল্পনার অনিবার্য প্রভাব নয়। তবু, কোন সৃষ্টিই যেহেতু বীজের স্বভাবধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না, তার সমস্ত প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট রূপকেই যান্ত্রিক মেনে নেয়, কল্পনার একটি নিয়মবাধিত প্রবণতাকে। এই নিয়তি এই অমোঘতা এরই পাশাপাশি এরই অন্তরালে মাঝে-মাঝে দৃপ্ত হয় সহসার বিদ্যুৎ, ছিঁড়ে ফেলে দিতে চায় সব নিয়মনির্ধারিত প্রস্তাব, ফিরে পেতে চায় সেই সাধনার সফলতাকে যে-সাধনায় পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নেই, পূর্বনির্দিষ্ট বর্ণের প্রতিফলন, যেখানে কোন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপই কল্পনার অনিবার্য প্রভাব নয়। এই পেতে-চাওয়া, যান্ত্রিক প্রবণতা এবং স্বাধীন অনির্ভর উন্মীলনের এই দ্বন্দ্ব, এই আবহমান রক্তিম সংগ্রাম, জাগ্রত, কথনো অর্ধঅচেতন, কথনো নিমগ্ন স্রোতের অনিবার্যতায় বয়ে চলেছে সকল সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে।

সব সৃষ্টিই, সব শিল্প, কবিতা এই দ্বান্দ্বিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে হয়ে ওঠে। সব শিল্পই এক অর্থে ঐতিহ্যানুগ, বীজের অন্তর্গত প্রবণতার ভিতর দিয়ে শাসিত। শিল্প বলতে যে সার্বজনীন ধারণা, কোন শিল্পীই সেই ধারণাকে অতিক্রম করতে পারে না; কবিতা কাকে বলে সে বিষয়ে আমাদের যেমন একটা সময়লব্ধ ধারণা আছে, একজন কবির উপলব্ধিও প্রায় তার কাছাকাছি যায়। আমরা অনায়াসেই আদি কবি বাল্মীকির রচনার অনেক অংশকেই যেমন কবিতা বলবো ঠিক সেইরকম হাল আমলের যে-কোন কবির রচনাকে। কালিদাস কবিতা লিখেছেন এবং প্রায় দেড় হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথও। যেমন কবিতা তেমন চিত্রকলা তেমনি শিল্পের আর সব শাখাও। কবিতা-বিষয়ে ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের একটা ধারণা গড়ে উঠেছে, আমরা অনিবার্যভাবেই তাকে মেনে নিই, কবিরা অনিবার্যভাবেই তাকে মেনে নেয়, কবিতা রচিত হয় সেই ঐতিহ্যের মৌল ছাঁদের সীমানায়, কবিতা এবং সব শিল্পই, সব সৃষ্টিই গভীর কেন্দ্রে তার বীজের প্রবণতাকে অবধারিত স্বীকার করে।

তবু একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতার ব্যবধান অনেক, এক কবির রচিত কবিতা থেকে অন্য কবির রচিত কবিতার। কেবল কাব্যকলারই হেরফের নয়, প্রসাধনের রকমফের অথবা শব্দ আর শৃঙ্খলার অনন্যতা নয়, একজন কবির রচিত কবিতা যে হিরণ্ময় আলো জ্বালায়, আলো জ্বালায় আলো নেভায়, বিচ্ছুরিত করে যে আলোকমালার অদৃষ্টপূর্ব বর্ণ, অন্য কবির রচিত কবিতা কখনোই তা করে না। তা অন্য এক হিরণ্ময় অভিনিবেশ, অন্য উজ্জ্বলতা এবং আর এক ধরনের অন্ধকার। অন্ধকারের সাধনা তো আর সকলের একরকম নয়, সেই অন্ধকারের যেখানে পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নেই, পূর্বনির্দিষ্ট বর্ণের প্রতিফলন, যেখানে কোনো পূর্বপ্রতিষ্ঠিত রূপই কল্পনার অনিবার্য প্রভাব নয়।

একজন কবির হয়ে-ওঠার পিছনে তার এই অন্ধকারের সাধনা একাধিপত্য এবং অনিবার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সকলেই যে কবি নয় এবং আপতিকভাবে কেবল দুএকজনই কবি তারও রহস্য এই অন্ধকারের সাধনার নিবিড়তা এবং প্রকারভেদের তরতমে। এই অন্ধকারের সাধনা এ কেবল জাগরণের প্রাথমিক মুহূর্তে নয়, এই সাধনা জাগরণের প্রাথমিক মুহূর্ত এবং সমস্ত জীবন ভ'রে। সমস্ত জীবন ভ'রে চলেছে এই অলক্ষ্য উন্মুখতা—একদিকে বীজের নিশ্চিত নির্দেশ,

সমাজের পরিবেশের অলঙ্ঘনীয় আধিপত্য, অন্যদিকে মুক্তি, স্বাধীন স্বতন্ত্র উন্মীলন, অনন্য প্রথম মৌলিক হয়ে-ওঠা।

সমস্ত জীবন ভ'রে কখনো সচেতন, প্রায় সময়েই অচেতন বেজে ওঠে এই হয়ে-ওঠার মন্ত্র। কখনো তাকে অনুভব করা যায়, মাঝে-মাঝে করা যায়: প্রায় সময়েই, অধিকাংশ সময়েই সেই ধ্বনি স্তব্ধতা, সেই অন্ধকার আলোকময় জ্যোতি অবলুপ্ত। কবিতা তখনো রচিত হয়, হ'তে পারে, যখন সেই ধ্বনি স্তব্ধ, যখন সেই জ্যোতি অবলুপ্ত এবং তখন সেই কবিতাই রচিত হয় যা কবির রচিত কবিতা নয়, যা প্রথাসিদ্ধ ভাব-ভাবনা, প্রচলিত রীতি-প্রকরণ অথবা পাঠ-লব্ধ, শিক্ষা-লব্ধ, জ্ঞান-লব্ধ বোধ-বুদ্ধির উৎসার। এইরকম কবিতা রচিত হয়, অনেক হয়, এমনকি মহৎ কবির হাতেও হয় এবং তা ক্রমশ অবহেলিত, আরো অবহেলিত, আরো আরো অবহেলিত হতে হতে শুকনো পাতার মতো কোন সংগোপনে গিয়ে যে আশ্রয় পায়, আমরা তাকে আর খুঁজেই পাই না।

অর্থাৎ বীজের সহজাত নির্দেশকে মেনে নিয়েই সেই কবিতা রচিত হয়েছিল। বীজের নির্দেশের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছিলো তার ভাব-ভাবনা, তার রীতি-প্রকরণ, তার পাঠ-জ্ঞান-বোধ-বুদ্ধির উপকরণ বীজের ঐতিহ্যকেই মেনে নিয়েছিলো। কবিতা, সার্থক কবিতা, তখনই ক্রমবিকশিত যখন শুনতে পাওয়া যায় সেই হয়ে-ওঠার মন্ত্র, অনুভব করা যায় সেই অন্ধকার আলোকময় জ্যোতি। ব্যক্তিগত অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলো যে প্রতিজ্ঞা, যে শ্রম, যে আকৃতি আর অভিভাব তার মুখোমুখি দাঁড়ালে ফিরে পাওয়া যাবে সেই দৃষ্টি যা প্রথম, প্রথম আর মৌলিক, প্রথম মৌলিক আর অনন্য। তারই অমোঘ এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণায় রচিত হয়ে ওঠে কবিতা, যে কবিতা বিশ্বের প্রথম এবং চিরকালীন বিশ্বের প্রথম কবির রচিত কবিতা। কবিতা-রচয়িতার প্রয়োজন ব্যক্তিগত অন্ধকারের গর্ভে নিহিত জ্যোতির্ময় উন্মীলনের প্রতিটি সোপানকে চিনে-নেওয়া, তারই নির্দেশে যে কবিতা রচিত হয় সেই কবিতাই বিশ্বের প্রথম এবং চিরকালীন বিশ্বের প্রথম কবির রচিত কবিতা।

এই চিনে-নেওয়া এ সহজ কাজ নয় অর্থাৎ সহজ ব্যবহারিক অনুসন্ধিৎসায় একে পাওয়া যায় না, এ যখন সামনে এসে দাঁড়ায় কেউ কেউ এর নাম দেয় প্রেরণা, অথবা আবেগ, কেউ প্রশান্তি, কেউ নিমগ্নতা। আবেগ স্নায়ুযন্ত্রেরই

প্রতিক্রিয়া, তা বীজের চরিত্র, সামাজিক বাঁধা-বন্ধনের উর্ধ্বে যেতে পারে না, এবং প্রশান্তি, ওয়ার্ডস্বার্থ যাকে tranquillity বলেছেন, এলিয়ট তাকেও অগ্রাহ্য করেছেন। এলিয়ট রায় দিয়েছেন নিমগ্নতার স্বপক্ষে। কিন্তু মগ্নতা নিমগ্নতারও প্রকারভেদ আছে। একধরনের নিমগ্নতা বৃক্ষের নিমগ্নতা যান্ত্রিক রীতিনির্দেশকে, বীজের রীতিনির্দেশকে অবধারিত মান্য করে, একধরনের নিমগ্নতা প্রবৃত্তিচালিত, তা অন্ধ আনুগত্যে ঐতিহ্য সমাজ-পরিবেশের আরোপিত শৃঙ্খলগুলিকে মেনে নেয়, সেই মগ্নতা সেখানে চেতনার ভূমিকা নেই; এলিয়ট সম্ভবত যে নিমগ্নতার কথা বলতে চেয়েছেন তা চৈতন্য-উজ্জ্বলিত, দীপ্ত, তা সেই ব্যক্তিত্বকেও মানে না যে ব্যক্তিত্ব ব্যাবহারিক কার্য-কারণ নিয়ন্ত্রিত, ঐতিহ্য-সমাজ-পরিবেশের অন্ধ গোলকধাঁধার ভিতর আবর্তিত।

একদিকে বীজের অবধারিত নির্দেশ অন্যদিকে অন্ধকারের স্বাধীন অনপেক্ষ জাগরণের মন্ত্র, উন্মুখতা, এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক দোলাচলের ভিতর দিয়েই কবিতা হয়ে ওঠে। কোনো মেরুই অস্বীকারের নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ নয়, যদিও দুই মেরুর ব্যবধান কেবল সুদীর্ঘ নয়, মৌলিক। নিমগ্নতা, চৈতন্য-উজ্জীবিত নিমগ্নতা দীক্ষিত হয় অন্ধকারের সাধনার মন্ত্রে, তারই ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পাওয়া যায় বীজের অবধারিত নির্দেশকে, ঐতিহ্য-সমাজ-পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে-ওঠাকে, তারই ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বকে, ঐতিহ্য-সমাজ-পরিবেশ শাসিত ব্যক্তিত্বকে তখন বীজের অবধারিত নির্দেশ দ্বিতীয় অভিভাব পায়, ব্যক্তিত্ব সেজে ওঠে দ্বিতীয় রঙে দ্বিতীয় রেখায় এবং আরো বেশী দ্বিতীয় প্রাণরক্তে। এই নিমগ্নতা, চৈতন্য-উজ্জীবিত নিমগ্নতা এ সবকিছুকেই চিরে চিরে দেখে, জোড়া দিয়ে জোড়া ভেঙে দেখে। সবকিছুর ভিতরের রহস্য জানাই যে তার আগ্রহ তা একেবারেই নয়, ব্যাবহারিক অর্থে যাকে আমরা সত্য বলি তাকে খুঁজে পাবার ঔৎসুক্য তার একেবারেই নেই, সে সবকিছুকেই মিলিয়ে নিতে চায় তার হয়ে-ওঠার মন্ত্রের সঙ্গে, তার অন্ধকারের সাধনার বীজমন্ত্রের সঙ্গে, কখনো প্রসারিত করে, কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো ঢেলে সাজায়, কখনো ভেঙেচুরে আবার নতুন করে জোড়াতালি দেয়, কখনো পরিবর্জন করে, অবজ্ঞা করে কোনো বিশেষ অংশকে, কখনো নির্বাচন ক'রে নেয় বিশেষ একটি খণ্ড চুবিয়ে নেবার জন্য তার অন্ধকারের সাধনায় কল্লোলিত আঁধারময় জল-তরঙ্গের ভিতর। এইসব করা আর না-করা এ সবই নির্দেশিত হয় ব্যক্তিগত অন্ধকারের

প্রস্তুতির গঠন, তার প্রবণতা তার সংকল্পের প্রকারভেদের ভিতর দিয়ে। অন্ধকার সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত চৈতনউজ্জীবিত নিমগ্নতা, জাগ্রত সচেতন নিমগ্নতা আমাদের দেখাশোনার পৃথিবীকে নিজের দেখাশোনার পৃথিবী ক'রে নেয়। তারই পটভূমিতে রচিত হয় যে শিল্প, যে কবিতা, তা বিশ্বের প্রথম অনন্য একক কবিতা, তা আমাদের এক রহস্যের প্রান্তরের সামনে এনে দাঁড় করায়, যাকে আমরা অর্ধেক চিনি, এবং অর্ধেক আমাদের চেনাশোনার বাইরে।

কবিতায় যে রহস্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করি তা এই রহস্য, ব্যক্তিত্বচিহ্নিত রহস্য, স্বাধীন অনন্য নিরপেক্ষ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হয়ে-ওঠা ব্যক্তিত্বের দৃষ্টি আর মানসতার রহস্য। এই রহস্যই কবিকে পৃথক করে জনসাধারণ থেকে, এক কবিকে অন্য কবির থেকে। এই ব্যক্তিত্বময় দৃষ্টি আর মানসতাকে পরিহার করে যে কবিতা রচিত হয় তা জনসাধরণের নিজের সম্পত্তি, তা যৌথজীবনের সাকল্যিক আচার-আচরণ, ভাবনা-চিন্তা, জীবনযাপন থেকেই উঠে-আসা, তা পাঠ করে জনসাধারণ এক ধরনের মজা পায়। মজা পায়, কিন্তু তা কখনো কাঁপায় না, স্তব্ধ করে না, তোলে না কোনো গাঢ়তর গূঢ়তর অভিভাব। কবিতা, যথার্থ কবিতা মাত্রই রহস্যময়, অর্ধচেনা এবং বাকী অংশ অবগুণ্ঠিত; কবি যথার্থ কবি মাত্রই আগন্তুক, বিদেশী, তার সাজপোশাক আমাদেরই মতো, ভাষা আমাদেরই মতো তবু সে অপরিজ্ঞাত নতুন এবং আলৌকিক। তার একদিকে থাকে বীজের অমোঘ নির্দেশ অর্থাৎ সাধারণিক অর্থে স্বাভাবিকতা অন্যদিকে পটভূমির অন্ধকার প্রস্তুতি। যে কোন সৃষ্টিরই জন্মপ্রস্তুতি অন্ধকারের ভিতর, অন্ধকারের ভিতরেই তার প্রস্তুতি, স্বাধীন অসম্পৃক্ত প্রথম মৌলিক জাগরণ—সেই অন্ধকারের বর্ণালি কবিতা, যথার্থ কবিতার উপর সেই অন্ধকার হিরণ্ময় অকম্পন দ্যুতি ছড়ায়, কবিতাকে করে অনন্য এবং প্রথম এবং রহস্যময়।

কিন্তু আমরা যে সমস্ত কবিতা পড়েছি, মহৎ কবিদের কবিতা পড়েছি তাকি সত্যই সত্যই অদ্ভুত কিছু, উদ্ভট কিছু, অথবা আমাদের সাকল্যিক অভিজ্ঞতার বাইরে হঠাৎ নেমে আসা কোন গ্রহতারকার অসম্ভব কিছু? তা একেবারেই নয়। আমরা যে সমস্ত কবিতা পড়েছি তাকে যেমন কবিতা বলে চিনে নিতে আমাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি, সেই রকম সেই কবিতার ভাবনা চিত্র যুক্তিপরম্পরা

আমাদের কাছে খুব সহজভাবেই এসেছে। অদ্ভুত বা উদ্ভট কিছু যে রচিত হয় না তা নয় কিন্তু তা তাৎক্ষণিক কৌতূহল, ধাঁধা-ভাঙানোর আনন্দ অথবা গবেষণার বিষয় হয়ে থাকে। মহৎ'কবিতা কথনোই উদ্ভট কবিতা নয়, বস্তুত কবিতা বলতে আমাদের যে সার্বজনীন ধারণা আছে তার উর্ধ্বে উঠে কবিতা রচনা বোধহয় সম্ভব নয়। মৃত্তিকার অন্ধকারে বীজ নিজেকে প্রস্তুত করে—অসহায় অন্যনির্ভর সেই প্রস্তুতি, জননী মৃত্তিকার স্বভাবধর্মকে বীজ অতিক্রম করতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না বীজের স্বভাবধর্মকে। তারই পাশাপাশি অতন্দ্র জাগ্রত থাকে মাতাকে ত্যাগ করে প্রাণের হয়ে-ওঠার উৎকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন অসম্পৃক্ত অনন্যনির্ভর হয়ে-ওঠার উৎকাঙ্ক্ষা, জন্মজঠরের অন্ধকারের ভিতর চলেছে সাধনা, সেই অন্ধকারে যেখানে সকল ধ্বনিই মূক, সকল বর্ণই দ্যুতিহীন, সকল রূপই শূন্যময় অনুপস্থিতি; অন্ধকারের ভিতর চলেছে সাধনা যে সাধনায় পূর্বনির্দিষ্ট ধ্বনি -বর্ণ-রূপের কোনো ভূমিকাই নেই। বীজের অনিবার্য নির্দেশ এবং অন্ধকারের সাধনা এই দুয়ের দ্বান্দ্বিক প্রক্ষোভের ভিতর দিয়েই মানুষের হয়ে ওঠা, কবিতার হয়ে ওঠা। সব মানুষই তাই যেমন আমাদের কাছে অর্ধ চেনা এবং অর্ধ অপরিচিত, কবিতাও সেইরকম সহজতার স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে এসে রহস্যের সম্মোহে আমাদের নিবিষ্ট করে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুন্দরের সংজ্ঞা : অবনীন্দ্রনাথ

আবহপট

১। 'জাতীয়বোধ এবং আধুনিকতার মধ্যে রয়েছে এক কার্যকারণ খচিত সম্পর্ক' (Barbara West)।

২। ১৯০৭-এ প্রাচ্য শিল্পসভার (Indian Society of Oriental Art) প্রতিষ্ঠা।

৩। কোপেনহেগেনে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্দের আলোচনা সভায় (১৯০৮) কুমারস্বামীর বক্তব্য : ভারতীয় শিল্প গ্রীক ভাবনার দ্বারা বিভাবিত হলেও তা ভারতীয়।

৪। Modern Review পত্রিকায় ভগিনী নিবেদিতার ইতালিয় রেনেসাঁস ও অজন্তা-ফ্রেস্কো বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, নিবেদিতার অন্তিম অঙ্গীকার : 'The Rebirth of National Art of India is my dearest dream' নিবেদিতা yoga of Art বা শিল্পযোগের সাহায্যে ভারতশিল্পের নবজাগৃতিপট রচনা করবার উদ্যোগে বৃত হলেন। তার এই ব্রতের অনুব্রতী অবনীন্দ্র-নন্দলাল।

৫। ঠাকুরবাড়িতে ভিকতর কুঁর‍্যার 'সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, (Du vrai, du beau, et du bier, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৮৫৪) গ্রন্থের প্রভাব মহর্ষি থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের শিল্পবীক্ষায় অনবচ্ছিন্ন। নিবেদিতার প্রেরণায় সুরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যেন সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমীকরণের সাধনাকে মুখ্য না ক'রে দেশের শিকড় বা ঐতিহ্যবাহিত স্মৃতিপুঞ্জের সঙ্গে সুন্দরের যোগযুক্ততা খুঁজলেন। দেশাত্মবোধ, আত্মবোধ ও শিল্পরীতির সম্পর্ক ওকাকুরার Asia is one ধারণায় প্রসারিত হলো একটি প্রাচ্য নন্দনচেতনায়। প্রাচ্যের স্বকীয় সত্তার উপর জোর দিতে গিয়ে ওকাকুরা-নিবেদিতা ইয়োরোপের অন্ধ অনুকৃতিকে বর্জন করবার নির্দেশ দিলেন। এই প্রাচ্যবোধ বিশ্ববীক্ষার পরিপন্থী হলো না।

নান্দনিক প্রস্থান

১। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্তর্মুখী উত্তর-সাধক। রিনাসিমেন্তো divinity বা দেবায়নকে নয় humanities বা মানব-বিদ্যাকে প্রাধান্য দিয়েছে। মানুষের স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠাই নবজাগরণের অন্যতম সূত্র। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রবণতারই শিল্পায়ন। তাঁর ভাষায় রেনেসাঁসের বাংলা প্রতিশব্দ—'একালের উপযোগী সেকাল'!

যুগের প্রয়োজনে অতীতের অনুকরণ নয়, অঙ্গীকার প্রয়োজন। অতীতকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে convention বা প্রথার পরিবর্তে ঐতিহ্যের সচল ধারাটিকে (Tradition) গ্রহণ করতে হবে। ধ্রুপদী অতীত বর্জনীয় নয় কিন্তু তার সবটুকুই গ্রহণীয় নয়। অবনীন্দ্রনাথ এ সত্য বুঝেছিলেন। সেই অর্থে তিনি নব্য ধ্রুপদী শিল্পী। তাঁর ঐতিহ্যচেতনায় অবশ্য প্রথাশ্রিত কিছু সুন্দর কুসংস্কার ও জায়গা করে নিয়েছিল।

২। আমাদের রেনেসাঁসের মধ্যে একটি বিরাট ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। গোটা উনিশ শতক ভাবযোগের যুগ; নিবেদিতা-কথিত শিল্পযোগের কাল নয়। অথচ ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের মূলকথা প্রকাশ পেয়েছিল শিল্পের মধ্য দিয়ে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দুই দশক ও বিশশতকের প্রথম দশকের আগে আমাদের দেশে এই শিল্পকলা বা চিত্রকলা ছিল বড়জোর আপেক্ষিক মাধ্যম মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথ এই রেনেসাঁসের ত্রুটিকে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি শিল্পনির্ভর রেনেসাঁসের ধারাব্রতী। ভগিনী নিবেদিতা তাকে এই ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

৩। পাশ্চাত্য সংস্কারধর্মী ঐতিহাসিকের কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি শোনা গিয়েছে। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ অবনীন্দ্রগোষ্ঠির মূল সূত্রকে নিরূপণ করেছেন এইভাবে:

'Their work is the indication of happy blending of eastern and western thought' প্রাচ্য ও প্রতীচীর 'মিলনসাধনা' অবনীন্দ্রনাথের একটি শিল্পৈষণা (Kunstwollen)।

অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর তাত্ত্বিক সতীর্থ আনন্দস্বামী ভারতীয় শিল্পচেতনার

মর্ম ইয়োরোপের কাছে পৌছে দিতে চেয়েছিলেন। এখানেই তাঁর অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ। এঁরা উভয়েই শিল্পের বিশ্বভাষা খুঁজেছেন।

৪। তাঁরা শিল্পকে সর্ববিষয়ে প্রাদেশিকতা-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। নব্য শিল্প সংস্কৃতির মূল কথা হবে আন্তর্জাতিকতা, আবার শিল্পের আবেদন যতই আন্তর্জাতিক হোক না কেন তার একটি স্থানিক ভিত্তি থাকবেই। শিল্পকে শরীরী করতে হলে তার একটি local bias থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ বঙ্গ সংস্কৃতির pattern কেই বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে সংপৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। সে সময়ে অন্যতম সমালোচকের মতে :

> "The work of modern school of indian painters in Calcutta is a phase of the National re-awakenning The subjct chosen by Calcutta painters are takan from Indian history, Romance, Epics and Mythology···. Their significance lies in their distinctive Indian-ness. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.'

(E. V. Havell : A History of fine arts in India and Ceylon)

যিনি অবনীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন সেই হ্যাভেলের এই মন্তব্য অবনীন্দ্রশিল্প বুঝাবার পক্ষে সহায়ক।

ভারতীয়তা

১। অবনীন্দ্রনাথ রক্ষণশীলতাকে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। সমসাময়িক রক্ষণশীল সমালোচকেরা তাঁকে এই ভাবে বিচার করেছেন :

> ভারতীয় চিত্রকলার মূল সূত্রবোধ হয় এই যে এমন বস্তু আঁকিবে বা, এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোন সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে' অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ।'

(সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'সাহিত্য' বৈশাখ, ১৩১৭/১৯১২)

সমাজপতিগোষ্ঠির সমালোচকেরা মনে করেছিলেন :

ক। নতুন ভারতীয় চিত্রকলার প্রত্ন ভারতীয় বিষয়চেতনার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতিকে শিল্পের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা গেলেও অনুকৃতি ভারতীয় শিল্পের প্রধান কথা নয়।

খ। ভারতীয় স্বভাবের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা (Dichotomy) আছে তা এই শিল্পেও দেখা যায়। শিল্পী-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এরা প্রকৃতি থেকে সরে এলেও তার অর্থ এই নয় যে প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হচ্ছে। প্রকৃতি মনের সঙ্গে যুক্ত হলেই (তুলনীয় Bacon: Art is Nature added to Mind) শিল্প। এই বৃহত্তর অন্বয়সাধনে মনের পৌরোহিত্যে প্রকৃতির প্রকাশ প্রয়োজন। অবনীন্দ্রনাথ এই সত্য বুঝেছিলেন।

তাঁর সমসাময়িক কোন কোন সমালোচক অবনীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেও হ্যাভেল, নিবেদিতা, স্টেলা ক্রামরিশ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন:

ক। প্রাচীন ভারতের অন্ধ অনুকরণ এই আধুনিক শিল্পে নেই।

খ। ইয়োরোপীয় শিল্পকলায় নিসর্গ ও মানসের অন্বয় সেই ভারসাম্য অর্জন করেনি যা নব্য-ভারতীয় শিল্পচর্চার সাধ্য।

গ। সহযোগিতা ব্যতীত নিজেকে আবিষ্কার করা যায় না। সনাতন প্রথাশ্রয়িতার কবল থেকে বেরিয়ে এসে প্রাচীন প্রাচী-প্রতীচী আধুনিকতার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তাকে নতুন করে দীক্ষিত করতে পারে। নব্য ভারতীয় শিল্পকলায় এই সহযোগিতার ফলে তিনি একটি নূতন দিগন্ত রচনা করলেন।

অবনীন্দ্রনাথকে যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের প্রবণতায় ভারতীয়তার অভিধা ও দ্যোতনা একটি বিস্তার পেয়েছিল:

> ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তা প্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষিতার সহিত ভারত শিল্পের এই নববিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংহত। ঠাকুর মহাশয়ের [অবনীন্দ্রনাথ] এই ছবিখানিতে [পুরীতে ঝড়, ১৯১১] আছে একটি ধূসর কালিরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাস। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ('ভারতচিত্রশিল্পের পুনর্বিকাশ', 'প্রবাসী', ১৩২০, শ্রাবণ।)

এটি 'সাহিত্য'পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রতীপপন্থী সম্প্রদায়ের অবলোকন।

কিন্তু প্রবাসী গোষ্ঠীর সমালোচকেরা আধ্যাত্মিকতা ও স্বাদেশিকতার যে অর্থ ধরেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাকেও সমর্থন করেননি। স্বাদেশিকতা বিষয় হিসেবে নয়, অনুষঙ্গ হিসেবে আসবে, এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। অবনীন্দ্র নাথ প্রসঙ্গকে অস্বীকার না করে তাকে আপেক্ষিক স্থান দিচ্ছেন। ১৮৯৫ এ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের রাধাকৃষ্ণের পর্যায়ের বিষয় পদাবলী। যেখানে পদাবলী তাঁর প্রেরণার একটি শক্তিশালী উপলক্ষ্য মাত্র।

২। শুধু ভাববস্তু নির্ধারণের দিকেই নয় জীবনবিন্যাসের দিক থেকেও তিনি ভারতীয়। জীবনভঙ্গীর দিক থেকে তিনি নিহিত ভারতীয়তার মুখপাত্র। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে মনে হতে পারে তিনি মনন প্রবণতায় কখনো-কখনো অ-ভারতীয়।

৩। প্রাগাধুনিক ভারতবর্ষের শিল্পসমীক্ষার মধ্যে একটা আধুনিকতা আছে প্রাচীন বা মধ্যযুগের শিল্পে আত্মিক অভিব্যক্তি ঘটেছে—অবনীন্দ্রনাথ এই সূত্রে প্রাচীন তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সত্তার শৈলীকে রূপ দিতে গিয়ে অনুভব করেছেন ভারতীয় জীবনভাবনা একটি ঐতিহ্যে আশ্রিত নয়। এই পটভূমিকা অনেকগুলি ঐতিহ্যের আধার।

ক) বৈদিক যুগ পর্ব। অবনীন্দ্রনাথ-আনন্দকুমার থেকে শুরু করে নন্দলাল-বিনোদবিহারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই বৈদিক শিল্পতত্ত্বের কাছ থেকে এই নির্ধারণ গ্রহণ করেছেন যে প্রতিদিনের জীবনের ঘরোয়া অনুষঙ্গকে শিল্পে অস্বীকার করা যায় না।

অবচ্ছিন্ন শিল্পে বৈদিক-লৌকিক/প্রাক্-পৌরাণিক ভাবুকেরা বিশ্বাস করতেন না। প্রাচীনকালে আলপনা ছিল আতিথেয়তার আঙ্গিক বা পালা-পার্বনের একটা জরুরী মাধ্যম। কিন্তু কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজন চারিতার্থ করবার জন্য এই সৌন্দর্য ব্যবহৃত হয়নি। আমাদের বোধবৃত্তি অনুশীলনের জন্য শিল্পের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু সৌন্দর্যের ব্যবহারে মানসিকতার পরিসর বাড়ে। 'রথ''-ও একটা শিল্প। যে রথ তৈরী করে সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনকেও তৈরি করে না। কিন্তু ঘরোয়া জীবন থেকে সরিয়ে রথকে মিউজিয়ামেও স্থান দেওয়া যায় না, কারিগর মানেই শিল্পী নন কিন্তু শিল্পী মাত্রেই কারিগর, একথাটিও এই প্রসঙ্গে অস্বীকার করা যায় না।

এইজন্যই প্রেরণা বলতে পরিশ্রমও বোঝায়, মার্কসীয় শিল্পজিজ্ঞাসায় শ্রম পূর্বপ্রতিজ্ঞার মর্যাদা পেয়েচে। শ্রমের প্রাণস্পন্দন থেকেই গীতিবদ্ধ কবিতার জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ এই থিয়োরির সঙ্গে বিশ্বাস না করলেও তাঁর নান্দনিক আলোচনায় এ চিন্তা মাঝে মাঝে আভাসিত হয়ে ওঠে।

খ) রসবাদের উপর অবনীন্দ্রনাথ আনন্দকুমারের গভীর আস্থা ছিল। রসবাদের উৎস আমাদের পুরাণ ও উপনিষদের যুগেই। অবনীনাথ শাস্ত্রের মধ্যে শিল্পকে দেখেছেন। আত্ম-আস্বাদনের উপর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েছেন। রসবাদের দার্শনিক এষণা, নিজেকে জানা এবং নিজেকে পাওয়া। 'স্বয়ং বিদানন্দের' তাৎপর্য নিজেকে জানা। আত্মপরিচিতি না থাকলে শিল্পচর্যা ব্যর্থ। শিল্পকে জানতে হলে শিল্পীকেও জানতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ এই ধারণার ওপর জোর দিয়েছেন। যদিও একথার তাৎপর্য এই নয় যে অস্মিতসর্বস্ব শিল্পীকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তাই কিউবিজমকে তিনি কুজাইজম্ বলে বিদ্ধ করতে ছাড়েন নি। শিল্পী শিল্পে তার নিজের হৃদয়কে রূপায়িত করেছে।

আমাদের মনে সবসময়ই একটি জগত নির্মিত হতে থাকে। শিল্প এই জগতের একটি অভিক্ষেপ। এই অর্থে শিল্পায়ন যেন পূর্বনির্নীত। একটি মূর্তিতে ব্যক্ত কল্পনা শিল্পীর স্বজ্ঞার মধ্যেই অনেক আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকে। এর সমর্থনে আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন :

> We see an anticipation of modern views which associstee myth and dreams and art as essentially similar, and representing the dramatization of man's innermost hopes and fear. (Hindu view of Art)

স্বপ্নপুরাণ বা স্বপ্নের নক্সা পুরাণেরই সৃষ্টি। যে শিল্প শিল্পীর আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে না তা লঘু। শিল্পী নিজেকেই উৎকীর্ণ করেন।

ভারতপুরাণ বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে আত্মপ্রকাশ ছাড়া শিল্পের কোনো মর্যাদা নেই। অগ্নিপুরাণে এরকম সংকেত দেওয়া হয়েছে, একজন ভাস্কর শিল্প কাজ গড়বার আগে নিজের স্বপ্নের পরিমাপ নেবেন। কোনারক, খাজুরাহো ইলোরাতেও এইসব শিল্পের মানসিকতা উৎকীর্ণ হয়েছে শিল্পের মধ্যে। এই

সূত্রটিতে অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করেন ভারতশিল্পীর মূর্তিধ্যানে আবেগবাসনা সঞ্চারিত।

বেনেদেত্ত ক্রোচের অঙ্গীকারও এই সূত্রে অনিবার্য :

> The artist whenever makes a stroke with his brush without having previously seen it with his imagination is no Artist.

গ। অবনীন্দ্রনাথ পূর্বতন ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছেন, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য বহিরঙ্গ ঘটনাকে বিপর্যস্ত করা শিল্পের ধর্ম। সত্তার প্রয়োজনে বহির্বিশ্ব বিপর্যস্ত হচ্ছে। যান্ত্রিক বস্তুসংগতি মানা হয়নি। অজন্তার সপ্তদশ গুহাচিত্র—গোপার কাছে ভিক্ষারত বুদ্ধদেব—এই চিত্র অবনীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়। সেখানে তিনি এতই বিশাল যে শরীর সংস্থান যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আত্মিক জীবনের স্তর দেখানোর জন্য শরীরসংস্থান বা পারিপার্শ্বকে ভারতীয় শিল্পী অতিক্রম করে গেলেন। সেমিটিক শিল্পকলাতেও এ ব্যাপারটি আছে। কিন্তু 'সেটি শক্তির স্তরবৈষম্য থেকে নিষ্ক্রান্ত। অবনীন্দ্রনাথ এধরনের অভিপ্রায়কে তাঁর সহজাত আভিজাত্য বোধ সত্ত্বেও, কখনো স্বীকার করেননি।

ঘ। অবনীন্দ্রনাথের নিজের মনে প্রশ্ন উঠেছিল—শিল্পীর অনুধ্যান সার্বজনীন হতে পারে কিনা।

> Art is a matter of De-subjectivization of the artist's subjective feelings and it raises the most controversial issue of his acceptance by all,objectively. (S. K. Nandi 'The journal of Aesthetic and Art criticism, Vol XVIII)

শিল্পীর হাতে যা ভাবগত তা হয়ে উঠবে তদ্‌গত। এই আত্মবিলোপক্ষমতা আবার অনাত্মকেন্দ্রিকতা। এই অনুভূতিগুলি সত্তায় সূচিত হবে আবার বস্তুরূপেও প্রকাশ পাবে। এই মতাদর্শ ধ্রুপদী পশ্চিমী নন্দনতত্ত্বের অন্ত্যপ্রান্তিক। আরিস্টটল থেকে শুরু ক'রে অন্তত ফিলিপ সিডনি পর্যন্ত ইয়োরোপের নন্দনতত্ত্ব 'Imitation' এর উপর নির্ভরশীল। বিষয়গত বা বস্তুগত যে কোন ঘটনাকে অনুকরণের চেষ্টা চলছে।

সুতরাং De Subjectivization বা ব্যক্তিসত্তাকে সার্বজনীন করাই হলো

ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের নির্দেশ। এই শিল্পতত্ত্বে fancy বা খেয়ালের সুযোগ নেই। আমরা যা করি জন্মসূত্রে তা আত্মগত, শিল্পসূত্রে বিশ্বগত। অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে এই ধারণা সমর্থিত হয়েছে।

৪। শিল্পীর এই সজাগ আগ্রহ ভিতরকে বাইরে নিয়ে আসে, কিন্তু সাধকের আগ্রহ তাঁর ভিতরেই আবদ্ধ। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের কাছে একযোগে রস ও সত্যকে দাবী করেছেন। এই সত্যের দৃষ্টি থাকার ফলেই শিল্পী জগতকে নিছক বস্তু নয় ভাবরূপেও দেখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ এই সত্যের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে ভারতীয় বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের কাছে গেছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করলেন স্টেলা ক্রামরিশ।

> 'Whatever painting bears a resemblance to this earth, with proper proportion, fall in height, with a nice body round and beautiful, is called true to life'.

যে ছবির জগতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, সুসঙ্গতি আছে, দীর্ঘায়ত, সুঠাম, বৃত্তায়ত তাকেই জীবনের কাছে বিশ্বস্ত বা সত্য বলা চলে। এই অমর্ত মাত্রাটি কি বাস্তব জগতে সম্ভব?

এই সত্যস্পর্শী মাত্রাটির সৌজন্যে অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন:

> পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। ঢেলে দিয়েছে সোনার উপর সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা তা হচ্ছে ভাব। আমি দেখলুম এবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য দেখলুম, কি করে তার ব্যবহার জানলুম। এবারের ছবিতে ভাব দিতে হবে। (অবনীন্দ্রনাথ, জোড়াসাঁকোর ধারে)

ওকাকুরা চেয়েছিলেন পশ্চিম প্রাচ্যের কাছে আসুক। অবনীন্দ্রনাথও পশ্চিমকে প্রাচ্যের কাছে শিক্ষার্থী হতে বলেছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সার্বভৌম, আত্মস্থ ভারতীয়তা যার ভিত্তি।

অংশ ও সমগ্র

প্রাচ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য একান্ত নিজস্ব হলেও তা যে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চত্যবিরোধী হবে তা অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। প্রাচ্যশিল্প জীবনের সমগ্রতাকে খোঁজে। এই সমগ্রতার কতকগুলি অংশে সম্পূর্ণ সংগতি আছে। এই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ

শাস্ত্রিক ষড়ঙ্গবাদ নতুন করে যাচাই করেছেন। অংশের সঙ্গে সমগ্রের পারস্পরিকতায় ঋদ্ধ এই তত্ত্বের অবনীন্দ্রকৃত ভাষ্য পশ্চিমে স্বীকৃতি পেয়েছে :

"রূপভেদ : প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনাম/সাদৃশ্যম্ বর্ণিকাভঙ্গং ইতি চিত্র ষড়ঙ্গকম্।"

(১) রূপভেদ (২) প্রমাণ (৩) ভাব (৪) লাবণ্য (৫) সাদৃশ্য (৬) বর্ণিকা ভঙ্গ—চিত্রকলার এই ছয়টি অঙ্গ থাকবে। এই ছয় অঙ্গের সুষম সঙ্গতিই হচ্ছে শিল্পে ভারতীয়ত্ব।

১। রূপভেদ : তিনি প্রথম শর্ত হিসেবে রূপকে ব্যবহার করেছেন। রূপ ও রূপভেদ তাঁর কাছে সমার্থক। 'যাকে সুন্দর বলি, তার কোঠা সঙ্কীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূর প্রসারিত। একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য আছে, আরেকটাতে চরিত্র প্রধান। এই চরিত্রকে চিনে নেবার জন্য অনুশীলনের দরকার করে।' (সাহিত্যের পথ, পৃষ্ঠা ১২৮) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অবনীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছিলো।

খ। রুচিভেদের দরুণ আমাদের চোখে অনেক কিছু অসুন্দর ঠেকে।

গ। ক্রোচে মনে করতেন : Beautiful expressions are sometimes ugly···there are degrees of ugliness". অবনীন্দ্রনাথেরও এই বিশ্বাস।

২। প্রমাণ : অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের অমোঘতা সম্বন্ধে বলেছেন যে ছবি বিচ্ছিন্ন নয়; বিচ্ছিন্ন জীবন দ্বারা আশ্লিষ্ট। ছবি আচ্ছাদিত নয়; ছবির মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন ভাবে দেখা যায় এটিই ছবির প্রমাণ। রূপসৃষ্টি করে শিল্পী সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রমাণ দেবেন। একজন শিল্পী ব্যক্তিগত অনুভূতিকে মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিল্পী একাধারে স্রষ্টা এবং সমালোচক।

৩। ভাব : সাধারণ অর্থকে অবনীন্দ্রনাথ নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। ভাব বলতে তিনি সামগ্রিক অনুভূতি ও অভিপ্রায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমাদের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের মত পাঁচটি অন্তরেন্দ্রিয়ও আছে : মন, বুদ্ধি, সংস্কার, চিত্ত ও স্নায়ুমণ্ডলীকে তিনি "ভাব" শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বৈষ্ণব ও জাপানী এই দুই নন্দনতত্ত্বের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। উজ্জ্বল-

নীলমনি গ্রন্থে (রূপ গোস্বামী) এইরকম দৃষ্টান্ত আছে যে ভাবের অনুসূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটে বিভাবের জন্য। হাব, ভাব, ছলা—অবনীন্দ্রনাথ এই তিনটি শব্দকে একটি ভাবাসঙ্গে ধারণ করেছেন। তাই সঞ্চারীর সংখ্যা তাঁর কাছে তেত্রিশটি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী।

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু ভাবনাকে সংখ্যা দিয়ে নিরূপণ করেননি। তিনি ভাবের দুটি দিকের উপর জোর দিয়েছেন: ভাবের (১) ব্যক্তিগত ও (২) প্রকাশের দিক।

আমাদের প্রচলিত অলংকার শাস্ত্রে যদিও ভাবের চেয়ে রসের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে কারণ ভাব ব্যক্তিকেন্দ্রিক; রস বিশ্বব্যাপী। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু ভাবকেই সম্মানিত করেছেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভাব হয়েছে মহাভাব; রস হয়েছে রসরাজ, সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ভারতীয় নন। এখানে তিনি জাপানী নন্দনতত্ত্বের উপর নির্ভর করেছেন। শিল্পের গোপন রহস্য জাপানীদের কাছে যা Hanna অবনীন্দ্রনাথ তাকেই "রূপের পরিমল" বলেছেন।

এই "হানা" না থাকলে ছবি ব্যর্থ। ভাবকে নিহিত রাখতে হবে শিল্পকর্মে। এই তত্ত্বটি অবনীন্দ্রনাথ ওকাকুরার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। দৃশ্যের আড়ালে আছে অদৃশ্য কেন্দ্র। ছবির স্তরে স্তরে ভাব ছড়িয়ে আছে জাপানী নন্দনতত্ত্বের এই কথাটি তিনি গ্রহণ করলেন।

৪। লাবণ্য: ভাব বলতে তত্ত্বচিন্তা নয়; মানবমনের সূক্ষ্মতম ভাবনাকে বোঝায়। এই সূক্ষ্মতম ভাবনাকে সুনির্নীত করে লাবণ্য। এখানে আবার অবনীন্দ্রনাথ "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। লাবণ্য হচ্ছে—মুক্তাফলের ছায়া। যাতে দাহহীন দীপ্তি আছে। লাবণ্য ভাব ও ভঙ্গিকে সুসংহত করে। লাবণ্য যোজিত না হলে ভাবেও অসংগতি আসতে পারে যদি সেখানে ভঙ্গি প্রাধান্য পায়। ভঙ্গির সুনির্নীত সীমা নির্ধারিত করে লাবণ্য।

লাবণ্যের কাজ বিশুদ্ধি এবং সংযম যার অভাবে শিল্প ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন প্রাণ। অবনীন্দ্রনাথের লাবণ্যও তাই। লাবণ্য অর্থে এখানে কেবলমাত্র মসৃণতা বোঝায় না। এ একধরনের সীমাচেতনা, পরিমিতি বোধ। আগ্নেয়গিরির ছবি আঁকলেও তাতে লাবণ্য ব্যবহার করতেই হবে।

৫। সাদৃশ্য : এই সাদৃশ্য আক্ষরিক অর্থে প্রতিরূপ নয়। অবনীন্দ্রনাথ ভিতর ও বাইরের সাদৃশ্য খারিজ করে সত্তার সাদৃশ্য দেখেছেন। Impressionist দের মত কেবল মাত্র বহির্জগতের সাদৃশ্য বহন করা শিল্পের কাজ বলে অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। Expressionism এ এর প্রতিরোধ দেখা গেল। এঁদের লক্ষ্য অনুভূতির সাদৃশ্যে প্রতিলিপি রচনা করা।

অবনীন্দ্রনাথ "মত ও মন্ত্রে" এই দুই জগতকে অস্বীকার করে এক অন্তরতর প্রস্থান খুঁজেছেন। এই সাদৃশ্য আমাদের কাছে সৃষ্টির রহস্যকে মনে করিয়ে দেয়। সাদৃশ্যের দুরকম প্রকার ভেদ : কোন কোন শিল্পী বস্তুর সাদৃশ্যে বস্তুই এঁকেছেন—তাকে অধম সাদৃশ্য বলা যেতে পারে। এই অধম সাদৃশ্যের উর্ধ্বে তিনি উত্তমসাদৃশ্যকে স্বীকার করেছেন। এখানে ভাবের অনুরণনে সাদৃশ্য আসে।

৬। বর্ণিকা : বর্ণিকা (Sense of colour) বা বর্ণজ্ঞান। বর্ণিকা বলতে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শিল্পী যখন শিল্পের রূপ ও রেখাকে এবং তার রহস্যকে অনুধাবন করেন তখনই তিনি রঙের ব্যবহার করতে পারেন। ভারতের নাট্য শাস্ত্রে ভিন্নরঙের ভিন্ন প্রতীকবাদ আছে। প্রতীকের গভীরতা প্রকাশ পায় রঙের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। শিল্পীর চরম পরীক্ষা রঙের ব্যবহারে। এর মধ্য দিয়ে শিল্পীর মাত্রাবোধ প্রকাশ পায় এই রঙ নির্বাচনে। রঙের মধ্য দিয়ে শিল্পের এবং সৃষ্টির রহস্যকে শিল্পী ফুটিয়ে তোলেন।

প্রচীন অলংকারশাস্ত্রের মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথ এইভাবে তার নব্য-নন্দন -বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর চারটি প্রবন্ধের অনুষঙ্গে এই সৌন্দর্যচিন্তার পরিচয় আরো বিশদ হতে পারে।

সুন্দর

অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন ধারণাকে বিংশশতাব্দীর জীবন বোধের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই যুক্ত করার কয়েকটি সূত্র আছে :

১। সৌন্দর্য সর্বায়ত নয়, অনমনীয় সৌন্দর্য বলে কিছু নেই। সৌন্দর্য আপেক্ষিক। "That neither comes, not goes, neither fades not flows away—" এই সূত্র থেকেও তিনি সরে এসেছেন, দিব্যসৌন্দর্যের কোন ক্ষয় বা লয় নেই অথচ অস্থিত অসুন্দরকেও সুন্দরের মধ্যে অঙ্গীভূত ক'রে নেওয়া যায়। অসুন্দরকে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় সুন্দরের অভিধা

দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম বিবেচনায় যা মানব পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত তাই সুন্দর। যা আমাদের প্রত্যক্ষ চেতনার ওপর দাগ কাটে তাই সুন্দর। নন্দনসমীক্ষা এখানেই অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচিন্তা পরস্পরকে স্পর্শ করেছে।

২। সুন্দর বিষয়গত নয় পরিপ্রেক্ষণাশ্রিত। সৌন্দর্য দেখার ভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এই দেখা হবে বিশেষ নির্বাচিত দূরত্ব থেকে। এই ধারণাটির তত্ত্বনাম theory of distance। সৌন্দর্যকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে সৌন্দর্যকে সনাক্ত করা যায় না। পবিত্র অনুষঙ্গকেও আমরা সৌন্দর্য বলি কিন্তু মন্দিরের ভিতরে থেকে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের প্রাচ্যবোধ হিন্দু সংস্কার নয়। হিন্দুত্বের সংস্কার ত্যাগ করে সৌন্দর্যসংস্কারকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

৩। তিনি মনে করেন সিদ্ধরস হল ভালোমন্দের বিভাজন রেখা যেখানে মানব মনের আবিষ্কার। মসৃণ সৌন্দর্যচেতনা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সৌন্দর্য ধারণাকে প্রসারিত করতে হবে। সাদা তুষার যেমন সুন্দর কালো তুষারও তেমন, মানুষের জীবনের যে কোন উপলব্ধি সুন্দর বলে গণ্য হতে পারে। সাহিত্য বা শিল্প প্রকৃতির আরশি নয়, জীবনের আবেগকে যে চূড়ান্ত প্রত্যক্ষতায় প্রকাশ করা যায় শিল্পে তাকে সূচিত করেই রূপ দেওয়া সম্ভব। তিনি অনুভূতির তীব্রতাকে যেমন বিশ্বাস করেন প্রকাশভঙ্গির মিতব্যয়িতাকেও সেরকমই মানেন। তিনি সুনীতি নয়, সুমিতির উপর জোর দিয়েছেন।

৪। অমঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরকে যোগ করলে আমাদের বোধ সমৃদ্ধ হয় বলে তাঁর ধারণা। রাত্রির নিঃসঙ্গতায় শিল্পের সন্ধান, অবশ্য এই অসিতচিন্তাও উপাদান, রূপ নয়। মানসিকতার সংযোজনে এই রূপান্তর ঘটে : মন যতক্ষণ কালী হইতে পৃথক হইয়া আছে, কালী ততক্ষণ কালো কালি মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালী আর কালো নাই সে ষড়ঙ্গের বরণ ডালায় আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে (ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, পৃ৫৫)

শিল্প ও ভাষা

রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সাদৃশ্য সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্বকীয়। প্রবন্ধটির অনুষঙ্গে মনে আসে মালার্মের কাছে দেগার সেই প্রশ্ন :

"আমার মনে তো বিচিত্র ভাবোদয় ঘটে, তবু কবিতা লিখতে পারিনা কেন?" মালার্মের উত্তর: "কবিতা শব্দ দিয়েই লেখা হয়।" ভাব থাকলেও কবিতার প্রধান সমস্যা ভাষার সমস্যা, রবীন্দ্রনাথ ও নীরব কবিত্বে বিশ্বাস করেননি। যে কাঠ জ্বলেনি তাকে যেমন আগুন নাম দেওয়া যায়না তেমনি যে কবি লেখেননি তাঁকে কবি বলা নিরর্থক।

ভাষার সমস্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এঁরা দুজনেই সংস্কৃত অভিধানের কাছে গেছেন: বাণী এবং রাগিনী এঁদের আশ্রয় বাগদেবতা। ভাবপ্রকাশই একমাত্র ভাষার উপযোগিতা নয়, ভাষার শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা নান্দনিক। মানবসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম ভাষা শিল্পভাষা। ভাষার এই ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ:

> ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূলউপাদান হলো বাণী.........বাণীর চালে একটা ওজন আছে, তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য। এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে, বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই, তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্যে কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।" ("ছবির অঙ্গ"—পরিচয়)

অবনীন্দ্রনাথের ষড়াঙ্গবাদ রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ দাবী করেছেন ছবির ভাষাই সার্বজনীন ভাষা।

শিল্পের রীতি চতুরঙ্গ:

১। শাস্ত্রশিল্প (classical academic art)
২। লোকশিল্প (folk art)
৩। বিদেশী বা পরশিল্প (foreign art)
৪। মিশ্রশিল্প (adopted art)

শিল্পের এই চারটি ধারার সবগুলিতেই শিল্পীর সঞ্চরণ ঘটবে। কোন একটির মধ্যে আবদ্ধ হওয়া মানেই তাঁর মৃত্যু। আবার শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পের নানা ঘরাণার সঙ্গে পরিচিত হলেও চলবে না। তাঁকে সঙ্গীত বা মানবজীবন/মানবভাষা এবং সাংকেতিকতা এই দুটিকে মেলাতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের মতে চিত্রকলায় থাকবে—কথিত ভাষা, চিত্রিত এবং ইঙ্গিতের ধারণা।

ভাষায় আদলে ছবিও আছে, সংগীতও আছে। ছবির মধ্যে লেখার

ধারণা সহজেই সংঘটিত হয়। একটি ছবির আবেদন ষড়েন্দ্রিয়ময় সমগ্র মানুষের কাছে।

একটি বিষয়কে তার উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। যেমন চিত্রময় অনুভূতি চিত্রের মাধ্যমে। Jesperson বলেছেন : An ideal language would always express by the same thing by same and by similar things by similar means.

অবনীন্দ্রনাথও জানেন ছবির মধ্যে মানবভাষার সাংকেতিকতা থাকবে। যখন যে অনুভূতির প্রকাশ হচ্ছে সেই অনুযায়ী মাধ্যম হবে।

শিল্পী যখন সামগ্রিক আবেগকে শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন সে ভাষা সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্রের মত গ্রথিত। একটি ছবি থেকে সুরকে সরিয়ে নেওয়া যায় না। 'A change of language can transform our appreciation of cosmos' বলেছেন বেঞ্জামিন লী হর্ফ। ছবি থেকে একটি রং সরিয়ে নিলে কবিতা থেকে একটি শব্দ সরিয়ে নিলে বিশ্বজগতের ভাষাই নষ্ট হয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবির ভাষা বিশ্বভাষা, যার ভিতরে বিশ্বজগতকে ধরা যায়। বিশ্বদর্শন বা বিশ্বচেতনাকে বোঝানোর জন্য তাঁরা ছবিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।

জাতি ও শিল্প

এই প্রবন্ধটি শিল্প ও ভাষার সম্পূরক। এটি রচনায় একটি উদ্দীপন প্রেরণা ছিল। বিশ শতকে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। আর্যসমাজ থেকে হিন্দুমহাসভা পর্যন্ত একটি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় নীতির সংস্পর্শে।

অবনীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর্য ও প্রাচ্য সমার্থক বলে ঘোষণা করা সেই আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল। অবনীন্দ্র-নাথ সেভাবে দেখেন নি। তাঁরা আর্যতাকে সবার উপরে স্থান দিতে চাইলেন অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের ওপর জোর দেন। তাঁর মতে নিখিল মানুষের মধ্যে জাতীয়তা ও দেশজ ভাব নিশ্চয় আছে কিন্তু সেই সঙ্গে সে বিশ্বজনীন। তিনি স্থানিক মানলেও আন্তর্জাতীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

অবিভাজ্য যে শিল্পরস তা দেশী বা বিদেশী সেটা প্রশ্ন নয়। সে রস হবে সর্বজনীন। এখানে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে ঈষৎ সরে গেছেন। শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি—রাবীন্দ্রিক শিল্পচিত্র দেবশিল্প দ্বারা শাসিত। অবনীন্দ্রনাথ মানব ও দেবশিল্পের উপর পার্থক্য প্রকটিত করতে চাইলেন না। তিনি মনে করলেন জীবন ও জগতের তাবৎ শিল্প এক। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রকথিত আধ্যাত্মিক শিল্পের শ্রেষ্ঠতাকে বিরোধিতা করলেন।

"সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবিতার অবনয়ন ঘটে" এইনির্ধারণের অনুষঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন জাতীয় উৎকর্ষের সঙ্গে শিল্পের অপকর্ষ ঘটে। জাতির উন্নতির সঙ্গে শিল্পের কোন যোগ নেই। (জাপানের চিত্র।) জাতির সঙ্গে শিল্পী কবির যোগ জাগ্রতের সঙ্গে ঘুমন্তের ন্যায়। এই তারতম্যকে সমানুপাতিক তারতম্য (Concomitmant Variation) বলা যায়।

এর দৃষ্টান্ত ঃ

ক) রাশিয়ায় জারের সময়ে জাতির অবনতির ফলে টলস্টয়ের আবির্ভাব।

খ) ১৫ শতকে 'নো' রচিত হয়েছে দ্বন্দ্বহিংসার যুগে। আবার অন্যদিকে দ্বন্দ্বময় কাবুকিনাট্যধারা রচিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়পটে।

গ) রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, জাতির সমাধির উপর সাহিত্যের ফুলবাগান নাই বা রচিত হলো।

রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতীয় জীবনে শিল্পীর একটি পরিমণ্ডল থাকলে ভালো হয়। অবনীন্দ্রনাথের কাছে জাতি একটি পুরাণকোষ। তার রূপকথা, ব্রতকথা প্রবচনগুলিও শিল্পীমনে কাজ করে। এই চেতনা জন্মগতভাবে প্রোথিত। এটিই জাতীয় চেতনা। এই স্মৃতির উত্তরাধিকারকে শিল্পী নিজেই তাঁর শিল্পে প্রকাশ করেন। আয়োজিত জাতীয়তাবাদ শিল্পের পরিপন্থী।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প art for Nature's sake নয়; art for Artist's sake এর ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। শিল্পেই শিল্পীর মুক্তি তার সত্তার অবন্ধনে। সেখানে তাকে জাতীয়তার বন্ধনে বাঁধা চলবেনা। শিল্পীর মনের রসবোধ শিল্পের সাহায্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই রসবোধেরও একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। এক পরিবেশের শিল্পকে আর এক পরিবেশে চালনা করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ :

এঁদের সাদৃশ্যের আড়ালে বৈসাদৃশ্যই বেশী। দুজনেই কখনো কখনো একই উৎসসূত্র (যেমন উপনিষদ, কীটস্) ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাহলেও এঁদের দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র।

১। The mighty abstract idea of beauty in all things··· I have loved the prnicple of beauty in all things কীট্সীয় এই ধারণা রবীন্দ্রনাথে সক্রিয়। তাঁর মতে "সৌন্দর্য মাত্রেই abstract, সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা। কীট্স্এর সৌন্দর্যচেতনা থেকে সৌন্দর্যদৃশ্য অপেক্ষা সৌন্দর্যের আদর্শকেই তিনি বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু কীট্সের সৌন্দর্যধারণায় ইন্দ্রিয়চেতনাকেই অবনীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের "শুধু রেখে গেল তিন ফোঁটা মধু"—এই অর্থেই কীট্সীয় ; তাই রবীন্দ্রনাথের প্রস্বর যেখানে Truth is beauty র উপর, অবনীন্দ্রনাথের ঝোঁক "Beauty is trnth" অংশের স্বয়ম্পূর্ণতায়।

২। সৌন্দর্যের ডাকে সাড়া দিতে হবে এই ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে বলাকা পর্ব থেকেই, ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যায় এই ধারণায় মৌল "সৃষ্ট যা ···· সৃষ্টিকর্তার কাছে তা ঋণী হয়ে রইলনা" (আলোর ফুলকি, ১৯২২)। অবনীন্দ্রনাথের হাতে এই ঋণশোধের ব্যাপারটা অনেক বেশী জীবন্ত।

৩। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ললিতকলা আকাদমির ভাষণে অবনীন্দ্রপ্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন, "তিনি সাধক নন, তিনি যোগী নন, তিনি শিল্পী"। "আত্ম-পরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথের দাবি আপাতসদৃশ হয়েও কোথাও আলাদা : "আমি বিচিত্রের দূত"। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা বৃহত্তর সাধনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কাছে শেষপর্যন্ত শিল্প উপায়।

অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিল্প একাধারে উপায় এবং উদ্দেশ্য। শিল্পীর জীবনকে তিনি আত্মোৎসর্গের জীবন মনে করছেন। তাঁর সাধনা তাঁর কাছে কোন অধ্যাত্ম সাধনার অছিলা নয়।

৪। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন : "জগতের উপর মনের কারখানা এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা। ···সেই উপরতলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি ("সাহিত্যের বিচারক", সাহিত্য) তখন ঋগ্বেদের (৫/২৯/১) ঝোঁকটি স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে অবনীন্দ্রনাথের এষণা অন্তর্মুখী। "আর্টের তিনটি স্তর আছে। একতলায় craftsman, দোতলায় যা তৈরী হয়ে আসে একতলা থেকে ...... তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল যেখানে শিল্প মুক্ত।" শিল্পের এই সর্বাত্মক মুক্তি রবীন্দ্রনাথের দেবশিল্পশাসিত নন্দনতত্ত্বে নেই।

৫। ১৯৩৪—অবনীন্দ্রমুখী হলেন রবীন্দ্রনাথ। অক্সবিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভাষণে তিনি বলেন—শিল্পের সত্যও সার্বজনীন হয়না। শিল্পীর ব্যক্তিগত হৃদয়ে শিল্পের জন্ম এবং মানবরুচি আপেক্ষিক। একথা আগেই অবনীন্দ্র বলেছেন—"সুন্দর" প্রবন্ধে (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ ১৭৫)।

৬ এঁদের দুজনের ব্যবহারিক ও নান্দনিক শিল্পতত্ত্বগত পার্থক্য : 'অবকাশের মঞ্জরী' এই রোম্যান্টিক প্রেক্ষণী থেকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পকে দেখেছেন।

ললিতকলা ও ফলিত শিল্পের মধ্যে সহজ যাতায়াতের পথে অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যহ জীবন থেকে সৌন্দর্য আহরণ করেছেন। প্রাত্যহিকতার মধ্যে সুন্দরের চর্যা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারীর বিশেষত্ব। লৌকিক জীবন-সাধনাকে সৌন্দর্য সাধনায় অঙ্গীভূত করলেন এঁরা। সুন্দরকে অবনীন্দ্রনাথ নির্বস্তুক করে দেখেননি বলেই 'সৌন্দর্য' শব্দটি—রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত—তাঁর ততোটা পছন্দসই নয়। "সুন্দর"ই তাঁর সুন্দর।

৭। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি নিঃশর্ত। বেশি কিন্তু এই শর্তহীনতা নন্দনতত্ত্বে যতোটা, স্বরচিত শিল্পে তার নান্দনিক প্রয়োগে নিঃসন্দেহে তার কণামাত্রও নয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, এমনকি গগনেন্দ্রনাথ, অনেক বেশি আধুনিক।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

উইলিয়ম ব্লেক : ছবিতে কবিতা

বছর চল্লিশেক হল, উইলিয়ম ব্লেকের অনন্যতা সমালোচকদের আলোড়িত করেছে। কবিতার ইতিহাসে ব্লেকই একমাত্র যিনি ভাষা ও ছবির সাযুজ্যে কবিতা গড়েছেন। ব্লেকের কবিতা রেখা-রঙে বিন্যস্ত এক ডিজাইন বা এচিঙ—ভাষায় যা বিধৃত ছবিতে তা কখনও প্রসারিত, কখনও সঙ্কুচিত, কখনও বৈষম্যে আহত। ব্লেকের কবিতা মুদ্রনযন্ত্রের প্রসাদে কালো টাইপে ছেপে যখন হাতে আসে, তখন তার অর্থসম্পদ হারিয়ে যায়। এচিঙের সামগ্রিক বিন্যাসেই এই কবিতার অস্তিত্ব, তার গভীর পরিমণ্ডল থেকে বিছিন্ন করে আনলে ব্লেকের কবিতার অঙ্গহানি তথা অর্থহানি ঘটে। অথচ এতাবৎকাল ক'জনই বা ভাষায় ছবিতে মিলিয়ে ব্লেকের কবিতা পড়েছেন, এলিয়ট পড়েননি, লীভিস পড়েননি। য়েট্‌স্‌ও পড়েননি, কিন্তু তিনি অন্তত ব্লেকের ছবি চিনেছিলেন, যেমন চিনেছিলেন আরেক কবি-শিল্পী ডি. এ্যচ্‌. লরেন্‌স্‌। অথচ এই দুই দৃষ্টিকে না মেলালে 'দ লিট্‌ল্‌ বয় লষ্ট' ও 'দ লিট্‌ল্‌ বয় ফাউণ্ড'-এ দৈবের দুই বিবাদী মূর্তি চোখে পড়বে না। প্রথম কবিতায় একটি শিশু কাঁদছে, তার বাবার কাছে কাতর মিনতি জানাচ্ছে, তার বাবা যেন দ্রুত পা ফেলে অনেক এগিয়ে গেছে, বাবা সাড়া দিলে অন্ধকারে সে তার পথ খুঁজে পাবে। প্রথম স্তবকের নৈকট্য থেকে দূরত্বের বিভীষিকা দ্বিতীয় স্তবকে ভয়ংকর শূন্যতায় রূপান্তরিত হয়: অন্ধকার রাত, শিশুর বাবা কোথায়ও নেই, কোন দিন ছিলই না, শিশু শিশিরস্নাত, সামনে গভীর পাঁক,

> The child did weep
> And away the Vapour flew.

ছবিতে 'ভেপারের' রূপ ভয়ংকর, যেন একটা হাইড্রা তার সমস্ত বাহু প্রসারিত করে শিশুকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। হাইড্রার ব্যাদত্ত মুখে যেন গলিত লোহা ঝরে পড়ছে। অথচ ছোট্ট ছেলেটি দু হাত বাড়িয়ে সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির পিছনে ছবির ডান দিকে দুটো

পত্রহীন গাছ গাঢ় বাদামী রঙের কাণ্ড ঝুঁকিয়ে যেন ছেলেটিকে ঐ দিকেই এগিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত ছবির মধ্যে একটা অবশ্যম্ভাবী গতি আছে, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। প্লেটের উপরার্ধ জুড়ে ছবি, নিচে অলংকৃত কবিতাটি। হালকা নীল জমিতে সোনালী রঙে কবিতাটি লেখা। কবিতাটি ঘিরে দু'টি দেবদূতের ভাসমান শরীর। প্লেটের একেবারে নিচে নক্ষত্রখচিত গাঢ় নীল আকাশ। দ্বিতীয় কবিতার ছবিতে দু দিক থেকে তিনটি গাছ সামান্য হেলে একটি গাঢ় সবুজ তোরণপথ রচনা করেছে। তারই মধ্য দিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে আসছে সঙ্গে এক দৈবমূর্তি, কবিতায় যদিও তার বর্ণনা—

কাছেই থাকেন ভগবান,
শুভ্র বসনে এলেন তার বাবার মত

—ছবিতে দৈবমূর্তি নারী। দৈবমূর্তি ও শিশু বেরিয়ে আসছে গভীর বন থেকে, ছবি থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে।

ব্লেকের জগতে দুই ঈশ্বর—এক ঈশ্বর ' ···রাজার রূপক, আর কিছুই নয়। ঈশ্বর পুরোহিত ও রাজার প্রেতমূর্তি। এরাই বাস্তব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেবলমাত্র এদেরই নিঃশ্বসিত বায়ু রূপে।' ব্লেকের নিজস্ব পুরানে ইউরিজেন, নোবোড্যাডি, অ্যান্টিক্রাইস্ট ইত্যাদি নানা নামে এই ঈশ্বর নৈতিকতার অমানুষিক নিয়মের প্রণেতা ও নিয়ামক। এই ঈশ্বর নিজেকে ঘিরে রাখেন রহস্যের মায়াবী জালে, যাতে ভয়ে মানুষ বশ মানে। 'দ লিট্‌ল্ বয় লস্ট'-এর ছবিতে এই ঈশ্বরেরই অদৃশ্য অথচ ভয়ংকর উপস্থিতি। কবিতায় 'ভেপার' ও থর্নটনের 'লর্ড্‌স্ প্রেয়ারের নতুন অনুবাদের' উপর ব্লেকের মন্তব্যে ঈশ্বরকে 'ইফ্লুভিয়া'র অংশ বলে বর্ণনা, এই দুয়ের যোগ ও 'ভেপারের' চিত্রিত প্রতিরূপে দৈবের সেই ইউরিজেনিক রূপ প্রতিষ্ঠিত।

ঈশ্বরের অন্য রূপ অর্ক বা খৃষ্ট বা লস। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈপ্লবিক চেতনার প্রতিমূর্তি রূপে অর্ক 'অ্যামেরিকা' কবিতায় ইউরিজেনকে সম্বোধন করে বলে :

আমিই অর্ক, অভিশপ্ত গাছের গায়ে জড়িয়ে আমিই, শেষ হয়ে গেছে তোমার

যুগ, ছায়া কেটে যাচ্ছে, সকাল ফুটে উঠছে, যে আগের আনন্দ ইউরিজেনের আদেশে দশ অনুশাসনে বিকৃত, যে রাত্রে নক্ষত্ররাজিকে সে এগিয়ে নিয়ে গেছল বিশাল শূন্যতার মধ্য দিয়ে,

সেই পাথুরে আইন আমি পায়ের চাপে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি; আমি ধর্মকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছি চার বায়ুতে,

ছেড়া পুঁথির মত, কেউ তার পাতাও জড় করে তুলবে না।

'দি এভার' লাস্টিং গস্পেল'-এ খৃষ্ট গণিকাকে ক্ষমা করেন, কিন্তু সেই ক্ষমাও অর্কের প্রচণ্ড বিপ্লবের মত।

'মোজেস আদেশ দিলেন তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করা হোক।

যীশু কী বললেন ?

তিনি হাত রাখলেন মোজেসের আইনের উপর;

স্তম্ভিত সন্ত্রস্ত প্রাচীন নক্ষত্রলোক

মেরু থেকে মেরু অভিযানে ভারগ্রস্ত,

সরে যেতে লাগল।'

'অ্যামেরিকা'য় বৃটিশ সৈনিকেরা যখন মার্কিন মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতিরোধের মুখে অশক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের সামনে

'সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর মানুষের সারি, তাদের বসনের

আড়ালে শিশুরা আশ্রয় নেয় বজ্রের ভয়ে।

অর্ক বা খৃষ্ট শিশুদের আশ্রয় দেন, 'অ্যামেরিকা'র নবম প্লেটে নাগমূর্তি অর্ক তার পিঠে নগ্ন শিশুদের বহন করে নিয়ে যায়, এক নগ্ন বালিকা তার গলায় লাগাম পরিয়ে টানে, অথচ অর্ক যেন হেসে ওঠে। যে প্লেটে ইংলণ্ডের আত্মা অর্ককে তিরস্কার করে, 'মন্বন্তরে যুদ্ধে চিরন্তন সিংহের গর্জনের মত,'—উন্মত্ত বিপ্লবের 'ভক্ত' বলে তাকে ধিক্কার দেয়, ব্লেক সেই অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করতে লেখা ছত্রগুলিকে 'ফ্রেমিং' করেন, বাঁদিক বেয়ে একটি গাছ উঠে গেছে, তার ডাল হেলে পড়ে এক অসম্পূর্ণ তোরণ রচনা করেছে। ডালগুলির প্রান্তে ঝাঁক ঝাঁক ফোঁটা ফোঁটা ফুল। ডালে পাখি বসেছে, একটি পাখি উড়ছে ডালেরফাঁক দিয়ে। ছত্রগুলির নিচে দুটি নগ্নশিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। তাদের সঙ্গে একটি ঘুমন্ত ভেড়া; একটি শিশু শুয়ে আছে তারই পিঠে, অন্যজন

ঘাসের উপর। কাছেই একটি ফুল ফুটেছে। অর্কের বিপ্লব শান্তির পূর্বপট। অর্কের বিপ্লব শিশুদের মুক্ত করে মিথ্যা মোহ ও ভয় থেকে।

'লিটল্ বয় ফাউণ্ড'—এর দৈবমূর্তী অর্ক-খৃষ্টেরই প্রতিভূ বলে মনে হয়। আগের প্লেটের দেবদূতেরা বা নক্ষত্রখচিত আকাশ এই প্লেটের সম্ভাবনার আভাস দেয়। এক প্লেট থেকে অন্য প্লেটে উত্তরণ, এর নাটকীয়তা লক্ষনীয়।

ভার্জিল প্রসঙ্গে একটি ছোট লেখায় ব্লেক লেখেন: 'গ্রীক শিল্পের গঠন গাণিতিক; গথিকের গঠন জীবন্ত। গাণিতিক গঠন যুক্তিময় স্মৃতিতে চিরন্তন, জীবন্ত গঠন চিরন্তন অস্তিত্ব।' গ্রীক স্থাপত্যের নিরেট দেয়াল, নির্মম নিরলঙ্কার থাম, সব মিলিয়ে অটল যুক্তিবাদেরই পরাকাষ্ঠা। গ্রীস-রোমের যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যস্পৃহার পিছনে যে প্রবল আত্মবিশ্বাস বা শক্তিদম্ভ তারই প্রতীক হিসেবে ব্লেক দেখেছিলেন গ্রীক স্থাপত্যের কঠোর সংযমকে। তাই 'ডিভাইন কমেডি' চিত্রাবলীতে ২০১ সংখ্যক প্লেটে, 'জোব' পর্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম প্লেটে গ্রীক দেয়াল এবং পোস্ট ও লিনটেল স্থাপত্য পতনোত্তর পৃথিবীর অন্ধতা ও অনুভবহীন অস্তিত্বের প্রতীক। অন্যদিকে গথিক স্থপতি এমনভাবে জানলা বসান, আলোকে খেলে বেড়াতে দেন যে দেয়ালই হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, তার ইট-পাথরের কঠিন গাঁথুনি যেন মিলিয়ে যায়। গ্রীক স্থাপত্যের অভগ্ন ভাব গথিকে রেখার বিন্যাসে ভেঙে গতীয় হয়ে ওঠে। গথিকে মনোলিথের অনড়তা নেই রেখায় রেখায় বিচিত্র সংযোগে এক জটিল জ্যামিতি রচিত হয়। ব্লেকের ছবিতেও এই রেখারই প্রাধান্য, গথিকের রেখার বুনট তাঁর ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'লিট্ল্ বয় ফাউণ্ড'-এর নুয়ে পড়া গাছের খিলানের রৈখিক নমনীয়তায় গথিক ধর্মের তাৎপর্য স্পষ্ট। কল্পনা নম্র, নরম; কল্পনা আশ্রয় দেয়। গথিক খিলান দৈবকে কল্পনার সগোত্র করেছে, রেখার গভীরতায় জীবন্ত করেছে। ব্লেকেরই কথায়, 'শক্তিই জীবন, শক্তি দেহ সম্ভূত। প্রজ্ঞা শক্তির সীমা তথা বহির্পরিধি। শক্তি অনন্ত আনন্দ।' রেখার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা ঐ শক্তি তথা আনন্দেরই প্রতীক। 'সংস্ অফ্ এক্স্পীরিয়ন্স্'-এর নামপত্রে গ্রীক স্থাপত্যের কঠোরতা মৃত শরীরের সাযুজ্যে আরো ভয়ংকর প্রাণহীন মনে হয়।

রেনলডস্ ও রয়াল একাডেমির শিল্পরীতিকে প্রচণ্ড বিদ্বেষে বর্জন করে ব্লেক মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল ও আলব্রেখ্ট্ ড্যুরারকে গুরু মেনেছিলেন। ছবির আলোচনায় ব্লেক জোর দিয়েছেন 'স্থির নিশ্চিত আউট লাইনের' ওপর; রঙের ছোপ, শেডিং বা ছায়াসুষমা, রেখার অস্পষ্টতা ব্লেক কখনও বরদাস্ত করেননি। যে পদ্ধতিতে ব্লেক প্রধানত কাজ করেছেন, সেই এনগ্রেভিঙের মহত্তম পূর্বসূরী নিঃসন্দেহেই ড্যুরার। ড্যুরার ও মিকালাঞ্জেলো দুজনেই মানবশরীরের কণ্টরশন ও ডিষ্টর্শনে মানুষের জীবশরীরের শক্তিমত্তা প্রকাশ করেছেন (প্যানফস্কির ভাষায়, 'মানুষের গায়ের কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে তার রীতিবন্ধনের নিশ্চিত আশ্রয় থেকেও তাকে বিচ্যুত করেছেন'), উলঙ্গ শরীরের পেশীর আলোড়ন মানব অনুভূতির শক্তিকে জান্তব মাত্রায় প্রকাশ করে। 'লাওকোঅন'-এ ব্লেক লেখেন, 'উলঙ্গ রূপের উদ্‌ঘাটন ছাড়া শিল্পের অস্তিত্ব নেই'; লেখেন, 'শিল্প গোপন করে না'। ১৪৯৫ সালে ড্যুরারের একেবারে প্রথম দিকে আঁকা পোলাইউলো অবলম্বনে দুই উলঙ্গ যোদ্ধার হাতে দুই নারীর নিগ্রহের ছবিতে যার শুরু (প্যানফস্কি, প্লেট ৫৩) ১৫১৬য় প্রোসেরপিনি হরণের ছবিতে (প্যানফস্কি, প্লেট ২৪৩) তার সার্থক উত্তরণ। মেঘের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়া শরীর, নানাভাবে দুমড়োনো শরীর, ভারবাহী শরীর, পড়ন্ত শরীর, উড়ন্ত শরীর, ভাসমান শরীর, জবুথবু শরীর, সিধে দাঁড়ানো শরীর, উবু হয়ে বসা শরীর, বিচিত্র সংস্থানে মানব শরীরের বিন্যাস মিকেলাঞ্জেলোর 'শেষ বিচার' থেকে ব্লেকের 'জোব' বা 'ডিভাইন কমেডি' চিত্রাবলীর মধ্যে একইভাবে উপস্থিত। 'জোব' চিত্রাবলী থেকে বাছাই করা যে ছবিটি এখানে উদ্ধৃত তাতে সেটানের নির্যাতন বর্ষিত হচ্ছে জোবের পরিবারের উপর। ওপরে বাদুড়ের ডানা মেলে সেটান, বসবার ভঙ্গিতে যে গতিছন্দ, অগ্নিশিখার বিস্তার বা থামগুলি ভেঙে পড়ার প্রবল তাণ্ডবে তা ছড়িয়ে গেছে। ডানার খাঁজে খাঁজে আগুনকে চিরে, সেটানের মাথা ঘিরে উদ্‌ভাসিত আলোর ঔজ্জ্বল্যে আগুনের বিস্তৃতিকেই গভীর করে তোলা হয়েছে। এই গতিছন্দের পরিণতি বা পরিপূরক এই ছন্দেরই স্বাভাবিক এক্স্টেনশন, পতনের ছন্দ। এই দুই ছন্দ দৃশ্য প্রতীকে যুক্ত হয় ছবির ডান কোণে, যেখানে স্খলিত গাঁথুনীর সঙ্গে সঙ্গেই দুমড়ে সোজা নিচে পড়ছে একটি শরীর—

ভূমিমুখী ক্রুসিফিকশনের ভঙ্গিতে। এই শরীরের ভূমিস্পৃষ্ট মাথা থেকে ভূমি ধরে ঘড়ির কাঁটার পথ ধরলে একটি শায়িত মৃত শরীর, তার পা পড়েছে এক টিমব্রেলের উপর, হাতে এক লায়ার। সংগীতযন্ত্র শিল্পের প্রতীক। জোব-কন্যার মৃত্যুতে শিল্পের মৃত্যুর সঙ্কেত। ঘড়ির কাঁটার পথ উত্তরমুখী হয়ে আবেদন ও প্রার্থনায় শুরু হয়ে এক অনিশ্চিত প্রতিরোধের ভঙ্গিতে গিয়ে পৌঁছয়। অথচ লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সেটান, মধ্যের পুরুষ ও ডান কোণের পুরুষের শরীরভঙ্গি একই ভঙ্গি ভেঙে নির্মিত, তিনটির মধ্যে ক্রমান্বয়তা স্পষ্ট। সেটানের মাথা ডান দিকে হেলে, মধ্যের পুরুষের বাঁদিকে, নিচের পুরুষের সোজা নিচের দিকে। সেটানের ডান পা সামনের দিকে এগিয়ে মোড়া, মধ্যের পুরুষের পিছনে চিতিয়ে মোড়া, নিচের পুরুষের এগিয়ে মোড়া, কিন্তু উলটে গিয়ে। সেটানের সঙ্গে তার বধ্যদের যে সম্পর্ক তথা আত্মীয়তা এই শরীর সংস্থানের সাদৃশ্যে প্রতিষ্ঠিত তারই মধ্যে এই ছবির অর্থ নিহিত। এবার লক্ষ করুন, মার্জিনে নিচে, বাইবেলের উদ্ধৃতির ঠিক ওপরে দুটি কীট দুদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ব্লেকের কল্পনায় এই কীটেরা, মানুষের মনে ধর্ম যে মিথ্যা পাপবোধ বপন করে, তারই প্রতীক।

বহু কবিতায় বহু লেখায় ব্লেক বারবার একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন : 'যা কিছু প্রাণবন্ত তাই পবিত্র।' 'দ ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেল-'এ 'নরকের প্রবাদের' মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

'আইনের পাথর দিয়ে তৈরি হয় কারাগার, ধর্মের ইট দিয়ে গণিকালয়।
ময়ূরের গর্ব ঈশ্বরের গৌরব।
ছাগলের যৌনকামনা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।
সিংহের রোষ ঈশ্বরের জ্ঞান।
নারীর নগ্নতা ঈশ্বরের সৃষ্টি।'
'সব বন্ধন অভিশপ্ত হক ; সব মুক্তি ধন্য হোক।'
'মস্তিষ্ক অলৌকিক, হৃদয় বেদনা যৌনাঙ্গ সৌন্দর্য, হস্তপদ সমানুপাত।'

'ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেল'-এ ৪-৫ সংখ্যক প্লেটে ব্লেক লেখেন, 'মানুষ তার কামনাকে অনুসরণ করে চললেই ঈশ্বর তাকে অনন্ত যন্ত্রণা দেবেন।......

যারা তাদের কামনাকে সংযত করে, তাদের কামনা এতই দুর্বল যে তা

সংযম মেনে নেয় এবং তাই তারা কামনাকে সংযত করে। সংযামক প্রজ্ঞা কামনার আসন ছিনিয়ে নেয়, অনিচ্ছুককে শাসন করে।

সংযত হয়ে ক্রমে ক্রমে তা নির্জীব হয়ে পড়ে, শেষে কামনার ছায়ামাত্র অবশেষ থাকে।

প্যারাডাইস লষ্ট-এ এই ইতিহাসই লেখা আছে; শাসক তথা প্রজ্ঞার নাম মেসাইয়া।

আদি মুখ্য দেবদূত বা দেবসেনাপতির নাম ডেভিল বা সেটান। তার সন্তানদের নাম পাপ ও মৃত্যু।

কিন্তু বুক অফ জোব-এ মিলটনের মেসাইয়ার নাম সেটান।'

৪ নম্বর প্লেটে ডানদিকে ভয়ংকর অগ্নিশিখা থেকে বিপ্লবের প্রেতমূর্তি অর্ক বেরিয়ে আসছে, বাঁদিকের সংযামক প্রজ্ঞার হাত থেকে একটি নবজাত শিশুকে ছিনিয়ে নিতে। প্রজ্ঞার শাসনে এই শিশুটির জীবন যাতে শেষ না হয়ে যায়,তার শক্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাই অর্কের প্রয়াস। কিন্তু অর্কের পায়ে বেড়ি, প্রজ্ঞাও জাপটে ধরেছে নবজাতককে। ৫ নম্বর প্লেটের উপর এক নগ্ন তরুণের পতন, উপরে চেতানো পা, নিচে মাথা, সঙ্গে পড়ছে একটি ঘোড়া, একটি তরবারি, একটি বল, আরো নিচে লেলিহান শিখা। এ পতন অনবদমিত শক্তির পতন, ঘোড়ার বেগ, তরবারির ধার, বলের চলচ্ছক্তি, সবই শক্তির স্পষ্ট প্রতীক।

মানুষের এই শক্তিকে সংযত করার চেষ্টা করে ধর্ম। ধর্ম ভয় ধরায়, সেই ভয় কীট হয়ে মনে বাসা বাঁধে, সুস্থ স্বাভাবিক কামনাকে বিষিয়ে তোলে। এই কীটের গোপন দংশনেই জোবের সন্তানদের মন দুর্বল, তাই সেটানের আঘাতে তাদের অনিবার্য পতন। এই কীট তাদের মনে বপন করেছে জোবেরই আত্মসন্তুষ্ট ধর্মবিলাস তথা নীতিবিলাস। জোব পর্যায়ের আগের প্লেটগুলিতে জোবের সেই জীবনযাত্রায় ক্লীবতা স্পষ্ট।

'সংস অফ এক্‌স্‌পীরিয়ন্‌স্‌'-এর অন্তর্গত 'এ সিক রোজ' কবিতায় আবার সেই কীট। অদৃশ্য কীট গোলাপের 'টকটকে লাল আনন্দের উৎসে গিয়ে' পৌঁছেছে সেখানে তার 'অন্ধকার গোপন প্রেম' গোলাপের প্রাণ নিঙড়ে নিচ্ছে। গাছপাতায় কবিতাটিকে ঘিরে আছে, ফুলটি মাটিতে পড়ে আছে, তার মধ্যে ঢুকেছে একটি কৃমিকীট, বেরিয়ে আসছে এক নারীমূর্তি। পাপবোধ প্রেমের

The SICK ROSE
O Rose thou art sick.
The invisible worm.
That flies in the night
In the howling storm.
Has found out thy bed
Of crimson joy:
dark secret love
destroy.

The Fire of God is
And the Lord said unto Satan Behold All that he hath is in thy Power
Fallen from Heaven
3
Thy Sons & thy Daughters were eating & drinking Wine in their
eldest Brothers house & behold there came a great wind from the Wilderness
& smote upon the four Faces of the house & it fell upon the young Men & they are Dead
W Blake inven & sculp

আনন্দকে নষ্ট করে, প্রেমকে কদর্য অস্বাভাবিকতায় বিকৃত করে। গোলাপের রূপহীন জড়তা নিরবয়বতায় ধরা পড়ে, ছবিতে ডালের কাঁটা, ফ্যাকাশে সবুজ পাতা, পাতার খাঁজ কাটা ধার, এই সবেরই প্রাধান্য। ওপরের দিকে বাঁদিকে একটি হলুদ শুঁয়োপোকা একটি পাতায় কামড় বসিয়েছে। ডালগুলি যেখানে হেলতে শুরু করেছে, ডাল জড়িয়ে সেখানে দুই অবসন্ন ভেঙে পড়া মূর্তি, গোলাপী রঙে তারা অবসন্ন কীটদষ্ট গোলাপেরই স্বজন।

'সংস অফ ইনোসেন্স্' ও 'সংস অফ এক্স্পীরিয়ন্স্'-এর দুটি পর্যায়ের মধ্যে এক পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে অন্য পর্যায়ের কবিতার পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে, যেমন 'দ ল্যাম' কবিতার সঙ্গে 'দ টাইগারের'। 'দ সিক রোজ'-এর সঙ্গে 'ইনোসেন্স্' পর্যায়ের ও 'দ ব্লসম্' 'ইনফ্যাণ্ট জয়' কবিতার সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী দুটি কবিতার চিত্রণেই সুস্থ স্বাভাবিক দেহজ প্রেমের পরিপূর্ণতার স্বাক্ষর। বিশেষ করে 'ইনফ্যাণ্ট জয়'-এ গাঢ় গোলাপী ফুলের উন্মুক্ত গর্ভের বিপুল উচ্ছ্বাস ও পাশেই নুয়ে পড়া এক দীর্ঘ গোলাপী কুঁড়িতে উত্তরসঙ্গমের ইঙ্গিত যে সার্থকতা বহন করে, 'মধুর আনন্দ' কথা দুটি বারংবার উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বসিত পুনরুচ্চারণে তারই ভাষারূপ। 'দ সিক রোজ'-এ পাপবোধের বিশ্রী ছায়াপাতে এই মধুর আনন্দেরই কীটদষ্ট পরিণতি। 'নরকের প্রবাদের' আরেকটি প্রবাদ : কামনাকে যে চরিতার্থ করে না, সে ব্যাধি ছড়ায়।

'ম্যারেজ অফ হেভেন অ্যাণ্ড হেলে'এর ২৪ নম্বর প্লেটে ব্লেক তাঁর ছবি-কবিতা এন্‌গ্রেভিঙের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর প্রবল ব্যক্তিক ধর্মকল্পনা থেকেই :

> 'ছ হাজার বছর পেরিয়ে পৃথিবী আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, এই প্রাচীন বাক্য সত্য। আমি নরকে এ কথা শুনেছি।
> জ্বলন্ত তরবারিধারী সেই দেবদূতকে জীবন বৃক্ষের প্রহরা থেকে নিবৃত্ত হতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে। সে নিবৃত্ত হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হবে, অসীম হবে, পবিত্র হবে, যদিও আজ তাকে সসীম ও বিকৃত মনে হয়।
> ইন্দ্রিয়সুখের প্রসারেই তা সম্ভব হবে।
> কিন্তু মানুষের শরীর ও আত্মা ভিন্ন, এই ধারণা প্রথমেই নির্বাসিত

করতে হবে। নরকে যা প্রশংসিত ও আয়ুর্বেদীয়, সেই সব ক্ষয়কর পদার্থ দিয়ে নারকীয় উপায়ে আমার রচনা মুদ্রিত করে, আমি তা ঘটাব, বহির্স্তর বলে যা মনে হয়, তা গলিয়ে দিয়ে আমি অসীমকে উন্মোচিত করব।

উপলব্ধির দ্বারগুলি পরিষ্কার করে তুললেই সব বস্তু মানুষের কাছে সত্য রূপে প্রকাশিত হবে: অর্থাৎ অসীমতায়।

কারণ মানুষ নিজেকে এমনভাবে অবরুদ্ধ করেছে যে সে সব কিছুই দেখে তার গুহার সঙ্কীর্ণ ফাঁকগুলি দিয়ে।'

ওপরের প্লেটে এক মৃতবৎ শায়িত পুরুষকে ঘিরে আগুনের শিখা উঠেছে. তারই মধ্যে এক নারী দু হাত ছড়িয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সংস্কারের অন্ধতা থেকে তাকে মুক্ত করতে, তাকে দগ্ধ করে নতুন প্রাণ দিতে।

পরিশিষ্ট

১। আমার অনুরোধে বিশ্বভারতী কলাভবনের শ্রীসোমনাথ হোর কিছু পুরনো বর্ণনার ভিত্তিতে নিচের টীকাটি লিখে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন।

উইলিয়ম ব্লেকের ব্লক তৈরী করার পদ্ধতি:

একটি পাতলা কাগজের এক পিঠে গঁদের প্রলেপ লাগিয়ে নেয়া হত। শুকিয়ে গেলে পর অ্যাসিড প্রতিরোধী পদার্থ দিয়ে তুলি কিংবা কলমের সাহায্যে রচনার অংশবিশেষ তার উপরে লেখা হত। এই পদার্থ সম্ভবত অ্যাসফল্ট, রজন এবং বেনজিন্-এর মিশ্রণে প্রস্তুত হত। ব্লকের জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট তামার প্লেটে এই লেখাটিকে উল্টোভাবে চালান করা হত। প্রথমে প্লেটটিকে গরম করা হত; অতঃপর লেখা কাগজটিকে উল্টে নিয়ে প্লেটের উপর বসানো হত। তারপর প্রেসে চাপ দিয়ে লেখাটিকে হুবহু চালান করা হত। প্রয়োজনবোধে বার্নিশার (চামচের হাতলের মত দেখতে এক প্রকারের ঘষবার হাতিয়ার) দিয়ে কাগজের উপরে ঘষে নেয়া হত। প্লেট থেকে কাগজ উঠিয়ে নেবার জন্য অনেক সময় জল দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া হত। চালান-করা লেখায় ভুল-ত্রুটি কিংবা অসম্পূর্ণতা থাকলে তা তুলি দিয়ে পুনরায় লিখে নেয়া হত। পরে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে প্লেটের পেছনে

অ্যাসিড প্রতিরোধী প্রলেপ লাগিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে ডোবান হত। প্লেটের উপরিভাগের উন্মুক্ত অংশগুলি এ্যাসিডে ক্ষয়ে গিয়ে লিখিত অংশ-সমূহ পরিষ্কার বেরিয়ে আসত। যথেষ্ট ক্ষয়ে যাওয়ার পর প্লেটটিকে অ্যাসিড থেকে তুলে জলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে, তার্পিন তেল, স্পিরিট প্রভৃতির সাহায্যে অ্যাসফল্টের প্রলেপ সাফ করা হত এবং বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী কালি লাগিয়ে প্রেসে ছাপ নেয়া হত। কয়েকটি প্রাথমিক ছাপ নেয়ার পর উন্নত ধরণের হাতে তৈরী কাগজে (wove paper) শেষ ধাপের ছাপ নেয়া হত, রঙীন ছবির জন্য একটি সমতল প্লেটে বিভিন্ন রঙ লাগিয়ে কাজ করা প্লেটটি তার ওপর চেপে নিয়ে রঙীন করা হত এবং এই প্লেট থেকে কাগজে ছাপ নেয়া হত বলে বিশ্বাস।

২। ব্লেকের কবিতা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে আমি ব্যবহার করেছি :

David V. Erdman, 'The Illuminated Blake' (London : Oxford University Press 1975)

Geoffrey Keynes, ed., 'Songs of Innocence and Experience' (London : Oxford University Press 1970)

Geoffrey Keynes, ed., 'The Marriage of Heaven and Hell' (London : Oxford University Press 1975)

Andrew Wright, 'Blake's Job' (Oxford : Clarendon Press 1972)

Albert S. Roc, 'Blake's Illustrations to The Divine Comedy' (Princeton, N. J. : Princeton University Press 1965)

ব্লেকের চিঠিপত্রসহ যাবতীয় রচনার প্রামাণ্য সংকলন :

Geoffrey Keynes, 'Blake : Complete Writings' (London : Oxford University Press 1969)

ব্লেকের অন্যতম প্রিয় শিল্পী আলব্রেখ্‌ট্‌ ড্যুরারের ছবির জন্য ব্যবহার করেছি :

Erwin Panofisky, 'The Life and Art of Albrecht Durer' (Princeton, N. J. : Princeton University Press 1955)

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

চলচ্চিত্র

একটি চলচ্চিত্র, নির্মিত হয়ে যাবার মুহূর্তে, বাস্তবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। যা থাকে তা ছোট-বড় নানান টুকরো অভিজ্ঞতা দিয়ে গ্রথিত একটি ধারণা, একটি সিনথেসিস। এই বিভিন্ন খণ্ডের অভিজ্ঞতা, যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় ধারণাকে, মূলত উঠে আসে চলচ্চিত্রকারের চোখ ও মনের সামনে প্রবাহিত বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় নানান দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যা ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা এই ধারণা, চলচ্চিত্র-পরিচালকের নিজস্ব, এবং যা যথার্থ ভারী হ'লেই চেপে বসতে পারে দর্শকের ধারণার ওপর, অন্তত তার পাশে জায়গা করে নিতে পারে। নাহলে আলো জ্বলে উঠলে যা থাকে তা অশিক্ষিত ভুল ব্যাখ্যা, একটি ভুল তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর চলচ্চিত্র। তাই একজন সৎ চলচ্চিত্রকারের বিশেষ দায়িত্ববদ্ধতা থেকেই যায় সমকালীন অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমগুলি সম্পর্কে; সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে; কেননা এগুলি দিয়েই একমাত্র বিশ্লেষণ করা সম্ভব অভিজ্ঞতাকে। নাবিকদের বিদ্রোহ যে ঠিক হুবহু ও ভাবেই ঘটেছিল বাস্তবে তা নয়, কিন্তু আইজেনষ্টাইনের 'দ্য ব্যাটেলশিপ্ পটেমকিন্'-এ নাবিকদের বিদ্রোহের জন্ম ও পরিণতি দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে যখন ঘুমন্ত, জাগ্রত ও আক্রমণোদ্যত পাথরের সিংহের তিনটি ভঙ্গিকে জুড়ে দেওয়া হয়, আমরা এক অনন্যসাধারণ ঘটনার অসাধারণ ব্যাখ্যার সম্মুখীন হই যা আজো, বহুবার দেখার পরেও, আমাদের চেতনাকে সমূলে নাড়া দেয়। অন্যদিকে, সত্যজিৎ রায় কৃত 'অশনি সংকেত'-এ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বৃত্তে যে ধারণা গড়ে ওঠে পরিচালকের, তা দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন দৃষ্টি খুলে দিতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়। দুটি চলচ্চিত্রের বিষয়ই বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ-গুলি থেকে সংগ্রহ করা। প্রসঙ্গতঃ একথা বলা বাহুল্য যে একটি সৎ-চলচ্চিত্র যে ধারণার জন্ম দেয়, তাকে সঠিক ভাবে অনুধাবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় যদি দর্শক-কুলের মন ও মনন যথার্থ শিক্ষিত না থাকে। এদেশে তৈরী ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবিটি তার একটি দুঃখজনক উদাহরণ। বুদ্ধিজীবিকুল, এমন

কি ভারতবর্ষে অন্যান্য শিল্পকর্মে নিমগ্ন অজস্র মানুষ আজো চলচ্চিত্রকে ক্ষণিকের নির্বোধ আনন্দদায়কারী এক বস্তু বা তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। আপামর দর্শককুল তো অশেষ দূরের মানুষ। তাই চতুর্থ শ্রেণীর রঙ্গিন হিন্দী ছবির দর্শকদের মধ্যে আজো ঘাপটি মেরে বসে থাকেন কবি, চিত্রকর, বাদক প্রভৃতিরা। কলকাতায় কখনো কখনো বহুখ্যাত চলচ্চিত্র দেখানো হয়, সেখানে বয়স্ক বা তরুণ কবি, গল্পকার, চিত্রকারদের দেখা পাওয়া প্রায় উল্লেখযোগ্য এক ঘটনার মতো। কয়েকদিন আগে, এক নতুন চলচ্চিত্র-কারের ছবির সংগীত গ্রহণের সময় উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিলো। সংগীত পরিচালক একজন বিশেষ-খ্যাত নবীন সরোদবাদক যিনি ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি মাত্র চলচ্চিত্র দেখেছেন বলে আমাকে জানান। তাঁর কথা আমাকে চমৎকৃত করে, আমি ভাবতে শুরু করি কিসের আগ্রহে চলচ্চিত্রে সংগীত পরি-চালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন ; ভাবতে শুরু করি চলচ্চিত্রবোধহীন এই নবীন সরোদবাদক নতুন পরিচালক বন্ধুর ছবিটির প্রতি কিভাবে সুবিচার করবেন। এদেরই ঠিক বিপরীত দিকে আছেন অজস্র অক্ষম ফিল্ম-ডিরেক্টরের দল, যাদের সংখ্যাই বেশী, অন্যান্য শিল্প-মাধ্যমগুলি সম্পর্কে যারা যথার্থভাবে অসীম মূর্খ। দুঃখের বিষয়, এদের অজ্ঞানতা আজো যথেষ্ট ক্ষমা পায় এবং ফিল্ম-ব্যবসার কুচক্রে এরাই আসল ভাঁড়, হয়তো এদের এখনো অনেক খেলা-দেখানো বাকি আছে।

বস্তুত একজন চলচ্চিত্রকারের অজানা অভিজ্ঞতার অজস্র মণি যেমন লুকিয়ে আছে কবিতায়, গদ্যে, চিত্রকর্মে এবং সংগীতে; তেমনই, এই মাধ্যমগুলি যাঁরা ব্যবহার করেন তাদেরও অনেক কিছু গ্রহণ করার আছে চলচ্চিত্র থেকে। এই পারস্পরিক সাহায্যের প্রবণতায় শিল্প-মাধ্যমগুলিকে আরো জোরালো ভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্র হয়তো অনেকখানি আবিষ্কৃত হতে পারে। একটির পর একটি শব্দ এবং লাইন এসে যেমন একটি কবিতা গড়ে তোলে, তেমনই এক একটি দৃশ্যকে একের পর এক সংস্থাপন করে তৈরী করা হয় চলচ্চিত্র। এই দুইয়েরই মূলে আছে সঠিক সম্পাদন। এই সঠিক সম্পাদনই দুটি মাধ্যমের প্রাথ-মিক শর্ত—গতিময়তা থেকে শুরু করে মাধ্যমদুটিকে স্মরণীয় শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ করে দিতে বিশেষ গুরুত্বের ভূমিকা পালন করে। এক তৃতীয় নয়ন, যা জন্ম নেয় খণ্ড খণ্ড অশেষ ঘটনাপ্রবাহ থেকে নির্বাসিত এক বোধের থেকে, কবি এবং চল-

চিত্রকারের চেতন এবং অবচেতনে কাজ করে যায় সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ও তাদের সঠিক সম্পাদন-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে সাহায্য করে। একজন অক্ষম কবির কবিতায় দেখা যায় একের পর এক নির্বোধ লাইন, একটি তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্রে দেখা যায় একের পর এক দৃশ্যের অহেতুক ভীড়—এই দুই-ই পাঠক এবং দর্শককে বিরক্তিকর এক সাহচর্য দেয়। জীবনানন্দ দাশের 'ক্যাম্পে' কবিতার প্রায় শেষে 'এই ব্যথা—এই প্রেম সবদিকে রয়ে গেছে—কোথাও ফড়িঙে—কীটে—মানুষের বুকের ভিতরে'—'ব্যথা' এবং 'প্রেম'-এর অন্তহীন ব্যাপকতাকে মাত্র একটি লাইনে সম্পূর্ণ আলাদা, চেতনহীন ক্ষুদ্র এবং চেতনময় বিরাট দুই জীব পদার্থের পাশাপাশি উল্লেখমাত্র করে অসীম দক্ষতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন কবি। বিশ দশকের শেষের দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার চিরস্মরণযোগ্য পরিচালক আলেকজাণ্ডার দভজেনস্কো-র 'আরসেনেল' ছবিটি তোলা হয়। এর প্রথমে দৃশ্য (sequence) একটি মাত্র চিত্রে (shot) শেষ হয়ে যায়। ছবিটি শুরু হয় স্তব্ধ শান্ত বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী একটি মাঠের দৃশ্য দিয়ে। সহসা, এক ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণের শব্দে সমস্ত শান্ত মাঠ আদিগন্ত কেঁপে ওঠে এবং এরপরই দর্শক সরাসরি যুদ্ধের সামনে পৌঁছে যান। হাল আমলে ক্রুফো-র 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ'-এ শেষ দৃশ্যের একটি মাত্র স্থির-সটে পরিচালক অসাধারণ দক্ষতায় ধরে রাখেন একই সঙ্গে এক প্রশ্ন এবং সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে। কবিতা এবং চলচ্চিত্রের এই উল্লেখগুলিতে দেখা যায় কত অল্প শব্দ ও দৃশ্যের সাহায্যে অনেকদূর পর্যন্ত বলা সম্ভব। আপাত সংযোগহীন এবং প্রায় বিপরীতধর্মী দুটি দৃশ্য পর পর জুড়ে ঘটনার ব্যাপকতা ও গভীরতাকে ধরে রাখার অজস্র উদাহরণ চলচ্চিত্রে আছে। চ্যাপলিনের 'সিটি লাইট'-এ একদল দণ্ডিত মানুষকে দেখিয়ে পরবর্তী দৃশ্যে দেখানো হয় বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়া এক ভেড়ার পালকে। মৃণাল সেনের 'মটির মানুষ'-এর শান্ত সুন্দর গ্রামের দৃশ্যের পরেই ভয়াবহ শব্দ করে উড়ে যায় যোদ্ধা উড়োজাহাজ এবং দর্শক অনুভব করতে পারেন আসন্ন দুঃসময়। 'সুবর্ণরেখা'য় ঋত্বিক ঘটক এক মা-এর মৃত্যুর একটিমাত্র দৃশ্য দেখিয়ে চলে যান দৃশ্যান্তরে যেখানে দেখা যায় এক কিশোর গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় বসে দুলছে, আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝি এই কিশোর সেই মৃত মা-এর সন্তান। কবিতায়ও এই ধরনের ব্যবহার বিশেষভাবে সম্ভব।

'তারপর ঘাসের জঙ্গলে প'ড়ে আছে তোমার ব্যক্তিগত
বসন্তদিনের চটি। এবং
আকাশ আজ দেবতার ছেলেমেয়েদের নীল শার্টপাজামার
মতো বাস্তবিক।
একা ময়ূর ঘুরছে খালি দোতলায়। ঐ ঘরে সজল থাকতো।
সজলের বৌ আর মেয়েটি থাকতো। ওরা ধানকল পার হয়ে চলে গেছে।
এবার বসন্ত আসছে সম্ভাবনাহীন পাহাড়ে জঙ্গলে এবার বসন্ত আসছে
প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।
তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদাম পাহাড়ে।'
আমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছে বাদাম পাহাড়ে।'
(এই সংগ্রহের শেষ কবিতা/পুরী সিরিজ। উৎপল কুমার বসু।)

গদ্যে লেখা এবং সাজানো এই কবিতাটির প্রত্যেকটি লাইনের চিত্রকল্পের সঙ্গে পরবর্তী লাইনের চিত্রকল্প প্রায় আপাত-সংযোগহীন, পরম্পরাহীন বলে মনে হয় এবং সচরাচর কবিতাপাঠের যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তা বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু উপর্যুপরি পাঠের পর দেখা যায় লাইনগুলি অসাধারণ-ভাবে গ্রাহ্য হয়ে উঠছে ক্রমশই এবং চোখের সামনে নেমে আসছে এমন এক দৃশ্য যা সমস্ত অনুভূতির মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। একজন কবি হিসেবে, চলচ্চিত্রের সম্পাদনার মধ্যে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার লুকিয়ে থাকে তা আমার কবিতার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। কবিতার রূপক, চিত্রকল্প সরাসরি উঠে আসতে চায় চলচ্চিত্রে। আইজেনস্টাইন-কৃত 'অক্টোবর', সেই বিখ্যাত সিনেমায় জার-শাসিত সময় বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় জার-সৈন্যের পোষাক এবং মেডেল।

১৯২৪ সালে ফার্নাণ্ড লেগ্যা, সে সময়ের ইউরোপের এক বিখ্যাত কিউবিষ্ট চিত্রকর, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে একটি ছবি তোলেন, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ওই চলচ্চিত্রের নাম 'ব্যালে মেকানিক', এ্যানিমেশনের ধাঁচে তৈরী এই চিত্রটি আজো চিরকালের শ্রেষ্ঠ একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র। এই সময়েই, বিশ শতকের ইয়োরোপে সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনে যে কয়েক-

জন ক্ষমতাবান চিত্রকর যুক্ত ছিলেন, তাদেরও অনেককেই ভূতগ্রস্তের মত আকর্ষণ করে চলচ্চিত্র মাধ্যমটি। ম্যান রয় থেকে সালভ্যাদর দালি প্রত্যেকেই সেই সময় যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এই মাধ্যমটির সঙ্গে। এই শিল্পীগোষ্ঠীর তৈরী 'ল্যা এজ দ্যা অর' চলচ্ছবিটি এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ইয়োরোপীয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ক্যাথলি-সিজম-এর প্রতি এমন আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল এই চলচ্চিত্রটি যে প্রথম প্রদর্শনের পরেই প্যারিসে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। সেটা ১৯৩০ সাল। এই সময় থেকেই সুররিয়ালিষ্ট মুভমেণ্ট শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলিকে প্রভা-বিত করতে শুরু করে। বুনুয়েলের মত এক অসাধারণ ক্ষমতাবান চিত্র-পরিচালকের আবির্ভাব হয়, যাঁর প্রথমদিককার চলচ্চিত্রগুলিতে সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকরগোষ্ঠীর কাছে তাঁর ঋণ অশেষ। জ্যারমেন ডুলক, জেন এপিষ্টেন প্রভৃতি তদানীন্তন চিত্রপরিচালক নির্মিত 'এতোলি দ্য'ম্যার', 'দ্য সি সেল এণ্ড দ্য ক্লার্গি ম্যান,' 'দ্য ফল্ অফ্ দ্য হাউস অফ্ উসার' ছবিগুলিতে প্রেম, খুন, ব্যর্থতা, বিষাদ, পাপবোধ ইত্যাদিকে বিষয় হিসেবে নিলেও বিষয়াতিরিক্তভাবে যা আছে তা সুররিয়ালিজম-এর অচ্ছেদ্য প্রভাব। শোনা যায়, প্রাচীন গ্রীস দেশের চিত্রকরদের বাস্তবকে হুবহু অনুকরণ করার দক্ষতা এমন বিচ্যুতিহীন উৎকর্ষে পৌঁছেছিল যে তাদের আঁকা ফুল, ফলের দিকে ছুটে আসতো পাখি। কিন্তু আজকের কোন শিল্পী-চিত্রকরের কাছে শুধুমাত্র এই দক্ষতা কাম্য নয়। গত কয়েক দশকে পৃথিবীব্যাপী চিত্রকলার যুগান্তকারী পরিবর্তনে দেখা যায় বিমূর্ত্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে গতির প্রতি ঝোঁক। চলচ্চিত্রের সমতল পর্দার মতই চিত্রকলার ফ্রেম (ব্যতিক্রমও আছে), এরা ত্রিমাত্রিক হয়ে ওঠে শিল্পী এবং চিত্রপরিচালকের ঘটনা থেকে সঞ্জাত অভিজ্ঞতার আরকে তৈরী ধারণার শিল্পময় প্রক্ষেপনে। না হলে দুই-ই স্থির থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। আজকের চিত্রকর তার সৃষ্টিকে গতিময় করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র থেকে গ্রহণ করতে পারেন বেগ, ও একজন চলচ্চিত্রকার একটি দৃশ্যের কৌণিক অবস্থান, দৃশ্যের অগ্রভূমি ও পশ্চাৎভূমি, ফ্রেম, আলো ও ছায়ার সংস্থাপন, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রং-এর ব্যবহার এবং পরিশেষে দৃশ্যাতিরিক্ত বোধের জন্য ঋণী থেকে যেতে পারেন চিত্রকলার কাছে।

শতভিষা

প্রাচীন পৃথিবীর নবীনতম এই শিল্প-মাধ্যমটির অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণ আছে। কিন্তু এই মাধ্যমের ব্যবহারকারীর দায়িত্বও অনেক। কেননা এ এমন এক মাধ্যম যা বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে একসঙ্গে পৌঁছয় এবং প্ররোচিত করে। হয়তো একদিন আসবে, কবি তার লেখার পেনের ছুঁচলো নিব আঙুলে সম্পূর্ণ বিঁধিয়ে দেবেন শেষ পর্যন্ত, চিত্রকর আমূল ঢুকিয়ে দেবেন তুলির কাঠঅংশের পশ্চাৎভাগ তাঁর চোখে, স্বর ভুলে পাগলের মত ছোটাছুটি করবেন সংগীতকার, এবং এই প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক কিছু আরো অনেক, অনেক প্রাচীন হয়ে আসবে; কে জানে, হয়তো আমরা তখনো শুনতে পাবো এক কির-কির কির-কির শব্দ, দেখবো একটি মুভি ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মানুষ, যার অনেক কিছু তখনো বাকি তুলে রাখার, দেখবো এই দৃশ্য, যদি না কোন রাজনীতির ভূত সেই মানুষের হাত থেকে কেড়ে নেয় ক্যামেরা। কেননা চলচ্চিত্র একই সঙ্গে বেশী দেখে, বেশী দেখায় অনেককে।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা

সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় 'ভালো লাগা' ব্যাপারটা এতই অতর্কিত এবং আপেক্ষিক যে তাকে নিয়ে কোন ব্যাপক বিচার চলে না। সৌন্দর্যের কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদৌ আছেন কিনা জানিনা। থাকলেও তাঁর মূর্তি যে অস্পষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। কখনো প্রকৃতিতে কখনো শিল্পশৈলীতে, কখনো ব্যক্তিগত রুচি কখনো নৈর্ব্যক্তিক ব্রতচর্যার মধ্যে তিনি যে অচির আভাস ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দিয়ে থাকেন, অনেক সময় মনে হয় তাকে অভিজ্ঞতার মুহূর্তটি থেকে বার করে এনে তত্ত্বকথার ভাঁজে পুরতে গেলে তাঁকে আর চেনবার উপায় থাকে না, অবয়বটাই যায় বদলে। অথচ এই ক্ষণিকতাই বোধহয় রসিকজনকে লুব্ধ করে সেই অধরা মুহূর্তগুলিকে একটি তত্ত্বের নিগড়ে ধ'রে রাখতে। অজস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এই কেন্দ্রগত বাসনাটুকুই বোধহয় শেষ পর্যন্ত সৌন্দর্যব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্য ভিত্তি, একথা মনে হ'তে পারে।

সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষ ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অনেক সময়েই মনে হ'তে পারে প্রতিটি সাহিত্যকৃতি তার সম্যক্ বিশিষ্টতা নিয়ে একক একটি বিশ্ব — কোনো সাধারণ তত্ত্ব থেকে সুরু করলেই বোধহয় তার মর্মে পৌছোনো যাবে না। এমন কি আমাদের রসতত্ত্বও তার সমস্ত অভিনবত্ব নিয়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট সহায় নয়। নবরসের শ্রেণীবিন্যাস খুবই চমকপ্রদ বোধ-শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। একটি শ্লোক বা চরণে তার উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট এবং সার্থক হতে পারে, কিন্তু কোন্ রসের ফর্মুলায় একটি গোটা কবিতা বা উপন্যাসকে আমরা ধরতে পারি? বীভৎস ও শৃঙ্গাররসের মিশ্রণে অমুক আধুনিক উপন্যাস রচিত বললেই কি উপন্যাসটিকে আমাদের বোঝা হ'য়ে গেল?

অথচ তাই ব'লে কোন সাহিত্যকর্মের বিশিষ্টতা এমনও নয় যে কারো সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক নেই। তা যদি হ'ত তবে কবিতা উপন্যাস ট্র্যাজেডি কমেডি প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগেরও কোনো মানে থাকত না। 'বিষবৃক্ষের'

সঙ্গে 'চোখের বালি' বা 'গৃহদাহের' কথা সহজেই আমাদের মনে আসত না। তাদের বিশিষ্টতার মধ্যেও কতকগুলি সাধারণ অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ লক্ষণ নিশ্চয় ঠাহর করা যায়। কিন্তু এমন কোনো তাত্ত্বিক কষ্টিপাথর আছে কি যা দিয়ে লক্ষণগুলি আমরা অনায়াসে মেপেজুকে নিতে পারি?

সৌন্দর্যতত্ত্বের অন্যতম মৌল সমস্যা এই বিশেষ এবং নির্বিশেষের দ্বন্দ্বেই। অন্যান্য শিল্পের চেয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা দুরূহতর, কারণ রংরেখাসুরের তুলনায় শব্দের তাৎপর্য আরো বেশি পরিবর্তমান। সাহিত্যরসিক কোনো নতুন কবিতা শুনে যখন ব'লে উঠবেন 'হ্যাঁ, এ কবিতা হয়েছে', আর পদার্থ-বিজ্ঞানী যখন নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শুনে বলবেন 'এ তো কবিতা হয়েছে' —তখন এ দুই ক্ষেত্রে 'কবিতা' শব্দের সংজ্ঞা নিশ্চয় এক থাকবে না। অথচ সাহিত্যের বেলায় তার অর্থ থেকে শব্দকে আলাদা ক'রে দেখবারও কোনো উপায় নেই, হাসিমুখ থেকে হাসিটুকুকে আলাদা ক'রে নেবার যেমন উপায় নেই —লুইস্ ক্যারলের রূপকথার সেই বিড়ালের মতো। সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে অর্থ এবং অবয়ব অভিন্ন ও অঙ্গাঙ্গী। কোনো সুরের বেলায় তার শব্দ থেকে অর্থকে আলাদা ক'রে বিচার করতে পারি না, কোনো ছবির বেলায় তার রং থেকে তার অর্থকে আলাদা ক'রে নিতে পারি না। তাদের অর্থকে বুঝতে হ'লে ঐ রং বা শব্দই আমাদের সম্বল। বলা যেতে পারে ঐ রং বা শব্দই তাদের অর্থ। ঐ রঙের বা শব্দের বিশিষ্টতাতেই তাদের অর্থের বিশিষ্টতা। এবং এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক এতই সূক্ষ্ম যে সামান্যতম পরিবর্তনেও তাদের অর্থের ব্যত্যয় ঘ'টে যায়: 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' আর 'সুন্দর ভুবনে আমি চাহিনা মরিতে' ঠিক এক তাৎপর্য বহন করে না।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রতিটি শিল্পকর্মের একধরণের অস্তিত্ববাদী ভূমিকা আছে, যেখানে তাদের অস্তিত্বের মৌলতা তাদের সারার্থ বা 'এসেন্স্'-এর' তুলনায় অগ্রগণ্য। নৃতত্ত্বে যেমন মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বকে ধরা যায় না, তেমনি সৌন্দর্যতত্ত্বে হয়তো আমরা অনেক সাধারণ কথা বলতে পারি, কিন্তু কোনো একটি সুন্দর বস্তুকে তার মর্মগত বৈশিষ্ট্যসমেত কতখানি ধরতে পারি? কৈশোরের প্রত্যয়বশে রবীন্দ্রনাথ অতি সুঠাম ক'রে আমাদের ব'লেছিলেন: "সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের

অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতা ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া" ('আলোচনা' : 'কবির কাজ')। কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত কতটুকু বলা হ'ল? কোনো বিশেষ একটি শ্লোক আমাদের অসাড়তা দূর ক'রে হৃদয়ের স্বাধীনতা অবারিত ক'রে দেয়, সেটা বুঝতে পারলাম কই? 'পাখী সব করে রব' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের চেয়ে 'ও পারেতে কালো রং' আমাদের চিত্তকে কেন এবং কতখানি মুক্ত ক'রে দেয় তার রহস্যটুকু গোপনেই র'য়ে গেল নাকি? এই ধরনেই কথা ভেবেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে সুধীন্দ্রনাথের প্রতি লিখেছিলেন : 'যে কারণেই হোক রূপসীর reality আমার কাছে অনির্বচনীয় —আমি যে একটি ব্যক্তি সেই ব্যক্তির reality ওজনেই তার যাচাই। অর্থাৎ আমি নিজে যেমন বিনা বিশ্লেষণে বিনা তর্কে নিজের বাস্তবতা একান্ত উপলব্ধি করচি তাকেও তেমনিই করি' (২৭ আষাঢ় ১৩৩৫)।

এই বিশিষ্টতাবোধই আমাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার পথে অনেক সময় অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ যা বিশিষ্ট তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। প্রতিটি শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা যদি এতই অনন্য হয় তাহলে তার সম্বন্ধে কোনো সাধারণী-করণ কী ক'রে সম্ভব? এমন কি তার কোনো বর্ণনাই বোধহয় অসম্ভব, যেহেতু বর্ণনা করতে হ'লে শ্রেণীবাচক ও সাধারণগুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা ছাড়া আমাদের গতি নেই।

অথচ সাহিত্যালোচকদের কাজই হচ্ছে বিশ্লেষণ এবং বিচার, শুধু একান্তে উপলব্ধি ক'রে তাঁরা ক্ষান্ত হন না। তাঁরা শ্রেণীবিন্যাস করেন, তুলনা করেন, মূল্যনির্ণয় করেন। যদি প্রতিটি শিল্পানুভূতি অবর্ণনীয়ভাবে বিশিষ্টই হয়, তাহলে এই তুল্যমূল্যতা আদৌ সম্ভব হয় কী প্রকারে? কী ক'রে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে শরৎচন্দ্রের চরিত্রায়ণ আরো বাস্তবানুগ, বা এমনি কিছু? এ-সম্পর্কে কোনো যুক্তিসহ প্রস্তাব সঙ্গত হয় কী ভাবে?

এখন পালটা প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রতিটি শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট কিনা এ তর্কের নিরসনই বা হবে কী ক'রে? 'জিরাফ ডাকে কিনা'—এ প্রশ্নের জবাব পেতে হ'লে আমাদের অস্ত্র আছে—পর্যবেক্ষণ। বনে জঙ্গলে চিড়িয়াখানায় ঘুরে, লক্ষ্য ক'রে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর একসময় পেতে পারি। কিন্তু সাহিত্যকৃতিমাত্রেই অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনন্য কিনা, এ প্রশ্ন তো তার

অস্তিত্বের মৌল প্রশ্ন, এর উত্তর তো কোনো পর্যবেক্ষণে ধরা দেবে না। ক্রোচে-র মতো দার্শনিক হয়তো বলবেন এর উত্তর পাব আমরা ইনটুইশন (স্বজ্ঞা)-এর মাধ্যমে, পর্যবেক্ষণে নয়। কিন্তু আমরাও তো উলটে বলতে পারি, এই বিশিষ্টতাও একধরণের শ্রেণীবিন্যাস। সাহিত্যশিল্পের অভিজ্ঞতাকে যাঁরা অতি অনায়াসে 'বিশিষ্টতার' বা 'অনন্যতার' শ্রেণীতে পুরে ফেলতে দ্বিরুক্তি করেন না, আনন্দবর্ধন কি তাঁদেরই উপহাস ক'রে বলেননি, যে যাঁরা কাব্যের আত্মাকে অনির্বচনীয় বলেন তাঁরাও মানবেন যে অন্ততঃ 'অনির্বচনীয়' শব্দের দ্বারা তা বর্ণনীয়। কালিদাসও কি তাঁর নাটকে লেখেননি, 'রম্যাণি বীক্ষ্য, মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' আমাদের স্মৃতিপথে অন্য কিছু তুল্য অভিজ্ঞতা এসে হানা দেয়?

আসলে সচেতন অভিজ্ঞতামাত্রেই বোধহয় অল্পবিস্তর তুলনাত্মক। দার্শনিকরা যাকে 'ক্যাটিগরি' বলেন, যে কোনো অভিজ্ঞতার মধ্যেই তার কোনো না কোনো আদল নিহিত থাকে। অনন্যতার আদল অনুযায়ী দৃষ্টিপাত করলে সব কিছুই অনন্য মনে হ'তে পারে। কিন্তু অন্য আদলের সাহায্যে দেখাও সম্ভব। কোন আদল ব্যবহার করতে পারব তা নির্ভর করছে সাহিত্য-ব্যাপারে আমাদের কী ধরনের অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছে তার ওপরে। সেই অনুযায়ী তত্ত্ব এবং ভাষা আমাদের প্রয়োগ পদ্ধতির অঙ্গ হবে। তাই স্বদেশীবিদেশী সৌন্দর্যবিচারের এত রকম তত্ত্ব—ধ্বনি, রস, আবেগ, আনন্দ, সামাজিক উপযোগিতা প্রভৃতি মাপকাঠি সৃষ্টির প্রয়াস। যন্ত্র, জীব, ব্যক্তি সবকিছুকেই সাহিত্যসৃষ্টি বিচারের মডেল করা যায়। যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি শিল্পকর্মকে একটি নিগূঢ় আন্তরসম্পর্ক বিশিষ্ট অখণ্ডমণ্ডলরূপে দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা তাকে অনন্য তো বলবেনই। কেউ যদি তর্ক তোলেন যে বিচারে, আলোচনায় বা অনুবাদে তার সমস্ত জটিল সম্পর্ক সমেত না হোক কিছু পরিমাণে তার প্রকৃতিটিকে ধরা যায়, ও'রা মানবেন না, কারণ তাঁদের মতে এই নিগূঢ় জটিলতাই তার আন্তরধর্ম, একটু উপাদান হারালেই সে বিকলাঙ্গ হ'য়ে যায়। সাহিত্য সমালোচকেরা অবশ্য হাতে কলমে এ ধারণাকে অমান্য ক'রেই চলেছেন—তাঁরা একটি সৃষ্টির সঙ্গে অপরটির তুলনা ক'রে, বিচারে তাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ ঘোষণা ক'রে অনবরতই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছেন, যে তাঁরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নন।

যশোধরা বাগচী

সমাজচেতনা কি সাহিত্যবোধের পরিপন্থী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে সমাজ এবং সাহিত্যচেতনা নিয়ে যেসব নানাবিধ ছোট-ছোট আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, প্রধানতঃ তারই তাগিদে এই লেখা লিখতে বসা। যেসব প্রশ্ন ক্লাসের মধ্যে সাহিত্য অধ্যাপনার কৃত্রিমতাকে দূর করতে ক্রমাগতই সাহায্য করে সেই সব প্রশ্নের উপস্থাপনা করবার একটি নগন্য চেষ্টা এই লেখাতে প্রকাশ পাবে। সাহিত্য-গঠন অনেকাংশে এক যৌথ প্রচেষ্টা। সাহিত্যশিল্পী যেমন বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের এক নিগূঢ় এবং বিশেষ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ক'রে থাকেন পাঠক ও সমালোচকও কিন্তু তেমনি করেই বাইরের সঙ্গে ভেতরের সম্পর্ক-স্থাপনে ইচ্ছু। ক্লাসে সাহিত্য-অধ্যাপনার মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার কাছে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাই এই আলোচনার স্বনির্ধারিত গণ্ডী টানছি এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীসাহিত্য অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে। এই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যে এই ছোট চৌহদ্দির বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে কিন্তু আমি খোলাখুলিভাবে নিজের গণ্ডী নিজে টেনে নিচ্ছি। আমার মনে হয় এইভাবে গণ্ডী টানলে প্রধানতঃ দু' ধরনের সুবিধা হবে। অনর্থক তাত্ত্বিকতার কচ্‌কচির মধ্যে না ঢুকে নিজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত চেনা ভাষা ব্যবহার করার স্বাচ্ছন্দ্য এবং বড়ো-সত্যকে ছোট পরিধির মধ্যে প্রতিফলিত করে তাকে অনেক সহজবোধ্য করে তোলা। তবে এই প্রবন্ধটি এক দীর্ঘতর আলোচনার সূত্রপাত মাত্র—সে দীর্ঘতর আলেচনার মধ্যে চেনা কিন্তু উত্তর প্রত্যুত্তর ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

পাদটীকার অনুপস্থিতিতে হয়ত বহু পাঠক ক্ষুণ্ন হবেন কিন্তু স্বল্পপরিসর এই ব্যাখ্যার গতি অব্যাহত রাখবার জন্য পাদটীকা বর্জন করলাম। এর কোনও অংশ সম্পর্কে কোনও পাঠকের ঔৎসুক্য থাকলে অবশ্যই আমি সাধ্যমতো ঋণ স্বীকারের চেষ্টা করবো।

শতভিষা

এক

সমাজচেতনা কি সাহিত্যবোধের পরিপন্থী ? অর্থাৎ সমাজভিত্তিক এ কথা বললে পরে কি সাহিত্যের সাহিত্যিকতাকে খর্ব করা হয় ? এরকম শঙ্কাবোধ বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়। ব্যক্তির এককসত্তা সমাজের সামগ্রিক সত্তার মধ্যে পড়লে নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে পারে এরকম একটা ভয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধ'রে কাজ ক'রে আসছে, এই শঙ্কাবোধ কি শুধু তারই এক ছোট সংস্করণ ? শুধু যদি তাই হতো তাহলে হয়তো এই কাগুজে বাঘকে সহজেই খতম ক'রে দেওয়া যেতো। সাহিত্যশিল্প এবং সমাজবোধকে মেলানোর কাজে প্রধান বাধা হলো এই যে শিল্পে বাস্তবের চেহারা পালটানোর চেষ্টাই বেশি প্রকট। বাস্তব থেকে ছুটি নেওয়ার জায়গা হচ্ছে·নাটক-নভেল-কবিতা-গান। সাহিত্যশিল্পের এই বিশেষ ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিলে তার আর থাকে কি ?

সাহিত্য কিন্তু নিজেই তার এই ক্ষুদ্র ভূমিকা মেনে নিতে রাজি নয়। চেনা সমাজগুলির গোড়াতে যেসব মহাকাব্য দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা সত্যের বাহক এবং সভ্যতার ধারকরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই প্লেটো কবিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তার দার্শনিক ভিত্তি ছাড়াও এক সামাজিক প্রসঙ্গ রয়েছে। প্লেটো বলছেন যে কবিরা এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ক'রে থাকেন যে তাঁরা বোধশক্তির পরিচালক। প্লেটো 'অনুকরণ তত্ত্ব' দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে কাব্য হচ্ছে বস্তুজগতের ছায়া। উপরন্তু কাব্যপদ্ধতি যুক্তির পরিপন্থী। কোনো বাইরের শক্তি ভর না করলে কবি কাব্যসৃষ্টি করতে পারেন না। অতএব প্লেটো-বর্ণিত আদর্শ সমাজে কবির স্থান নেই। প্লেটোর সমাজে কবির সামাজিক প্রতিপত্তি কতোখনি ছিলো সেটা প্লেটোর এই দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে খানিকটা আঁচ করতে পারা যায়। প্লেটোশিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল্‌কে তাই কবিকে আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কবিতা বাস্তবকেই অনুকরণ করে কিন্তু সেই অনুকরণ প্রণালী এমন বিশেষ-ধরনের যে তার মধ্য দিয়ে বাস্তবের রূপান্তর ঘটে। ইতিহাস শুধু দেখতে পারে বাস্তবে কী ঘটেছে বা ঘটেছিলো। কাব্য দেখাতে পারে বাস্তবে কী ঘটতে পারতো অথবা কী ঘটা উচিত ছিলো। অ্যারিস্টট্‌লের মতে এই সম্ভাব্যতা এবং ঔচিত্যবোধ

কাব্য-ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি দার্শনিক তাৎপর্য এনে দেয়। অর্থাৎ মানুষের বোধশক্তি চালনা করবার যে ক্ষমতা প্লেটো কবিদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দার্শনিকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন অ্যারিস্টট্‌ল্‌ আবার সেই ক্ষমতা কবির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে দার্শনিকের সমগোত্রীয় ক'রে তুললেন।

এই বহু আলোচিত পুরোনো প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই কথাটি বারেবারে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রশ্নটি প্রথম থেকেই বাস্তবতার মূল্যায়নের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে বাঁধা। মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জীবনকে ব্যবহার করে সাহিত্য এবং তাকে বাস্তবের রূপায়ণই বলা যাক বা রূপান্তরই বলা যাক সাহিত্যের রূপবিচারের প্রশ্নের মধ্যে নিহিত থাকে বাস্তবের সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্পর্কের প্রশ্নটি।

আসল সমস্যাটি বরঞ্চ একটু অন্যরকমের। মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজে বাস ক'রেই সে বাস্তবতার অভিজ্ঞতাকে খুঁজে পায়। সুতরাং সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে সমাজবদ্ধ বাস্তবতা থেকে আলাদা ক'রে ফেলবার প্রশ্নটি উঠছে কোথা থেকে?

সাহিত্যে প্রতিফলিত বাস্তবতা এবং সাদা চোখে দেখা বাস্তবতা যে এক নয় সেটা সকলেই জানেন। যে কোনও সমালোচনা-তত্ত্বের আলোচনা শুরু হয় এই ব্যবধানের অভিজ্ঞতা থেকে, সে তত্ত্ব সমাজভিত্তিকই হোক বা সমাজবিচ্ছিন্নই হোক। এই পৃথকীকরণের জন্য নানাধরনের নন্দনতত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। সংস্কৃত রসশাস্ত্র থেকে ইউরোপের প্লেটোধর্মী এবং পরে রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শের বিভিন্ন রূপের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের চেনাজানা জগতে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সৌন্দর্যচর্চার একীকরণ খুবই প্রচলিত। সাহিত্য তথা শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ বিলাসী সৌখীনতার আমেজ আনে। এই কারণে অনেক সময়ে বিদেশী সাহিত্যচর্চার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় একধরণের পরভৃত 'নববাবুবিলাস'। আমাদের শিক্ষিত সমাজে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতিচর্চা অনেকাংশে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের অবসরবিনোদনের উপায়মাত্র। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডে সাহিত্যচর্চার নামে এক সামাজিক আভিজাত্যের গোড়াপত্তন হয়েছিলো যার একটি উপসর্গ ছিলো 'rambles among masterpieces' ইউরোপীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্টতম নিদর্শনের

মধ্যে বিচরণ করেই সে সংস্কৃতিবোধ পুষ্টিলাভ করতো। এই-জাতীয় আত্মকেন্দ্রিক ইন্দ্রিয়সর্বস্বতাকে মদৎ জোগায় সামাজিক আভিজাত্যের আত্মপ্রসাদ।

এই সৌখীন শিল্পচর্চার রসাস্বাদনের মুহূর্তগুলি স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন থেকে অবসৃত। এই শূন্যগর্ভ সৌন্দর্যবোধ সাহিত্যশিল্পকে সমাজ থেকে দূরে থামিয়ে রাখবার চেষ্টায় তেমন সুবিধা করতে পারে না, কারণ তার জন্য দরকার সামগ্রিক দর্শনের। যে দর্শনের সাহায্যে সাহিত্যকে সামাজিক চেতনার উর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা হচ্ছে অতিপ্রাকৃতবাদ। সে চিন্তাধারা সাহিত্যচেতনা খুঁজতে ছোটে জীবনোত্তর কোনো অসীম রাজ্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এর সারগর্ভ বর্ণনা দিয়েছেন দুটো পঙ্‌ক্তিতে

কূলহারা কোন রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে

দুই পঙ্‌ক্তির প্রথম দুটি কথার অন্তমিলের মধ্যে ধরা পড়েছে বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের দুটি মৌলিক বিশ্বাস। মানুষের জীবনের পরিধি এবং গভীরতা উভয়ই সীমিত, এই সীমাকে অতিক্রম করাই হলো নন্দনতত্ত্বের প্রধান কাজ, সীমাহীন বিস্তৃতি এবং গভীরতা তাই সাহিত্যের রূপায়ণের প্রধানতম অঙ্গ। সমাজচেতনা যেহেতু ব্যক্তিসত্তাকে তার ইতিহাসজনিত সীমার মধ্যে সঞ্চিত করে সেই কারণে সাহিত্যবোধের সঙ্গে তার বিরোধ। এই ধারণা অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পে 'জীবন নদী কূল ছাপিয়ে' 'অসীম দেশে' ছড়িয়ে যায়। সমাজভিত্তিক কাব্যসমালোচনায় অসীমের যাদুছোঁয়া নেই, অতএব তাঁরা সাহিত্যকে দেখেন নির্জীব এক সামাজিক দলিল হিসেবে। অতিপ্রাকৃতের মৃতসঞ্জীবনীসুধাতেই একমাত্র সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং সে প্রাণের স্পন্দন অবশ্যই সমাজ থেকে না এসে আসে সমাজোত্তর এক ঐশী জগৎ থেকে।

উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যপুষ্ট আমাদের সাহিত্যশিক্ষণ বহুলাংশে এই অতিপ্রাকৃতবাদের কুক্ষিগত। অতীন্দ্রিয় জগতে দেশ কাল সমাজভেদ থাকে না সুতরাং সাহিত্যকে তার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের ছকে ফেলাটা গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয়। সাহিত্যের সাহিত্যিকতা বলে যে জিনিস ফলাও করে সাহিত্যশিক্ষার মূলমন্ত্ররূপে জপ করা হয় একটু তলিয়ে দেখলেই তার অন্তর্লীন ভাবাদর্শটি চোখে পড়ে। এই ভাবাদর্শ কিন্তু প্রায়শঃই বিমূর্ত এবং পরম ব্রহ্মের

মতো অবাঙ্‌মনসোগোচর। অতএব সাহিত্যশিক্ষণকে যদি মন্ত্র দেওয়ার চাইতে বেশি ইন্দ্রিয়গোচর কোনও মূর্তি দিতে হয় তাহলে এই ভাবাদর্শের স্বরূপ জানা দরকার। সেই জানার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো তাকে তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে বিচার করা। সামাজিক বিবর্তনের যে বিশেষ চাপে রক্তমাংসে গড়া কবি অতিমানবিক রূপ নেবার চেষ্টা করেন কাব্যরূপের মধ্যে সে রূপের নিজস্ব স্বাক্ষর থাকে। কাব্যরূপ এবং সমাজের রূপ একই সঙ্গে নির্ধারণ করার কাজ চলতে থাকলে তবেই সে কাব্য এবং সে সমাজের চেহারা বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে থাকে। তার মানে এই নয় যে, যে কাব্যে সামাজিক ঘটনার অবিকল প্রতিলিপি পাওয়া যায় সেই কাব্য উৎকৃষ্ট। সামাজিক বিবর্তন ও কাব্যরূপের মধ্যে সম্পর্ক আরও অনেক সূক্ষ্ম এবং চমৎকার।

ইংরেজি সাহিত্যের যে দুই যুগ নিয়ে এখানে সাহিত্যশিক্ষণের কাজ প্রধানতঃ এগোয় তা হলো শেক্সপীরিয় যুগ ও উনিশ শতকের রোম্যান্টিক যুগ। এর মধ্যে দ্বিতীয় যুগটির কাব্যাদর্শের সমাজ-বিমুখতা প্রচ্ছন্ন অতএব এই যুগের সাহিত্যে সামাজিক মাপকাঠি ব্যবহার করার নিজস্ব ধরনের সমস্যা আছে। বিশেষ করে এই কারণে উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত ধ্যানধারণার কিছু কিছু অংশ বিশ্লেষণ করে আমি আমার উপরি-উক্ত আলোচনাকে চিহ্নিত করবো। সেই বিশ্লেষণ আমাকে করতে হবে গঙ্গাফড়িঙের কায়দায়, কেননা সমগ্র আলোচনার জন্য যে পরিসর বা অবসর প্রয়োজন তার কোনোটিই এখানে নেই। তবে ছিটোনো হলেও এই বিশ্লেষণের পেছনে একটি পূর্ণতর চিন্তাধারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

আমার উদাহরণগুলি দেওয়ার আগে আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমী সাহিত্যে পুষ্ট আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবিদের চিন্তার একটি প্রধান আশ্রয়স্তম্ভ হলো সাহিত্যের স্বনির্ভরতা। পশ্চিম ইউরোপের রোম্যান্টিক কাব্যচিন্তা একদিকে সাহিত্য বা শিল্পকলা এবং অন্যদিকে সমাজের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে তার ফলে নৈঃসঙ্গ শিল্পীজীবনের প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্‌কার ওয়াইল্ড যখন বলেছিলেন জীবন শিল্পকলার অনুগামী (life imitates art) তখন তিনি রোম্যান্টিক উত্তর-যুগে শিল্পকলা যে অসীম ক্ষমতা হাতে পেয়েছে সমাজের ধারণাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত

করতে সেই ক্ষমতারই ইঙ্গিত করেছিলেন। শিল্পজগৎ যে শুধু সামাজিক জগৎ থেকে আহরণ করে তা নয়, বাস্তবজীবনের যে বিশেষরূপ সমাজজীবনে প্রতিফলিত হতে থাকে সেটি তৈরি হয় শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্য বা শিল্পকলা সেই কারণে সমাজতাত্ত্বিকের আওতার মধ্যে পড়ে।

পশ্চিমী সাহিত্যে ও তার প্রভাবে শিল্পীর নৈঃসঙ্গবোধ আমাদের আধুনিক সাহিত্য ও সমাজচিন্তায় অনুপ্রবিষ্ট। শিল্পী নিঃসঙ্গ অতএব সমালোচনা-সাহিত্যে গোষ্ঠীগত সমাজের স্বীকৃতি অসম্ভব। আধুনিক সমালোচক তাই শিল্পের এককতার উপাসক। বহুর মধ্যে একীকরণ শিল্পসাহিত্যের এক সংজ্ঞা, এইজন্য শিল্পবোধ আধুনিক মননজগতে আত্মোপলব্ধির চরম নির্দেশকরূপে স্বীকৃত। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পোপলব্ধির অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক এবং পাঠকের নিজস্বতার এক সমীকরণ ঘটে। এই সমীকরণটুকুই সাহিত্য-পাঠের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য মনে করে অনুরূপভাবেই সাহিত্যের মূল্যায়ন হয়। সাহিত্য কথাটির শব্দগত অর্থ দুই ব্যক্তিসত্তার মিথুনে পর্যবসিত হয়।

সাহিত্যের এই নিবিড় সাযুজ্যকে মেনে নিয়েও কবিতাকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ রূপ দেবার এক অদ্ভুত চেষ্টা দেখা গেছে সাম্প্রতিককালের নয়া সমালোচনা-রীতিতে (New Criticism)। সবার উপরে কবিতা সত্য তাহার উপরে নাই, অতএব এই সত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতাকে তার সমাজ তো বটেই তার স্রষ্টার পরিচয়গ্রন্থী থেকে পর্যন্ত কেটে বাদ দিয়ে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসেবে দেখানোর সাধনা করা হচ্ছে। এই জাতীয় কাব্যাদর্শ না থাকলে কবিতার পরিশুদ্ধরূপ দেখানো যায় না বলে অনেকেই মনে করেন।

সমাজবর্জিত পরিশুদ্ধ কবিতার দুই বাহন, অতীন্দ্রিয়তাবাদ এবং শৈলীসর্বস্বতা উভয়েই ব্যক্তিসত্তার একাকিত্বের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক সংস্কৃতির যে চরম ব্যক্তিনির্ভরতার ফলে আমাদের মতো সমাজেও এই স্বয়ম্ভু সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তার পরিচয় খুঁজতে ইংল্যাণ্ডের উনিশ শতকের ছোটো সাহিত্যজগতে ছোটা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার ফল আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি—ইংল্যাণ্ডের সংস্কৃতির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ইতিহাসে স্বীকৃত। তার ওপরে বহু পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে ইংল্যাণ্ডের সমাজ ও সাহিত্যজীবনের ইতিহাসের অনেকখানিই

আজ আমাদের অধিগত। অতএব ইংল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ছকে ফেলে উনিশ শতকের রোম্যাণ্টিক সাহিত্যসর্বস্বতার স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

দুই

ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যজীবনে যে সময়ে ব্যক্তিচেতনার সবচেয়ে প্রকট রূপ দেখা দিলো, ঠিক সেই সময়ে তার সামাজিক জীবনে চলছে পুরোনো সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্মকাণ্ড। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোল্‌রীজের রোম্যাণ্টিক কাব্যের সামাজিক পটভূমি হলো ফরাসী বিপ্লবের আঘাত, রিফর্ম বিলের আলোড়ন ও চার্টিষ্ট আন্দোলন। রিফর্ম বিলের দাবী ছিলো সমাজের ধনবণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের রাজনৈতিক স্বীকৃতি। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে যে নতুন মালিকশ্রেণী তৈরী হলো তাদেরই দাবী ছিলো যে সমাজের শাসনব্যবস্থায় তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। ইংল্যাণ্ডের ক্রমবিবর্তনশীল পার্লামেণ্টে এতদিন ধরে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিন্যাস প্রতিফলিত হতো সেখানে আঘাত করলো ধনতন্ত্রজনিত নতুন শ্রেণীবিন্যাস। এরই সঙ্গে চলছিলো মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগের প্রেরণা। টম পেইন ও গুড্‌ইনের লেখায় ছিলো যুক্তিবাদী মানুষের মুক্তির জয়গান।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এর সঙ্গে রোম্যাণ্টিক সাহিত্যচিন্তার কতোটুকুই বা যোগ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে নৈসর্গীয় নন্দনলোকের দরজা খুলে দিয়ে কর্মক্লান্ত মানুষের বিশ্রামের জায়গা করে দিয়েছেন, যে নিসর্গের পটভূমিকায় কোল্‌রীজ তাঁর নিসর্গাতীত জগতের বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাসকে সহজলভ্য করে তুলেছেন, যে নিসর্গে শেলীর আকাশচারী মন বিহঙ্গের মতো মুক্তি খুঁজছে বা কীট্‌সের সৌন্দর্য্যপিপাসু মন যার দরজায় বারে-বারে মাথা খুঁড়েছে সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে সমাজচেতনার কোনও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কেবল পাঠকের নিসর্গোন্মুখ তন্ময়তা।

কিন্তু আধুনিক যুগের সাহিত্যসর্বস্ব মনই তো সর্বপ্রথম এই নিসর্গোন্মুখতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবে। ইংরেজী কবিতাসাহিত্যে এই বিশেষ-ধরনের নিসর্গ-প্রবণতার মেয়াদ অত্যন্ত অল্প কয়েক বছরের। ওয়ার্ডসওয়ার্থের আগের যুগে তো

নিসর্গের রূপায়ণ ছিলো নিছক সাহিত্যিক ছকের খাতিরে। আবার ভিক্টোরীয় যুগ থেকে শুরু হয়ে গেছে নিসর্গবোধের মধ্যে মানুষের আত্মদংশন যন্ত্রণা। অতএব কবিতা মানেই ফুল, গাছ, আকাশ, চাঁদ, ছয়ঋতুর নৃত্য এই-জাতীয় রোম্যান্টিক নিসর্গময় কাব্যচেতনা বিশ শতকের বোদ্ধা পাঠকের অবশ্যগ্রাহ্য নয়।

অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রোম্যান্টিক সাহিত্যচিন্তার ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে সে সাহিত্য পড়া বা সমালোচনা করা যাবে না, এরকম মত টেঁকানো যায় না। রোম্যান্টিক কবিতার মাধ্যমে সে সাহিত্যচিন্তার যে অবয়ব আমরা পাই তার রূপ-নির্ধারণে যে সব শক্তি কাজ করে তা খুঁটিয়ে দেখা অবশ্যই সাহিত্য-সমালোচকের কাজ। প্রধানতঃ যে ধরনের সমালোচনা আমরা ক্লাসরুমে ব্যবহারের যোগ্য মনে করে থাকি, তাতে নিসর্গ-সম্পর্কিত দার্শনিক মতামতের ইতিহাস দিয়েই রোম্যান্টিক সাহিত্যের নিসর্গচিন্তাকে ব্যাখ্যা করা হয়। এর একটি ভালো উদাহরণ হলো অধ্যাপক ব্যাসিল উইলির Eighteenth Century Backgrourd (অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকা)। বইটিতে আঠারো শতকের দর্শনে নিসর্গ-বিষয়ক ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিসর্গচিন্তাকে বোঝানো হয়েছে। এই জাতীয় 'History of Ideas' চিন্তার ইতিহাসকে কবিতা বা অন্যান্য সাহিত্যের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ইতিহাস মনে করা হয়।

কিন্তু এর মানে হচ্ছে যে কবিতাকে ভাবের (Ideas) সমগোত্রীয় করে না দেখলে কবিতার জাত থাকে না। মুশকিলের কথা এই যে উপনিষদ-বর্নিত পূর্ণতার মতো কবিতার ভাব তো নিজে থেকেই উদ্ভূত হতে পারে না। যদিও প্লেটো এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত তাঁর উত্তরসূরিরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন কবিতাকে ভাবের নিগড়ে বেঁধে ফেলতে, কিন্তু এটা বোধহয় যে কোনো মতাবলম্বী সাহিত্য-প্রেমিকই স্বীকার করবেন যে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন করে আজ পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্য বাঁচতে পারেনি। ভাবের ইতিহাসের পেছনে থাকে সমাজবিবর্তনের ইতিহাস— তাই প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদে আশ্রয় নিলেও কোলরীজ বা কার্লাইলের প্লেটোবাদী দর্শনকে বুঝবার জন্য উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের ভদ্রসমাজের দিকেই তাকাতে হবে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরীজের রোম্যান্টিক বিপ্লবকে শুধুমাত্র দর্শন বা ভাব-চিন্তার বিবর্তন হিসেবে উপস্থাপন করলে কবিতার তার রূপটিকে এক বিমূর্ত

ভাবজগতের চাবিকাঠির মতো ব্যবহার করা হয়। অপর দিকে 'নব্য সমালোচনা রীতি'র মূর্তিসর্বস্বতা আমাদের আট্‌কে ফেলে প্রতিটি কবিতার নিজস্ব ছন্দ, শব্দবিন্যাস ও চিত্রকল্পের খাঁচার মধ্যে। অথচ এই কবিতাশৈলীর নিপুণতা এবং ইংল্যাণ্ডের কাব্যবিবর্তনের ইতিহাসে এই কাব্যরীতির অবদান বিচারে যে পথটি সযত্নে পরিহার করা হয় সেই পথটিই কিন্তু সব চাইতে প্রশস্ত। এই তিন দশকের রোম্যান্টিক কবিরা অভিজ্ঞতার চোখে দেখা পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক জগতকে যে ভাবাশ্রয়ী অপরিবর্তনীয় রূপ দেবার চেষ্টা করছেন তাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে তাকানো দরকার উনিশ শতকের গোড়ার দিককার মধ্যবিত্ত সমাজের দিকে যাদের মধ্য থেকে তৈরী হচ্ছে এই কবিতার পাঠক সমাজ। আগেই বলেছি ফরাসী বিপ্লবের জোয়ার ঠেকানো এবং শিল্পবিপ্লবজনিত আমূল পরিবর্তনে সমাজের ধনবণ্টনব্যবস্থাকে ঢেলে-সাজানোর যে ব্যাপক প্রয়াসের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্তশ্রেণীর এক নতুন উত্থান ঘটছিলো। রোম্যান্টিক কবিতা সেই বিরাট কর্মযজ্ঞেরই অঙ্গ। যেভাবে রোম্যান্টিক কবিতাকে সচরাচর উপস্থাপন করা হয়ে থাকে তাতে এই কাব্যাদর্শকে তদানীন্তন সমাজাদর্শ থেকে পৃথক করে দেখা হয়ে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলভোগী যদি শিল্পের মালিকরা না হয়ে শ্রমিকরা হয়ে পড়তেন (চার্টিস্ট বিদ্রোহের সময় যে ভয় ইংল্যাণ্ডের বিত্তবান সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিলো) তাহলে এই কাব্যাদর্শকে হয়তো সত্যিই সমাজের মধ্যে জীইয়ে রাখা শক্ত হতো। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে যে পাঠক-সমাজ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন তাঁদের আনন্দদানের জন্য প্রয়োজন ছিলো যান্ত্রিকতামুক্ত নৈসর্গিক জগৎ যেখানে ইউরোপের গ্রীক এবং মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনেকখানি ধরে রাখা যায়, শিল্পময় যুগের নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে যেখানে ব্যক্তির এককসত্তা কিছুক্ষণের জন্য লাভ করতে পারে ধ্যানময় জগতের অপার শান্তি। উনিশ শতকে দ্বিমুখী সমাজাদর্শের যে রূপায়ণ (বা রূপান্তর বলতেও কোনো বাধা নেই) ইংল্যাণ্ডের রোম্যান্টিক কবিতায় ঘটেছে তাকে দেখাতে পারলে কিন্তু রোম্যান্টিক কবিতার রূপ আমাদের কাছে স্বচ্ছতর হয়ে যায়।

সমাজচেতনাভিত্তিক সমালোচনার এই ধারাকে আরও উদাহরণ দিয়ে তুলে ধরা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিখছেন ম্যাথ্যু আর্নল্ড, সাহিত্য-

সংস্কৃতির বিশুদ্ধতম কর্ণধার, যাঁর কাছে পশ্চিমী উদারনৈতিক সাহিত্যচর্চা বিশেষভাবে ঋণী। ১৮৬৯ সালে Culture and Anarchy প্রবন্ধাবলীতে তিনি সংস্কৃতির জয়ধ্বজা তুলে ধরলেন সমাজে নৈরাজ্যের সংশোধক হিসেবে। তাঁর কাব্যাদর্শের বর্ণনা থেকে ফুটে ওঠে এর উভয়মুখিতার চেহারা। আর্নল্ড একদিকে কবিতাকে বলেছেন জীবনের পরিমাপক (Criticism of life), অন্যদিকে সে পরিমাপ হবে কবিতার সত্য ও সৌন্দর্যের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (under conditions fixed by laws of poetic truth and poetic beauty)। তাঁর লেখাতে জীবনাদর্শের সমালোচনা আছে প্রচুর। Dover Beach, Thyrsis, Scholar Gypsy ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলিতে ছড়ানো আছে উনিশ শতকের বিপর্যস্ত জীবনের লম্বা ফিরিস্তি। অথচ কবিতার সত্য ও সৌন্দর্য বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন সেটা কিন্তু কোনো সময়ে পরিষ্কার করে বলছেন না। এবং এই অব্যক্ত অংশটুকু বাদ দিলে আর্নল্ড তাঁর সংস্কৃতির পটভূমিকা খুব পরিষ্কার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করছেন। শিল্পবিপ্লব-সঞ্জাত গণতন্ত্রের বাহক জনকল্যাণ এবং প্রগতিবাদের যে ধুয়ো সমাজে তখন উঠেছিলো তার সহজলভ্যতার বিরুদ্ধে আর্নল্ড উচ্চারণ করলেন 'সংস্কৃতি'র সুদূর-প্রসারী মন্ত্র। সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে প্রচলিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যে সংস্কৃতির ধ্বজা আর্নল্ড ওড়ালেন সে সংস্কৃতিতত্ত্বকে ঠিকমতো বুঝতে তাই একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রেণীবদ্ধ সমাজ চেতনার প্রয়োজন। এইটি বাদ দিয়ে যেসব সাহিত্য সমালোচক আর্নল্ডের'সংস্কৃতি'মন্ত্র জপ করেন তাঁরা চেলাগিরি করেন মাত্র, সমালোচনা করেন না। অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রায়শই লেখক এবং পাঠক একে অন্যের শিকার হয়ে পড়েন।

যে সত্যকে সাহিত্যিক সত্য বলে প্রায়ই অভিহিত করা হয় তার অবয়ব তৈরী হয় তদানীন্তন সমাজের কাঠামো থেকে, যদিও সাহিত্যের কাঠামো আর সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ থাকলেও দুটো এক জিনিস নয়। সামাজিক তথ্যের সঙ্গে ইতিহাসের বিবর্তনলালিত এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যস্থতা না থাকলে সমাজকে সাহিত্যে উপস্থাপিত করা যায় না। মেহিয়ু-এর London Labour and the London Poor-এর পাশে ডিকেন্সের উপন্যাস-গুলিকে রাখলে তফাতটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ডিকেন্স তাঁর তথ্য-

গুলিকে খেয়ালখুশিমতো বাড়িয়ে কমিয়ে দিয়ে উনিশ শতকের মাঝখানের তিনটি দশকে ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাঝখানে যেভাবে পাঠককে নিয়ে যেতে পারেন মেহিয়্যু তা পারেন না। হাম্‌ফ্রে হাউস তাঁর 'Dickens World' বইটিতে ডিকেন্সের উপন্যাসে ব্যবহৃত সামাজিক তথ্যগুলিকে নিপুণভাবে সাজিয়ে এইটেই প্রমাণ করেছেন যে ডিকেন্স তাঁর মধ্যবিত্ত চিন্তা-ধারার সীমা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সত্যকে যে-রকম রং চড়িয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে সে সমাজের আসল চেহারা তো ঢাকা পড়েই নি উপরন্তু মিকবার, ইউরায়া হীপ, জো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজটি অবিশ্বাস্যরকমের বাস্তব হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের হিতবাদি (Utilitarian) ইংল্যাণ্ডে সামাজিক তথ্যের কোনো অভাব নেই, কিন্তু সেই তথ্য ডিকেন্স্-সাহিত্যের রসাস্বাদনে সাহায্যই করে, তার অপ্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করে না।

কথা উঠতে পারে যে ডিকেন্সের লেখা প্রধানতঃ সমাজভিত্তিক, তাঁকে দিয়ে সাহিত্যের সমাজভিত্তিকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলে তো সমস্যাটির সরলীকরণ করা হয়। তাই সমাজ-সাহিত্য বৈপরীত্যের অপর প্রান্তে নেওয়া যাক ওয়াল্টার পেটারকে। উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডে কলাকৈবল্যবাদের প্রধানতম হোতা, ইনিই জর্জোনের ছবি আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন 'সব শিল্পই সঙ্গীতে পর্যবসিত' (all art aspires to the condition of music)। সমাজবিচ্যুত কাব্যাদর্শের এর চাইতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুব বেশি নেই এবং বলা যেতে পারে এই কাব্যাদর্শের বিচারে উনিশ শতকের সামাজিক মানদণ্ডের ব্যবহার চলে না। সমাজচেতনা বলতে যদি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ বোঝায় তাহলে অবশ্যই পেটারের সমালো-চনারীতিকে বারে বারে আঘাত করা হয়েছে পশ্চিমী মধ্যবিত্ত সামাজিক মূল্য-বোধের খাতিরে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে ইংল্যাণ্ডের উদারনৈতিক সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে একঘরে করবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ছিলো। বিশ শতকের গোড়ায় আমেরিকাতে আর্ভিং ব্যাবিট্,পল এলমার মোর প্রমুখ মানবতাবাদী সমালোচকেরা এবং ইংল্যাণ্ডে লীভিস দম্পতী সাহিত্যবোধে সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষীয়মানতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তার অন্যতম আসামী পেটার এবং তার 'শূন্য-গর্ভ নন্দনতত্ত্ব' (aesthetic vacuum)।

এই অভিযোগের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে সমাজাদর্শ মনে হতে পারে আসলে তা ভাবাদর্শেরই নামান্তর মাত্র। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের সমাজের চেহারার দিকে একটু নজর দিলেই বোঝা যাবে যে পেটারের লেখাতে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ সাহিত্যবিচার থেকে মোটেই অপসৃত হয়ে যায়নি, উপরন্তু তদানীন্তন সমাজ ও সাহিত্য ধারণাগুলির এক নতুন ধরনের সংমিশ্রন ঘটেছে পেটার-বর্ণিত শিল্পের মগ্নতায়। ষাটের দশকের শেষদিক থেকেইংল্যাণ্ডের পাঠকগোষ্ঠির চেহারা অনেক বেশী সুচিহ্নিত। Westminster বা Fortnightly Review, Academy বা Saturday Review এমন কি সংরক্ষণবাদী Quarterly Review-এরলেখারমধ্যে একেঅন্যের মধ্যে সাহিত্য ও সমাজচিন্তায় যে সব পার্থক্য লক্ষিত হচ্ছে সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর মাপকাঠিতে বিচার করলে তাদের মধ্যে পার্থক্যখুবই কম। এঁরা সকলেইনেমেপড়েছেন মধ্যবিত্ত শাসক-শ্রেণীর অবসর ও মননশীলতাকে সম্পদশালী করার কাজে। এদের মধ্যে ঝগড়া তাই নেহাতই আপোষে ঝগড়া ; উদাহরণস্বরূপ উনিশ শতকের বহু-আলোচিত বিতর্কগুলির একটিকে নেওয়াযেতেপারে। উদারনৈতিকসাম্রাজ্যবাদী স্যর জেইমস্ ফিট্স্ জেইমস ষ্টিভেন ম্যাথ্যু আর্নল্ডের লেখায় ইংল্যাণ্ডের তথাকথিত প্রগতিবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি কটাক্ষ মোটেই প্রীতির চোখে দেখেননি, Saturday Review পত্রিকায় ইনি ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সমাজচিন্তার কড়া সমালোচনা করেন এবং আনর্ল্ডও তাঁর নিজস্ব মজলিশি চালে তার জবাব দেন। কিন্তু এরা কি সত্যিই দুই ধরনের সমাজাদর্শে বিশ্বাসী? স্যর স্টিভেন ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ উনিশ শতকের ভারতবর্ষে তার অন্যতম বাহক হলো ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব এবং ম্যাথ্যু আর্নল্ডের 'সংস্কৃতি'-তত্ত্ব এই সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বকেই সুপ্রতিষ্ঠিতকরেছে। অর্থাৎ ছোটখাটো বৈষম্য থাকা সত্ত্বেওসমাজভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এঁদের সাদৃশ্য অত্যন্ত গভীর। উনিশ শতকের সংস্কৃতির এই সামাজিক গতিবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে এগোলে বোঝা যায় যে লীভিস তাঁর আপাত-বৈরিতা সত্ত্বেও পেটারেরই স্বদলীয়এবং সেই কারণেই পেটার যখন 'মহৎ শিল্প'-এর (great art) সংজ্ঞা দেন তার সঙ্গে লীভিস-বর্ণিত 'মহৎ সংস্কৃতিধারার' (The great tradition) মৌলিক পার্থক্য খুবই কম।

গোড়ার দিককার এই ছবিটি পরিষ্কার করে নিয়ে যদি পেটারের সমালোচনা-

সাহিত্য বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে তারমধ্যে ধরা পড়েতার মালমসলা—আঠারো শতকের বুদ্ধিবাদী দর্শন যে স্বাভাবিক মানুষের বর্ণনা করেছে এবং উনিশ শতকের হেগেলীয় দর্শন যাকে আদর্শবাদী মানুষ বলেছে সে-দুটি মিলিয়ে পেটার তৈরী করেছেন তাঁর নান্দনিক জগৎ। এই জগৎকে তাঁর সমাজের প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সমাজাদর্শ থেকে কোনো অংশে বিচ্যুত মনে করার কোনো কারণ নেই। এই অভিমত যে-কোনো এক বিশেষ মতবাদ-প্রসূত নয় তার প্রমাণ নিছক সাহিত্যধর্মী সমালোচনা থেকেও পেটারের এইরকম একটি পরিচয়ই বেরিয়ে আসে। একদিকে টি এস এলিয়টের 'Arnold and Pater' প্রবন্ধটি অপরদিকে ফ্র্যাঙ্ক কারমোডের 'The Romantic Image' বইটি খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে পেটার ভিক্টোরীয় সংস্কৃতিচিন্তাকে পৌঁছে দিচ্ছেন বিশ শতকের গোড়ার দিককার 'আধুনিক' কাব্যচিন্তার দোরগোড়ায়। সুতরাং পেটারকে তাঁর শ্রেণীগত সমাজচিন্তা থেকে বিচ্যুত মনে না করা কেবলমাত্র সমাজভিত্তিক বিশ্লেষণের কষ্টকল্পনা নয়।

আপত্তি উঠতে পারে এগুলি তো সবই মাছের তেলে মাছ ভাজা। সমাজ-ভিত্তিক চিন্তা উনিশ শতকের মার্কামারা তাই দিয়ে উনিশ শতকের কিছু কাব্যচিন্তার আলোচনা করা হ'লো এতে কার কি এসে গেলো? 'আধুনিক' মননজগৎ এসব সমীকরণ পেরিয়ে কবে চলে এসেছে মনোজগতের কুলকুণ্ডলিনীর প্যাঁচের মধ্যে। আধুনিক মন নিয়ে কাব্যজগতের এই জটিলতার মধ্যে মানুষের সামাজিক জীবনের সরলীকৃত সত্যকে প্রতিফলিত করা যায় কি? কোনো এক বিশেষ সাহিত্য-চিন্তাবিদের মতে আধুনিক যুগে উপন্যাস, গদ্য, সমালোচনা সবই হয়েছে কবিতার অধিকার কবলিত। কবিতাই একমাত্র শব্দের অন্তর্গত রূপটিকে নিটোলভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং আগে যা বলেছি এই রূপ খুঁজতে কবিতার বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না; সমাজজীবন তো খুব দূরের কথা, কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুপ্রবেশও এখানে নিষিদ্ধ।

ভরসার কথা এই যে আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক আমার চোখে পড়েননি যিনি এই অতিমানবিক স্বপ্ন (অথবা দুঃস্বপ্নকে) সার্থক করতে পেরেছেন। কাব্যাদর্শের যে-সব আলোচনা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে এবং যা দিয়ে আমরা পুষ্ট তার ওপরে পশ্চিমী কাব্যাদর্শের ছায়া অত্যন্ত ঘন। যে কবি-

পাঠক সম্পর্কের ওপরে পশ্চিমী কাব্যচিন্তা এখন দাঁড়িয়ে সেখান থেকে এমন কোনো চাপ আর কবির ওপরে আসার সম্ভাবনা দেখি না যা কবিকে অন্যভাবে চিন্তা করাবে। সমাজের গোষ্ঠীগত জীবন বলতে কোনো চেহারা আর পশ্চিমী জগতে তেমনভাবে চোখে পড়ে না। যন্ত্রভিত্তিক পুঁজিবাদ এবং ভোটভিত্তিক গণতন্ত্রবাদ পশ্চিমী মানুষকে নিঃসঙ্গ হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। পশ্চিমী কাব্যাদর্শ এই প্রেরণার জনক এবং প্রজাতি দুই-ই। কাব্যকে সমাজবিচ্যুত করার পেছনে এই-জাতীয় ঐতিহাসিক ধারার অবদান অনেকখানি। সুতরাং 'বিশুদ্ধ কাব্য'-এর আদর্শকে বুঝতে গেলে যে সমাজে সে আদর্শ উদ্ভূত হচ্ছে এবং যে সমাজ তাকে পরিপুষ্ট করছে সে সমাজের চেহারাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। এর ফলে দান্তে-বর্ণিত প্লুটোর মতো 'বিশুদ্ধ কাব্য' নেতিয়ে পড়লেও কাব্যরূপের গভীরতা এবং তাৎপর্য আমাদের চোখে বাড়বে বই কমবে না। এই গভীরতা বা তাৎপর্য সমাজ-চেতনার গভীরতা বা তাৎপর্যের সমগোত্রীয়।

আনাড়ি হাতের এই বিরাট বিষয়ের অবতারণা করার দুঃসাহসের জন্য সম্পাদক মহাশয় শ্রীসুরজিৎ ঘোষ মূলত দায়ী। এই আলোচনাটি পরোক্ষভাবে যাদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্যের নাম অন্যতম। প্রত্যক্ষভাবে শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য সাহায্য করেছেন। লেখার ভুলত্রুটিগুলি আমার নিজস্ব।

গৌতম বসু

পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত : বিবর্তনে ও কবিতার সান্নিধ্যে

শ্রুতির মূলেই উপকরণ ; নৈসর্গিক কিম্বা মনন-সঞ্জাত শব্দে যেখানে সুর (মেলডি), সঙ্গতি (হার্‌মনি) প্রভৃতির সূত্র উপস্থিত, উপকরণ ও গ্রাহকে সেখানে সৃষ্টির সম্পর্ক। প্রাকৃতিক নিয়মে শব্দ সঙ্গীতের মূল একক এবং উপকরণ, ফলে, শব্দই একাধারে প্রেরণা ও প্রকাশমাধ্যম হলে স্বভাবতই, সঙ্গীত প্রথম পর্যায়ের উৎপন্ন শিল্প (first order derivative art) হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, শুধু সঙ্গীত নয়, ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্প-সৃষ্টি এই প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তর্গত। কিন্তু সরলীকরণের সম্ভবনা সীমিত, যেমন, ইতিহাস সাক্ষী, কখনো কখনো শিল্পই শিল্পের প্রেরণা। এই ধরনের সৃষ্টিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপন্ন শিল্প (second order derivative art) বলা যেতে পারে। পর্যায়ের ভিন্নতার সঙ্গে অবশ্য আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের কোনো তাৎক্ষণিক সম্বন্ধ নেই ; এড্‌না সেণ্ট্‌ ভিন্‌সেণ্ট্‌ মিলের 'On Hearing A Symphony of Beethoven'-এর থেকে যে কীট্‌স্‌-এর 'Ode To A Nightingale' শ্রেষ্ঠতর তার স্বতন্ত্র কারণ আছে। বস্তুত, মূল প্রভাবের শ্রেষ্ঠত্ব অতিক্রম ক'রে দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্প অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। *Cantus planus*, অর্থাৎ plainsong-এর যুগ থেকে প্যালেস্ট্রিনা এবং তারপর বাখ্‌, বেথোভেন্‌ হয়ে টিপেট্‌ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে এসেছে ; কিন্তু শুধু সাঙ্গীতিক নয়, এক বৃহত্তর শৈল্পিক কাঠামোয় এর বিবর্তন বিচার্য। বিচ্ছুরণ মহৎ শিল্পের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—তার অর্থ ও আভাসের প্রান্ত নির্ণয় করা শক্ত— পাবলো কাসাল্‌স্‌ যেমন বাখ্‌-এর The Well-tempered Clavier (*Das Wohltemperierte Clavier*) সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'There is always something left to discover in it'। সম্ভবত এই সত্তাই এক নিটোল গ্রন্থি হয়ে বিভিন্ন শিল্পশাখার মধ্যে রক্তের সম্পর্ক গ'ড়ে তুলেছে। সময়ের বিশেষ চরিত্রপ্রভাবে যখন এই সংযোগ ক্ষীণ হয়েছে, তখন শিল্প হয় অন্তর্মুখী উত্তরণের সম্ভবনায় উজ্জ্বল, নয় তো ক্ষয়ের সম্মুখীন।

Art integral-এর প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার কয়েকটি প্রধান উৎস

লক্ষণীয় : হেলেনইজম্, রেনেসঁস্, খৃষ্টধর্ম এবং লোকশিল্প। প্রভেঁসীয়, বারোক ইত্যাদি অন্যান্য প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য কিন্তু বরাবরই তাদের স্থানগত সংকীর্ণতা ছিল—বারোক-এর প্রধান প্রভাব যেমন কেবল চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং সঙ্গীতে, প্রভেঁস-এর প্রধান প্রভাবও তেমন কাব্যসাহিত্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যুক্তি-বাদ এই অর্থে সীমিত নয় কিন্তু School of Puritan Ethics-এর ফল-স্বরূপ অতএব স্থূল হিসেবে রেনেসঁস্ এবং খৃষ্টধর্মের প্রভাবপুষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয় সঙ্গীত,এবং অন্তত এই ক্ষেত্রে হেলেনইজম্-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সীমিত। গ্রীস-এর সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তাতে সভ্যতার আভাস নিশ্চয় আছে কিন্তু পরবর্তীকালের সঙ্গীতচিন্তাকে অনুপ্রাণিত করার যথেষ্ট উপকরণ নেই। এ-সত্ত্বেও হেলেনইজম্-এর প্রভাব আছে, এবং সেটি অন্তরের। ভাবীকালের জন্য গঠনতত্ত্ব, সমালোচনার মাপকাঠি কিম্বা অসামান্য কোনো সঙ্গীতস্রষ্টার প্রমাণ না রেখে গেলেও গ্রীসীয় সভ্যতা তার বিরাটত্ব, সংযত আবেগ এবং চেতনায় একটি ক্লাসিকবোধ রেখে গেছে।

দ্বিতীয়ত, রেনেসঁস। 'নবজাগরণ' সঙ্গীতের পক্ষে কি যথার্থই নবজাগরণ ছিল? এই সময়ে পলিফনি কোরাল পালফনি-তে পরিণত হয়, সেক্যুলর্ মিউজিক্ অর্থাৎ ধর্মবহির্ভূত সঙ্গীতেরও এই প্রথম সম্মানের আসন মেলে, কিন্তু চিত্রকলা কিম্বা সাহিত্যের মতন সঙ্গীতের ভিত্তিতে কোনো ব্যাপক ও দ্রুত রদবদলের সঠিক পরিচয় নেই। বস্তুত, সাঙ্গীতিক রেনেসঁস্-কে অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া হিসেবেই চিহ্নিত করা উচিত। সাঙ্গীতিক তত্ত্বের পরি-শীলনে এবং পালেস্ট্রিনা, লাসো ইত্যাদি সঙ্গীতস্রষ্টার হাতে আঙ্গিকের ক্রমোন্নতিতে রেনেসঁস্ সঙ্গীতকে ক্লাসিক যুগের তোরণে পৌঁছে দিয়েছে। এই বিচারে বারোক-যুগের বিশিষ্টতা থাকলেও কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; এটি আশ্চর্য-জনক হ'লেও নিতান্ত যুক্তিহীন নয়। রেনেসঁস্-এ সংযমের আধিপত্যের অব্যবহিত পরে উচ্ছ্বাস ও অতি-অলঙ্করণের যুগ প্রায় অবশ্যম্ভাবী—নাহ'লে ক্লাসিক যুগে সামঞ্জস্যের অভাব থেকে যেত। বৃহত্তর সংজ্ঞায় রেনেসঁস্-কে বিচার করলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় : প্রথমত, সেক্রেড্ ও সেক্যুলর্ সঙ্গীতের সমান্তরাল অস্তিত্বের প্রথম স্থায়ী চিহ্ন; দ্বিতীয়ত, বাখ্ ও হ্যানডেল্-এর মধ্যে পলিফনি-যুগের উচ্চতম স্তর এবং সেইখানেই যুগের

সমাপ্তি; এবং তৃতীয়ত, বারোক-যুগ সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের হয়েও রেনেসাঁস্-এর সঙ্গে যুক্ত। রেনেসাঁস্-এর মূল কাঠামোয় থেকেও কেবলমাত্র একজনই সদর্থে অভিনব হ'তে পেরেছিলেন, তিনি আধুনিক কন্‌চ্যর্টো-র প্রধানতম স্রষ্টা অ্যানটোনিও ভিভাল্‌ডে। হারমনি-প্রধান যুগে মেলডি-প্রধান লোক-সঙ্গীত ব্যবহার ক'রেই ভিভাল্‌ডে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

প্রাক-ক্লাসিকাল যুগ থেকে লোকসঙ্গীতের নতুন প্রয়োগে শুধুমাত্র মেলডি অংশের ঐশ্বর্যই বাড়েনি, আঞ্চলিক স্বাদের ভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত মিলে বহুমাত্রিক সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছে। স্বল্পপরিসরে প্রধান প্রধান লোক-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব, শুধু এইটুকুই লক্ষণীয় যে ভিভাল্‌ডের মধ্যে যেটি কেবল নতুনত্বের স্বাদ ছিল, আধুনিক কালে ডিলিয়স্‌ কিম্বা ভন্‌ উইলিয়াম্‌স্-এর মধ্যে সেটি পরিণত মাধ্যমের আকার ধারণ করেছে।

য়ুরোপীয় কল্পনার সময়োচিত স্ফুরণের জন্য খৃষ্টবৃত্তান্তের মতন আধারের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, মধ্যপ্রাচ্যের রুক্ষ পরিবেশ থেকে একটি religion নির্মাণ অন্ততপক্ষে শিল্পগত দিক থেকে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। শুধুমাত্র বাইবেল-এর কিং জেম্‌স্‌ ভার্সন-ই এর যথেষ্ট প্রমাণ—ছত্রে ছত্রে রূপক, প্রতীক এবং সর্বোপরি কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে বইটি নানা শিল্পশাখার সজীব প্রেরণা হয়ে আছে। প্রকাশ্যে, বাইবেল প্রচার এবং প্রশস্তি, মানসিকতায়, শিল্প ও দর্শন। উদাহরণস্বরূপ, চতুর্বিংশ সাম-এর দুটি ছত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

6. This is the geneation that seek him, that seek thy face, O Jacob. Selah.

7. Hold up your heads, O ye gates ; and be ye lift up ye everlasting doors ; and the King of glory shall come in.

এই শিল্পবোধ সংক্রামক। সামান্য ব্যবহারিক কারণে রচিত ক্যান্‌টাটা, প্রেলিউড্‌ প্রভৃতির অলঙ্করণ সর্বতোভাবে এই বিশিষ্ট শিল্পবোধ প্রসূত। কিন্তু অলঙ্করণ বাহ্যিক; ফিউগ্‌, মাস ও ওরাটোরিওর মতন গভীরতর সৃষ্টি কখনোই নিছক অলঙ্করণে সীমাবদ্ধ নয়। হ্যানডেল্‌-এর 'The Messiah'

কিম্বা বাখ্-এর 'The Passion according to St. Matthew' অন্তরের কোনো ঈশ্বরসন্ধান—সঙ্গীত ও religion অবলম্বন মাত্র। প্রতিষ্ঠানিকতার অন্তরায়ের জন্য ক্লাসিকাল যুগ অর্থাৎ হাইড্ন্-এর সময় থেকেই গির্জাপ্রাঙ্গন কিছুটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। স্তরীভূত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে ব্যক্তিচেতনা ক্রমশই নিজের এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ফিরে আসে, যেমন বেথোভেন্। Eroica অর্থাৎ তৃতীয় সিমফনি-তে যিনি অস্থির, পঞ্চম সিম্ফনি-তে যিনি নিয়তির তাডনায় জর্জরিত, নবম সিম্ফনি ও শেষ কয়েকটি কুয়ার্টেট-এ (A Minor, B flat Major, C sharp Minor, F Major) তিনিই আবার প্রজ্ঞায় স্থিত। দীর্ঘ সাত বছর প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকার পর বেথোভেন্ যখন Hammerclavier Sonata লেখেন তখন তিনি সমাজ, religion এমন কি সমস্ত বাহ্যিক শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন। এ একরকম ভালো ; শিল্পী যখন সব স্ববিরোধের উর্ধ্বে তখন পৃথিবীও নতুন কিছু শেখাতে অক্ষম। তখনকার অভিব্যক্তির দুর্গমপথে বাখ্-এর religion-আশ্রয়ী আড়ম্বর অবান্তর। নিঃসঙ্গ বেথোভেন্ হয়তো সেইজন্যই কুয়ার্টেট-এর ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর উপলব্ধ সঙ্গতির সূত্র রেখে গেলেন। বাইবেল-প্রেরিত ধর্মবোধ শেষে উৎস অতিক্রম করলো।

প্রধানত সেক্যুলর সঙ্গীতের কল্যাণে ক্লাসিক যুগ বহু স্রোতের পটভূমিতে আসায় তার আঙ্গিক ও পরিধিতে সম্প্রসারণের পরিচয় মেলে। সিম্ফনি,সোনাটা প্রভৃতি আধুনিকতর আঙ্গিকের গঠনে,প্রভাব এবং নাট্য ও কাব্যসাহিত্যের অনুসঙ্গ ইত্যাদির ফলে সাঙ্গীতিক অনুভূতিসম্পন্ন একটি সঙ্গীতোত্তর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অথচ বাখ্-এর ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে নয়, নিতান্ত সাধারণ মানুষ ও জীবন সংক্রান্ত অস্ফুট ভালো লাগার বোধগুলি জাগিয়ে তোলায় এর সিদ্ধি। এই যুগে কবিতার থেকে নাটকের প্রভাব তীক্ষ্ণতর হলেও, উক্ত সঙ্গীতোত্তর পর্যায় স্পষ্টতই কাব্যিক—এবং লিরিক কবিতার অর্থে। বেথোভেন্-এর পাসটোরাল্ সিম্ফনি বা মুন্লাইট্ সোনাটার মতো দৃষ্টান্তে তো আধুনিক কালের Tone-poem -এর পদক্ষেপও চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এ-জাতীয় রচনায় অবশ্য ক্লাসিকতার সঙ্গে রোম্যান্টিকতার সহাবস্থান ঘটেছে, কিন্তু মোট্‌জার্ট-এর E flat Major-এ Horn Concerto-র মতন সম্পূর্ণ ক্লাসিক রচনা ধরা গেলেও কাব্যিক চেহারার স্পষ্টতা থেকে যায়। অথচ হাইড্ন্, মোট্‌জার্ট ও

বেথোভেন-এর মধ্যে কেউই খুব একটা সঙ্গীতচর্চার বাইরে এসে যুগের হাওয়ার পরিমাপ করেননি। অপেরা লেখার সুবাদে সমকালীন নাটক সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও, লিরিক কবিতার বিশারদ এঁরা নন। তবু কবিতা কাজ করেছে; সৃজনশক্তি কয়েকটি কবিতার সুরারোপ ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি, সঙ্গীতরচনার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। বেথোভেন্ সাধারণত শেষ ক্লাসিকাল এবং প্রথম রোম্যাণ্টিক হিসাবে সমাদৃত, (যথার্থই তিনি জীবনের দুই প্রান্ত দিয়ে দুই যুগ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন) কিন্তু বিশ্লেষিত নন। লিরিকবোধের প্রেরণায় তিনি ক্লাসিকাল যুগের উচ্চতম চূড়ার নির্মাতা, কিন্তু যখন এই কাঠামোয় লিরিকবোধের আর ঠাঁই রইল না তখন তিনি রোম্যাণ্টিকতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

ক্লাসিকতার সামঞ্জস্যবোধকে প্রত্যাখানের মধ্যবর্তিতায় জার্মানির লিরিক কবিতা আবেগে প্রাণ সঞ্চার করতেই সঙ্গীতে ও বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তার প্রধাবিকৃত্বতা প্রতিভাত হয়। রোম্যাণ্টিক মানসিকতার উন্মুক্ত পরিবেশে ওয়েবার, শুবার্ট, ব্যরলিওজ, শুমান এবং বিমূর্ততর স্তরে মেন্‌ডেল্‌সন্, শোপ্যাঁ ব্রাম্‌স ও লীস্ট প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতপ্রবাহ প্রায় আন্দোলনের সামিল। ১৮২০ থেকে এই আন্দোলনের বরাবরই বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া আশ্চর্যের নয় কারণ সঙ্গীতস্রষ্টার মেজাজের উপযোগী উপরণের সম্ভার ছিল বিস্তৃত। গ্যোয়েঠে-র 'Faust' থেকে ব্যরলিওজ্-এর 'The Damnation of Faust' ও বাইরন্-এর 'Childe Harold's Pilgrimage' থেকে 'Childe Harold In Italy'; বিভিন্ন কবির (বিশেষত হাইনের) কবিতা থেকে শুমান-এর 'Romances and Ballads'; শেক্স‌পিয়ার-এর 'A Midsummer Night's Dream' প্রভাবিত মেন্‌ডেল্‌সন্-এর একই নামে বিমূর্ত রচনা—ফর্দের যেন শেষ নেই। অথচ এই সম্পর্ককে নিছক প্রাথমিক বিষয়বস্তু ব্যবহারে সীমাবদ্ধ মনে করলে ভুল হবে। সেই অর্থে শোপ্যাঁ-র কোনো বহিরাগত উপকরণ নেই, অথচ শোপ্যাঁ-ই রোম্যাণ্টিকতায় সর্বাপেক্ষা মগ্ন। তর্কের খাতিরে (এবং আধুনিক মতের বিরুদ্ধে) যদি মেনেও নেওয়া হয় যে শোপ্যাঁ-র ব্যালাড্‌গুলি আসলে তাঁর বন্ধু অ্যাডম্ মিকিউইজ-এর কবিতা ভালো লাগার ফল, তাহলেও প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মেজাজের পার্থক্য দেখে প্রেরণার যথার্থতা সমন্ধে প্রশ্ন ওঠে। আসলে

সম্পর্ক মূলত ভাবের। সেইজন্যই লীস্ট-এর Symphonic poem বা মেন্‌ডেল্‌সন্‌-এর Song Without Words সম্পূর্ণ সঙ্গীত হয়েই সম্পূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠে। শুধু মাধ্যমের পার্থক্যে যেমন কবিতা-অকবিতার বিচার চলে না, প্রতিটি প্রাসঙ্গিক মাধ্যম উত্তীর্ণ হলেই একটি গান, ছবি কিম্বা মূর্তি কবিতা হয়।

সমকালীন কবিতায় সুরারোপের প্রবণতা রোম্যান্টিক যুগের থেকে অক্ষত আকারে একশো বছরের বেশি টেঁকেনি কিন্তু সঙ্গীতের ইতিহাসে দাগ কেটে গেছে। প্রধান চারজন সুরকার শুব্যার্ট, শুমান, ব্রাম্‌স্‌ ও উল্‌ফ্‌-এর মধ্যে শুব্যার্টই শ্রেষ্ঠতম; তাঁর The Winter Journey (Die Winterreise) কিম্বা গ্যোয়েঠে-র কবিতা অবলম্বনে The Erl-King (Der Erlkonig) শুনলেই সুরারোপের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শোনা হয়ে যাবে। কিন্তু সুরারোপ শুধু সাফল্যই দেয়নি, কবিতা ও সঙ্গীতের সম্পর্কে কিছু প্রশ্নও তুলেছে। কবিতাকে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে একে অপরের পরিপূরক না হয়ে বিরোধী হয়ে যেতে পারে। একটি কবিতাকে যদি সম্পূর্ণ শিল্পবস্তু হিসেবে গণ্য করা যায় তাহলে সঠিক অনুবাদেও (তা সে সঙ্গীতে কি অন্য ভাষাতেই হোক) কিছুটা শিল্পক্ষয় প্রায় অবধারিত, কিন্তু মূলের সঙ্গে কোনো বিরোধ কবির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে গ্যোয়েঠে শুব্যার্ট-এর বেশ কিছু সুরারোপের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, ব্রাম্‌স্‌ তো গোয়েঠে-শিলার-হাইনের থেকে অপ্রধান কবি ডাইমেরর কবিতাই বেশী সুর দিয়েছেন। অপরপক্ষে, ভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও মেজাজের বিশিষ্ট মিলের জন্যই দেবুসি ভারলেন, মালার্মে ইত্যাদির কবিতার উৎকৃষ্ট সুরারোপ করেছেন।

বস্তুত, রোম্যান্টিক কাঠামোর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকে তৎকালীন (উনবিংশ শতাব্দীর) কাব্যসাহিত্যে গীতিরূপ-প্রদানের মধ্যে একটি বিরোধ ছিল। শুব্যার্ট-প্রবর্তিত কণ্ঠ ও সঙ্গত অর্থাৎ কণ্ঠ ও পিয়ানোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার পথ অনুসরণ না ক'রে শুমান সঙ্গতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন; ব্রামস্‌ তাঁর মেলডির প্রতি দুর্বলতার জন্য লোকসঙ্গীত ভিন্ন লিরিকের ভাবগত সুর বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ধরতে পারেননি, কিন্তু হিউগো উল্‌ফ্‌-এর কৃতিত্ব যথার্থই স্বীকার্য।

শুমান-এর সঙ্গত-প্রধান পদ্ধতি মেনে নিয়ে তিনি পিয়ানোকে লিরিকের সঙ্গে না বেঁধে, লিরিকের অন্তরালে, অর্থাৎ কবির মানসিকতায় পৌঁছে দিলেন। ফলে, সাঙ্গীতিক চরিত্র স্পষ্ট রেখেও কবিতার নিজস্ব স্বাধীনতাকে হেয় করা হয়নি। দেবুসির সুরারোপের সময় রোম্যান্টিকতার পরিবেশ অনেক দুর্বল, কাব্য-সাহিত্যও অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত হয়ে ওঠে—ফলে মালার্মে-র The Afternoon of A Faun-এর জন্য প্রেলিউড্ রচনা কিছুটা সহজসাধ্য হয়েছিল। চারিত্রিক পার্থক্য সত্ত্বেও দেবুসি ও উলফ্-এর সুরারোপের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পরবর্তী-কালে মালার্মের বহু কবিতার গীতিরূপ হয়েছে, বিশেষত পিয়ের বুলের হাতে, এবং প্রায় সব সফল দৃষ্টান্তই দেবুসির ধর্মানুসারী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে সঙ্গীতচিন্তায় ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবাহে সিমফনি, সোনাটা প্রভৃতি কোনো আঙ্গিকই অক্ষত থাকেনি। রোম্যান্টিকতার পরে ইম্প্রেশনইজম্, নিও ক্লাসিকাল যুগ এবং তারও পরে সিরিয়লইজম্-এর (serialism) বিকীর্ণতার ফলে প্রতিষ্ঠিত আঙ্গিকগুলি ভেঙে গিয়ে পরস্পরের মিশ্রণের ফলে নতুন এবং ব্যাপকতর কয়েকটি আঙ্গিক সৃষ্টি হয়। নতুন আঙ্গিকের মধ্যে লীস্ট-এর Symphonic Poem-এর কিছু পরিমাণে একতার অভাব ছিল— রিচার্ড স্ট্রাউস-এর প্রচেষ্টায় এবং সোনাটা, ফিউগ্ ইত্যাদির উপযুক্ত প্রয়োগে এই আঙ্গিক উন্নততর স্তরে পৌঁছোয়। স্ট্রাউস-এরই জন্য এই আঙ্গিকের পক্ষে শুধুমাত্র 'Don Juan' নয়, শেক্সপিয়র-এর Macbeth-এর নিয়তির গতিবিধি, এমনকি, নিৎসে-র 'Also Sprach Zarathrustra'-র দার্শনিকতাকে সুরে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়।

এই আলোড়ন সত্ত্বেও আধুনিক যুগ ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের সঙ্গে একটি গ্রন্থিতে যুক্ত থেকে গেছিল—প্রতি ক্ষেত্রেই ধ্রুপদী সঙ্গীত tonal method-এর উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে শোনবার্গ atonal method-এর প্রবর্তন করেন। একটি স্বরকে (note) প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত না ক'রে তার চারপাশের স্বরের মধ্যবর্তিতায় উক্ত স্বরকে প্রকাশ করাই এর প্রধান লক্ষ্য। প্রথাসিদ্ধ রীতিবদ্ধতার বিকল্প হিসেবে শোনবার্গ atonal method-এ note method অর্থাৎ Serialism-এর প্রচলন ক'রে সাঙ্গীতিক তত্ত্বের যে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেন তা প্রথমে তিরস্কৃত হলেও আজ অভিনন্দিত।

আঙ্গিকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা ও সঙ্গীতের বোধ বদলে অনভ্যস্ত কানের কাছে পাউণ্ড ও শোন্‌বার্গ সমান দুর্বোধ্য, কিন্তু অভ্যস্ত ও শিক্ষিতের কাছে দু'জনেই বিংশ শতাব্দীর কবিতা ও সঙ্গীতের মূল স্তম্ভের মতন। এই আপাত-দুর্বোধ্যতার জন্য সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে ব'লে অনেকেই মনে ক'রে থাকেন। বস্তুতপক্ষে আধুনিক কবিতার সুরারোপ স্ট্রাভিন্‌স্কির হাতে খুব সফল হয়নি, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। ক্লাসিকাল যুগের মতন আজও সঙ্গীত এবং কবিতার সম্পর্ক অনেকটা ফল্গুধারার মতন—সেই শক্তিতেই মালহ্‌র-এর Song of The Earth-এর মতন সিমফনি আকারের সৃষ্টিতে প্রাচীন চৈনিক কবিতার ব্যবহার হয়, ভন উইলিয়াম্‌স্‌-এর Sea Symphony-তে ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর Leaves of Grass প্রায় কোরাল সিমফনির কাছাকাছি এবং এলিয়ট-এর Four Quartets শুধু চেম্বার মিউজিক নয়, শেষ পর্যায়ের বেথোভেন্‌-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। জীবনের মূলেই আজ যখন সংশয়, সুখ আর দুঃখের ব্যাপ্তি, শিল্পচেতনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা টানা আদৌ কি সম্ভব?

রমানাথ রায়

বিভূতিভূষণ ও তাঁর ছোট গল্প

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের অমিত রায় কারণে অকারণে রীতিমত বাকপটু হয়ে উঠেছে, যখন শরৎচন্দ্রের কমল স্বাভাবিক কথা ভুলে কেবলমাত্র তর্কের জাল বুনে নিজেকে আধুনিকা ব'লে প্রমাণ করতে ব্যস্ত এবং যখন হামসুন, গোর্কি-পড়া একদল তরুণ পূর্ববর্তীদের আক্রমণ ক'রে আরো বাস্তব, আরো নগ্ন সত্যের মুখোমুখি হবার জন্যে কৃষক, শ্রমিক, জেলে, বেশ্যা ও কেরাণীর জীবনী রচনায় মত্ত, দিশেহারা, ঠিক তখনই বাংলা সাহিত্যে এমন এক স্বপ্নদর্শী বালকের আবির্ভাব ঘটল যে মুহূর্তের মধ্যে সকলের চিত্ত জয় ক'রে অমর হয়ে রইল। অথচ এর জন্যে বিভূতিভূষণকে তর্কের জাল বুনতে হয়নি, কিম্বা, কৃষক, শ্রমিক বা কোন বেশ্যার দ্বারস্থ হতে হয়নি। শুধু তাই নয়, পাঠকের মন ভোলাবার জন্যে তিনি কোন জমজমাট অতি নাটকীয় ঘটনার অবতারণা পর্যন্ত করেননি। অপুর কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি এমন সব তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ ঘটনা বেছে নিয়েছেন যার মধ্যে মানুষের সত্যিকার ইতিহাস লেখা আছে। বিভূতিভূষণ জানতেন, 'জগতের বড় ঐতিহাসিকের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মাঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাদের পুঁটুলি বাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল— দু'হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম।' আর সেই কারণেই বিভূতিভূষণ আরও সূক্ষ্ম, আরও তুচ্ছ জিনিসের সন্ধান করেছিলেন, যার ভিতরে মানুষের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস লেখা আছে। তাঁর বিশ্বাস আজকের মানুষ আর বড় বড় ঘটনা চায় না। এখন 'মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়।' এই বুকের কথা শোনাতে গিয়ে বিভূতিভূষণকে আঙ্গিকের কথাও বিশেষভাবে ভাবতে হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন প্লট-নির্মাণের

মধ্যে লেখকের যতই বুদ্ধির পরিচয় থাকনা কেন, তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধরা পড়ে না। কেননা, কার্যকারণের সেতু নির্মাণ করতে করতে জীবন থেকে লেখককে ক্রমশ সরে দাঁড়াতে হয়। ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে আধুনিক কথাসাহিত্যের জন্মলগ্নে এই কথাটি অনেকেই বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই সেখানে কথাসাহিত্যের নবজন্ম ঘটেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকেরা তখন এটা বুঝতে পারেননি।

দুই

প্রথম মহাযুদ্ধ আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে এক ভয়ংকর সর্বনাশ এনে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বিস্ময় এবং সৌন্দর্য সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের উলঙ্গ বীভৎসতায় মানুষের মন থেকে সমস্ত বিস্ময় চলে গেল। এবং সৌন্দর্য 'অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে' আত্মসমর্পণ করল, ফলে শিল্পীরাও 'সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু'র আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েনতুন করে এই পৃথিবীর দিকে চোখখুলেতাকালেন। মানুষ সম্পর্কে সভ্যতা সম্পর্কে তাঁদের সকলের মোহভঙ্গ হল। তাঁদের কাছে পৃথিবীটা হয়ে উঠল 'পোড়ো জমি' এবং মানুষ হয়ে উঠল 'ফাঁপা মানুষ'। বাংলাদেশের তিরিশের নবীন লেখকেরা তখন এই একই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে ইন্দ্রধনুর মায়াকে অস্বীকার ক'রে মর্তবাসীদের নীচতার, বিকৃতির ও জৈবতার দিকগুলো সাহিত্যে জোর গলায় প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই বাস্তব, এই সভ্যতার প্রকৃত চেহারা। কিন্তু প্রকৃতির কৌতুকে সর্বত্রই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই নবীন লেখকদের মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিল। সেই ব্যতিক্রম বিভূতিভূষণ। বাস্তবিক, ভাবতে অবাক লাগে, যখন কারও মধ্যে বিস্ময় বলে কিছু নেই, এমনকি একজন সবকিছু জেনে ফেলেছেন বলে নিজেকে ভাগ্যহীন মনে ক'রে বড়াই করছেন, ঠিক তখন বিভূতিভূষণের আবির্ভাব ঘটল, তাঁর মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত নেই, তাঁর মধ্যে পুনরায় 'সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু' ধরবার আয়োজন দেখা গেল।

বিভূতিভূষণের মন ছিল রোমান্সধর্মী। রহস্যময় সুদূরের আকর্ষণে তাঁর মন

বারবার 'জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে' যাত্রা করে। 'সোনাডাঙ্গা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে' যে পথ সামনে চলে গেছে, 'শুধুই সামনে···দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে', সেই পথের রহস্য তাঁকে থেকে থেকে আকুল ক'রে তোলে। তাই 'দ্রবময়ীর কাশীবাসে'র উৎপীড়িতা উপেক্ষিতা দ্রবময়ী নিজের ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ ক'রে কাশী চলে যান, 'একটি ভ্রমণ কাহিনী'র গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার সুদূরের আকর্ষণে বারবার প্রোগ্রাম ও টাইমটেবিল প্রস্তুত করে রাখেন। 'সিঁদুচরণ' গল্পের সিঁদুচরণও এই একই আকর্ষণে দূর দূরান্তে যেতে না পারলেও বাহাদুরপুর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসে। কিন্তু বিভূতিভূষণ অপরিচয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেও পরিচিত জগতের স্মৃতি কখনও ভুলতে পারেন না। থেকে থেকে তাঁর মনে পড়ে যায় 'তাহাদের বনে ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘনছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচকিচ করিয়া পাখি ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট, নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল—সেই হলদে পাখিটা আজও আসিয়া পাঁচিলের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়ত এতদিনে লেবু ফলিতেছে···।' ঠিক এই সব মুহূর্তে বিভূতিভূষণকে আর দূরের পথ টানে না। তাই অপু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে 'আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা হয়।' দ্রবময়ীও কাশীতে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি। নিজের গ্রামে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। কেননা, নীরজার সঙ্গে কথক ঠাকুরের কাছে কাশীমাহাত্ম্য শুনতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায়, 'ঘরের গাছে কত কাঁঠাল হয়েছে এই আষাঢ় মাসে, বড় কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শিকড় পর্যন্ত কাঁঠাল।' সিঁদুচরণও আবার নিজের গ্রামেই ফিরে আসে।

জানা এবং অজানার দ্বৈত আকর্ষণে বিভূতিভূষণের সত্তা যেন দ্বিধাবিভক্ত। তিনি এই উভয়ের কোন একটিকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করে নিতে পারেননি। কেউই পারে না। পারা সম্ভব নয়। সভ্যতার ইতিহাসে কত মানুষ ঘর ছেড়ে পথে বেড়িয়েছে। কিন্তু ঘরের মায়া কে কবে ভুলতে পেরেছে?

তিন

মানুষের অস্তিত্বের একটি অংশকে ঘিরে রয়েছে প্রবৃত্তি, অন্যটিকে ঘিরে চৈতন্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যে কমবেশী এ-দুটো অংশ বর্তমান। মানুষের যেমন খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ আছে, ঠিক তেমনি আকর্ষণ আছে নক্ষত্রলোকের প্রতি। তবে পশু বা উদ্ভিদের মধ্যে আমরা শুধু প্রবৃত্তির অন্ধ অভিব্যক্তি দেখি। আর এখানেই মানুষের সঙ্গে পশু বা উদ্ভিদের তফাৎ। বস্তুতঃ, সভ্যতার ইতিহাস মানুষের প্রবৃত্তির ইতিহাস নয়, চৈতন্যের ইতিহাস। এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে শিল্প, যা কিনা 'উৎকৃষ্ট চৈতন্যের ফসল', তার জন্ম প্রবৃত্তির সঙ্গে চৈতন্যের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে। এই প্রবৃত্তিকে অস্বীকার ক'রে অথবা তার নাগপাশকে অতিক্রম ক'রে শিল্পী দ্বিতীয় পৃথিবীর নির্মাণ করেন। এই দ্বিতীয় পৃথিবীর রূপকার বিভূতিভূষণ। তিনি জানতেন 'যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্যজীবন লুকানো আছে— সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্তজীবনের উৎসধারা—।' তাই 'গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়' তা তাঁর কাছে অত্যন্ত 'খেলো, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয়' মনে হয়। বিভূতিভূষণ 'আনন্দভরা সৌম্যজীবনে'র সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাঁর হাতে প্রতিটি চরিত্র শেষ পর্যন্ত অন্য অর্থে দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাই সেই সময়ে যখন তারাশঙ্কর প্রেমেন্দ্র বা মাণিকের গল্পে কুটিল, হিংস্র, লোভী, স্বার্থপর চরিত্রের অনন্ত মিছিল চলেছে তখন এঁদের পাশাপাশি থেকেও বিভূতিভূষণ কোন মানুষকে প্রকৃতির হাতের পুতুল ভাবতে পারেননি। তাঁর কোন গল্পেই প্রকৃত অসৎ কেউ নেই; যারা আছে, তারাও অবশেষে ভাল হয়ে যায়। বিভূতিভূষণের ধারণা, কোন মানুষ খারাপ নয়, সকলেই আসলে সৎ, হয়ত কেউ কেউ পরিবেশের চাপে খারাপ হয়ে গেছে। তবে তারা সৎ মানুষ বা ভাল পরিবেশের সংস্পর্শে এলে পুনরায় শুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'কিন্নরদল' গল্পে অকালপক্ক, ঝগড়াটে গ্রাম্য কুমারী শান্তি, যার বয়স মাত্র সতের, অথচ যে

তার মার বয়েসী মণ্টুর মার সম্পর্কে খুব সহজেই উচ্চারণ করে: 'কি ব্যাপক মেয়েমানুষ ঐ মণ্টুর মা। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি, অমন লঙ্কাপোড়া ব্যাপক যদি কোথাও দেখে থাকি, ক্ষুরে নমস্কার, বাবা বাবা', সেই শান্তিও একদিন শ্রীপতির গুণবতী স্ত্রীর স্পর্শে আস্তে আস্তে বদলে যায়, সেও কখন যেন সবার অগোচরে খুব ভাল হয়ে ওঠে। 'মৌরীফুল' গল্পে ঝগড়াটে, খামখেয়ালী সুশীলাও একদিন কোন এক শহরবাসিনীর স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে। শান্তি বা সুশীলার মত চরিত্র বিভূতিভূষণের গল্পগুলোতে ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। যে-কোন মুহূর্তেই এদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে। কিন্তু এরা ছাড়াও বিভূতিভূষণের গল্পে এমন অনেকে আছে যাদের সমাজ কোনদিন ভালবাসবে না, সমাজের কাছে যাদের চরিত্র নিন্দনীয়, তারাও বিভূতিভূষণের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণের হাতে পড়ে সেই সব চরিত্র শেষ পর্যন্ত সমাজের সহানুভূতি কেড়ে নেয়। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পের নায়ক কৃষ্ণলাল যে ধরণের জীবন যাপন করে তা সমাজের চোখে নিন্দনীয় হলেও, কৃষ্ণলালের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আমাদের অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করে। এমনকি 'বিপদ' গল্পের পতিতা হাজুও বিভূতিভূষণের ভালবাসা পেয়ে অনন্য হয়ে ওঠে। সমাজের চোখে পতিতাবৃত্তি গর্হিত হলেও হাজু নিজে এই পতিতাবৃত্তির মধ্যেই নিজের জীবনের চূড়ান্ত সফলতা খুঁজে পায়। যে হাজু একদিন পরের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল, সেই হাজু এখন নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা পিরিচে গ্রামের লোককে চা খাওয়ায়। এর জন্যে পতিতাবৃত্তিকে বরণ করায় হাজুর মনের মধ্যে কোন দুঃখ নেই, কোন গ্লানি নেই। সে বরঞ্চ আনন্দিত। তাই বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত হাজুর পতিতাবৃত্তিকে নিন্দা করার মত ভাষা খুঁজে পান না। পৃথিবীতে পতিতাদের নিয়ে অনেক কাহিনী লেখা হয়েছে। কিন্তু এই গল্পের তুলনা নেই। এই গল্পের আঙ্গিক হয়ত খুবই দুর্বল এবং অপাংক্তেয়; কেউই এটিকে সেজন্য ভাল গল্প বলতে রাজী হবে না, তবে আঙ্গিকের কথা বাদ দিয়ে চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এখানে হাজুকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করা হয়েছে তার অভিনবত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যে পতিতাদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে প্রতিটি লেখক তাদের ভাগ্যাহত বিড়ম্বিত জীবনের নিষ্ঠুর পঙ্কিল দিকগুলোই সমাজের সামনে তুলে ধরার মানবিক প্রচেষ্টা

করে থাকেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ হাজুর মধ্যে বিড়ম্বিত জীবনের সন্ধান পাননি, বরঞ্চ তিনি হাজুর মধ্যে এক আনন্দময় জীবনের সন্ধান পেয়েছেন।

বিভূতিভূষণের ভালবাসা কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতির প্রতিও তাঁর ভালবাসা সমানভাবেই প্রবল এবং ক্লান্তিহীন ছিল। প্রকৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের এই ভালবাসা তাঁর সাহিত্যকে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছে। 'কনে দেখা' গল্পটি এই প্রকৃতি প্রেমের এক আশ্চর্য উদাহরণ। বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি চেতনাহীন পদার্থ ছিল না। তিনি এর মধ্যে এক দিব্য আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, মনুষ্যেতর প্রাণীরাও বিভূতিভূষণের ভালবাসা পেয়েছে। 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পটিতে তার সার্থক প্রমাণ আছে।

চার

বিভূতিভূষণের কিছু গল্প আছে যা অলৌকিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তাঁর মন মাঝে মাঝে এই দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে আর এক জগতের রহস্য সন্ধানে উন্মুক্ত হয়েছে। সেই জগতের সন্ধান সকলেই পায় না। কেউ কেউ পায়। যারা পায়, সেইসব অল্প দু'একজনকে কেন্দ্র ক'রে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'ভৈরব চক্কোত্তির গল্প'। অশরীরী আত্মাদের সম্পর্কে তাঁর কল্পনার পরিচয় এখানে পাওয়া যাবে। অশরীরী আত্মাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সন্দেহ পোষণ করলেও এই গল্পগুলো আস্বাদন করতে কোন অসুবিধে হয় না। কারণ, পরিবেশ বর্ণনায় এমন অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, যা আমাদের মনের ওপর এক ধরনের মোহসৃষ্টি করে। আর একথা সত্য যে কোনো লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যাই থাক না কেন, তা কোনদিন সাহিত্য-পাঠের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। কোনো নাস্তিককে কি রবীন্দ্রনাথ বা ক্লোদেলের কবিতাপাঠে বিমুখ ক'রে তোলে? হেনরি জেমসের 'দি টার্ন অফ দি স্ক্রু' কার না ভাল লাগে, যদিও সেখানে আছে অশরীরী আত্মাদের উপস্থিতি; হয়ত তাদের উপস্থিতি গভর্নেসেরই কল্পনা বা বিকার, তবুও এই অশরীরী আত্মাদের সন্দেহজনক উপস্থিতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যায়।

বিভূতিভূষণের এইসব গল্প আপাতদৃষ্টিতে তাঁর পটভূমি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই এগুলোকে আর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে না। বিভূতিভূষণকে বারবার অজানা অদেখা জগতের রহস্য রোমান্টিকদের মতই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। আর এরই ফলে তাঁর নায়কেরা মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। কিংবা বেড়িয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে। তবে বিভূতিভূষণ সব সময় মর্তলোকের অজানা অদেখা জগতের রহস্য সন্ধানে তৃপ্ত থাকতে পারেননি। আর পারেননি বলেই অমর্তলোকের রহস্যের পথে তিনি থেকে থেকে যাত্রা শুরু করেছেন।

পাঁচ

বিভূতিভূষণের ছোট গল্পের শরীর তাঁর চরিত্রগুলির মতই সহজ, সরল এবং আড়ম্বরহীন। তাঁর গল্পে তেমন কাহিনী থাকে না, তেমন ঘটনা থাকে না। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাষার মধ্যে তেমন তীব্রতা পর্যন্ত থাকে না। তাই কোন পাঠক হঠাৎ তাঁর গল্প পড়তে বসলে তেমন আকর্ষণ বোধ করবে না। প্রতি-মুহূর্তেই তার অস্বস্তি হতে পারে। কিন্তু একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাঁর গল্পের সারল্যে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। এই সারল্য তাঁর প্রতিটি গল্পের ও উপন্যাসের প্রাণ বলা যেতে পারে। আর এখানেই বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য। আজ যখন ছোট গল্প থেকে কাহিনী, চমকপ্রদঘটনা ও দীপ্ত ভাষা নির্বাসিত, তখন কেন যেন বারবার বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়ে।

এখন অনেকেই বলতে পারেন, এই সারল্য বিভূতিভূষণকে যতখানি স্বতন্ত্র করেছে, ঠিক ততখানি দুর্বলও করেছে। কেননা, তাঁর নায়ক নায়িকারা এমন এক রূপকথার জগতের অধিবাসী যেখানে আধুনিক মানুষের বেঁচে থাকার ক্লান্তি নেই, যন্ত্রণা নেই, বিরক্তি নেই, সেখানে কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না, ঘৃণা করে না, বঞ্চনা করে না, সেখানে সকলেই ভাল, খুব ভাল। কিন্তু তাই বলে তাঁর জগতকে কেন অনাধুনিক ও অবিশ্বাস্য বলে মনে করা হবে? কারণ, মানব-মনের জটিলতা দেখানোই আধুনিক সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। যদি হত তাহলে 'দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী' আধুনিক সাহিত্যে অসাধারণ গ্রন্থ হিসেবে

সম্মানিত হত না। আর সব থেকে বড় কথা, মানুষের প্রকৃত পরিচয় আজও মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়ে আছে। কারো হাতেই তার রহস্যের আবরণ উন্মুক্ত হয়নি। কেউই জোর গলায় বলতে পারেনা, এই হচ্ছে মানুষ, এই তার প্রকৃত পরিচয়। হয়ত মানুষ জটিল, হয়ত বা সরল, কিংবা উভয়ের অদ্ভুত মিশ্রণ। তবে বিভূতিভূষণ মানুষকে আর পাঁচটা লেখকের মত অবিশ্বাস করেননি, সন্দেহ করেননি ব'লে মানুষ তাঁর কাছে কোনদিন একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। মানুষের প্রতি, মানুষের সত্তার প্রতি তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শেষদিকের রচনা 'অন্তর্জলী'র কথা মনে পড়ে যায়। গল্পের নায়ক দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জলীর জন্যে ডুমুরদহের ঘাটে আনা হয়েছে। দীনদয়াল একজন বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল অবিশ্বাস, ঘৃণা বা ক্রোধের মধ্য দিয়ে নয়, ভালবাসার মধ্য দিয়ে। তিনি বিখ্যাত কবিয়াল নবাই ঠাকুরকে ভালবাসায় আপন করেছিলেন। তারপর শুধু নবাই ঠাকুরকে নয়, একদিন সকলকেই তিনি এই একই মন্ত্রে জয় করেছেন। এবং তিনি যেমন মানুষকে ভালবেসেছেন, মানুষও তেমনি তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসাই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার, তাঁর জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন। তাই কবিরাজ মশাই যখন তাঁকে সূচিকা-ভরণ দিতে উদ্যত, তখন তিনি বাকরুদ্ধ হলেও মনে মনে বলেন: 'তোমাদের সকলের ভালবাসাই আমার সবচেয়ে সূচিকাভরণ···আমার আর সূচিকাভরণে দরকার নেই, বাবা।' বিভূতিভূষণেরও এই একই কথা। তবে আজ আধুনিক মানুষের কাছে বিভূতিভূষণের এই দিব্য উপলব্ধি অনেক দূরের, এমন কি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে নির্জন মুহূর্তে বিভূতিভূষণের এই অলৌকিক, অবিশ্বাস্য জগৎ আমাদের যে ভয়ংকরভাবে আকর্ষণ করে তা অস্বীকার করতে পারি না। এবং শুধু তাই নয়, সেই জগতের অধিবাসী হতেও আমাদের ইচ্ছে হয়। তাই বিভূতিভূষণের এই জগত যেন কিছুতেই মলিন হয়না, পুরনো হয়ে যায় না। সুন্দর স্বপ্নের মত সজীব থেকে যায়। আর এখানেই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠত্ব।

সুরজিৎ ঘোষ

অভিনয় শিল্প : সত্যের সুন্দর সন্ধান

'চাক-ভাঙ্গা মধু' নাটকে বিভাস চক্রবর্তী যখন সাফাই গাইতে গিয়ে ভাঙা গলায় বাষ্প ছড়িয়ে বলেন "আমরা তো সেই সব দুঃখের কথাই বলিয়ে নাতিনী… আমরা তো সেইসব বেদনার কথাই বলি" তখন দ্বিতীয় বার দুঃখের পরিবর্তে বেদনা শব্দটির বিশিষ্ট উচ্চারণে ঐ আপাততুচ্ছ সংলাপ বা অভিনয়অংশটি যে গভীর মূল্যে মূল্যবান হয়ে ওঠে তাকে বোধহয় একমাত্র তুলনা করা যায় স্বাভাবিকের পর্দা ভেদ ক'রে অন্তরের লীলার উদ্ঘাটনের সঙ্গে। সাফাই কি আর তখন কেবল সাফাই থাকে,নাকি নিজের বানানো কথায় নিজেই কোন অদৃশ্য ক্ষতে খোঁচা খান শিল্পী আর তাঁর কুঁজো হয়ে জীবনযাপন, মুখের চটুল খেউড়, ছোট হয়ে আসা চোখের জমাট কান্নায় বদলে যায়, মঞ্চের উপর কয়েক মুহূর্তের জন্য দুঃখরা বেদনা হয়ে যায়। 'অভিনয়ের সত্য' আমার কাছে এই রকম। মূলত তা চরিত্রগুলির সর্বাঙ্গীন উপস্থিতির অন্তর্ভেদী দ্যোতনায় কিন্তু স্বভাবতই বিশেষ বিশেষ নাট্য মুহূর্তে বজ্রাহত গাছের মতো নিষ্কম্প, ধ্রুব।

বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক ততটাই যতটা কাদামাটি আর রঙের সঙ্গে প্রতিমার সম্পর্ক। শিল্পকে হয়ে ওঠার জন্যে নির্ভর করতে হয় তার **মাধ্যম উপাদান** এবং **প্রবণতার** উপরে যার সব কিছুই এক অর্থে লৌকিক অর্জন। কিন্তু এই সব থেকে উদ্ভূত শিল্প আসলে এর অনেক উপরে, উত্তীর্ণ হবার দাবী রাখে কোন লোকোত্তর বিমূর্তিতে। মাটির সত্য তার গঠিত হওয়ার মত কোমলতা, নির্মাণের সত্য তার ছন্দোময় শৃঙ্খলা, আর রঙ লাগানোর সত্য তাকে বোঝানোর ভঙ্গী ; কিন্তুপ্রতিমার সত্য এরকোনটাই নয়—তাকে ঈশ্বর হয়ে উঠতে হয়,প্রেমের অথবা পূজার। এই হয়ে ওঠা, অথবা কখনো বানিয়ে তোলাই শিল্প যদিও তার ভিত্তি বাস্তব পরিমণ্ডলেই প্রোথিত। ফলে তার সত্য বাস্তব সত্যের কোন নিহিত নির্যাস, যেখানে সারাজীবনের দুঃখকে কয়েকটি মুহূর্তের শরীরে বেদনার মত ঘন ক'রে বিন্যস্ত করতে হয়।

পূর্ববর্নিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে তাদের মাত্রার প্রভেদে এক শিল্পের সত্যও আর এক শিল্পের সত্য থেকে পৃথক হয়ে ওঠে।

শিল্পের সত্য বলতে আমি তার উপস্থাপনা এবং বিষয় দুয়েরই নিবিড়তম সত্য রূপটির কথা বলছি। ফলে এ নিবন্ধের শিরোনাম 'অভিনয়ের সত্য' অথবা 'সত্য অভিনয়' যে কোন একটি রাখলেই তা একই অভীপ্সার পরিপূরক হবে এটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। তবে অভিনয়শিল্পের সত্য উজ্জীবনের আগে আমাদের একটা পুরনো অথচ মৌল তর্ক বিস্তারিত ভাবে সেরে নেওয়া দরকার যে **অভিনয় আসলে কোন শিল্প কিনা**। অভিনয়ের সত্যের যোগ্যতাকে আমি শিল্পিত মাপকাঠিতেই বিচার করেছি, ফলে অভিনয়কে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এই আলোচনার ভূমিকা না হয়ে প্রথম প্রামাণ্য বিষয়েরই মর্যাদা পাবে ব'লে আশা করি।

অভিনয়শিল্প

অভিনয়শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের বহুবার এই অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে যে শিল্পীর জন্য চিহ্নিত কোন সম্মানের অংশীদার তাঁরা হতে পারবেন কিনা। বিখ্যাত অভিনেতা ককলাঁ (Coquelin) বহুবার এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রতিবেদনে তিনি অভিনেতাকে শিল্পী হিসেবে লেখক, চিত্রকর বা ভাস্করের সমান আসনেই বসাতে চেয়েছেন। সে সময় পর্যন্ত কোন অভিনেতাই 'coveted cross'-এ ভূষিত হননি, অবশ্য Re´gnier মঞ্চত্যাগ ক'রে কনজার্ভেটরীর শিক্ষকপদে বৃত হলে সেই সম্মান পান। যে সংস্কারের বিরুদ্ধে ককলাঁর আবেদন ছিল, ১৮৮২ সালে তার অচলায়তন কিছুটা ভাঙে এবং তারপর থেকে অনুরূপ সম্মানে অভিনয়-শিল্পীরাও ভূষিত হয়ে এসেছেন যদিও ককলাঁ সে পুরস্কার কখনও নেননি, না হলে মনে হতে পারতো যে তিনি ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থে লড়ছেন। তাঁর এবং তাঁর মতো অনেকেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিনয়কলার শিল্প হিসেবে মর্যাদালাভ। বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা তালমা (Talma)-র একটি অসাধারণ অভিনয়দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ককলাঁ তাই আর্তনাদ করেন·· ···'And you tell me that this is not art? Pray, tell me what it is, then'। অথচ সেদিনও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপলিনকে সম্মান জানাতে গেলে ট্রেভর্ রোপার-এর আপত্তি সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

অভিনয়কে যাঁরা শিল্প হিসেবে স্বীকার করেন না তাঁদের সমস্ত যুক্তির সারমর্ম সূত্রাকারে বিন্যস্ত ক'রলে তা এইরকম দাঁড়ায় :

(ক) অভিনেতার প্রকাশের মাধ্যম তাঁর জীবন্ত দেহ যা সম্পূর্ণত তাঁর চিন্তা-নিয়ন্ত্রিত নয় বরং অধিক পরিমাণে অন্ধ ভাবাবেগের বশবর্তী। নিস্প্রাণ বস্তুর (যেমন ভাস্করের মাটি, চিত্রকরের তুলি) উপরে মানুষের সচেতন পূর্ব-নিয়ন্ত্রণই শিল্পসৃষ্টি করতে পারে, যে কর্তৃত্ব অভিনেতার নিজের দেহের উপর নেই। অবচেতন ভাবের খেয়ালে নিজের দেহ ব্যবহার করেন ব'লে অভিনেতা শিল্পী নন। (গর্ডন ক্রেগের মন্তব্য)

(খ) অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য হতে গেলে জীবনের নিছক অনুকরণ করতে হয়। এই সূত্রে অভিনেতা মাছিমারা কেরানী ভিন্ন কিছু নন। কারণ জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোন গভীরতর বোধ বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার সুযোগ অভিনেতার নেই। এ-প্রসঙ্গেও গর্ডন ক্রেগের একটি উক্তি লক্ষ্য করা যায় যেখানে অভিনয়ের শিল্পত্ব অস্বীকার করবার জন্য তিনি বলেন 'The actor looks upon life as a photo-machine looks upon life ; and he attempts to make a picture to rival a photograph'.

(গ) নাট্যকর্মে পরিচালকের চিন্তাই সকল রকম ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে—সে ক্ষেত্রে কর্মীর নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনেতার শিল্পীসত্তার বিকাশের স্থান থাকে না।

(ঘ) যে চরিত্র-চিত্রণ অভিনেতার দায়িত্ব তা মূলত সৃষ্ট নাট্যকারের কল্পনা থেকে, অন্যের কল্পনাকে কণ্ঠে বা শরীরে রূপ দেওয়ার মধ্যে কোন শিল্প-গুণ নেই।

(ঙ) অভিনেতা তাঁর সৃষ্ট কোন কিছু, মূলত যা মুহূর্ত-সমষ্টি, মৃত্যুর পরে পিছনে রেখে যেতে পারেননা—এখানেই অভিনয়ের শিল্প হয়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা।

উপরের এই সব সমালোচনার প্রথম প্রতিজ্ঞা দু'টি নিদারুণভাবে ভ্রান্ত। এ-গুলি কেবল তাঁদের দ্বারাই উচ্চারণ সম্ভব ব'লে মনে হয় যাদের অভিনয় করা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু এই দলে গর্ডন ক্রেগ্ জাতীয় সমালোচক-রাও পড়েন ব'লেই এ অভিযোগেরও উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে। প্রথমত,

শিল্পপ্রসঙ্গে সচেতন অবচেতনের তর্ক একান্ত পরিমাণে পুঁথিগত এবং প্রকৃত-পক্ষে অবচেতনের প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে এড়ানো অসম্ভব—অবাঞ্ছিতও বটে। তবে তাকে নির্দিষ্ট শিল্পরূপ দিতে গেলে সচেতন বিন্যাস প্রয়োজন এবং নিতান্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই শুধু বলতে পারেন যে অভিনেতার দেহের উপরে তাঁর শিল্পী-মনের সচেতন প্রভুত্ব থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অভিনেতার ভিতরে সর্বদাই একটা দ্বৈত সত্তা কাজ করে। স্ব-দেহই তাঁর শিল্পের প্রকাশ-মাধ্যম হওয়ায় তাঁকে প্রতিনিয়তই একটি দুরূহ কাজ করতে হয়—নিজের সত্তার দ্বিধাকরণ। তাঁর প্রথম সত্তা যন্ত্রী, দ্বিতীয় সত্তা যন্ত্র। প্রথম সত্তা দিয়ে তিনি নিজেকে **অভিনেয় চরিত্রটির মতো ক'রে বোঝেন** এবং দ্বিতীয় সত্তা দিয়ে সেই বোধকেই প্রকাশ করেন।

এক অর্থে প্রথমটিই সত্তা, যে দেখে, সে প্রভু এবং দ্বিতীয়টি দেহ, যে প্রকাশ করে, সে ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাস প্রভুর যত বাধ্যের প্রভু তত তাকে দিয়ে আরব্ধ কাজটি করিয়ে নিতে পারেন। ভাবাবেগ নয়, এই তীব্র অনুভব এবং বোধশক্তির সচেতন কর্তৃত্বই অভিনেতার স্ব-দেহকে চালনা করে। উপরন্তু প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে ঠিক ঠিক হুকুম তাকে দিয়ে তামিল করানোর জন্য সেই দেহকে নিপুণভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হয়—কক্লাঁ যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'The ideal would be that the second self, the body, should be a soft mass of sculptor's clay, capable of assuming at will any form·· ······' এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ অভিনেতার সচেতন এবং পূর্ণ মনোযোগী দেহ ও মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বিষয়ে স্তানিস্লাভস্কি একবার বলেছেন যে মেথড্ অভিনেতাদের অভিনয় রীতির বিষয়ে সামান্য উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন সেই আর্যবাক্য :

> প্রত্যেক অভিনেতা তাঁর অঙ্গভঙ্গীকে এমন ভাবে সংযত করবেন যে তারা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, তিনি তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না।

এই সংযমের তারতম্যেই অভিনয় পরিণত হয় অতি অভিনয়ে অথবা পর্যবসিত হয় আড়ষ্টতায়। তবে প্রকৃত অভিনেতার যে এই সংযমক্ষমতা পূর্ণমাত্রাতেই থাকে তা তো বারংবারই দেখা গেছে। প্রসঙ্গত আমার নিজের দেখা একটি অভিনয়রজনীর কথা মনে পড়ছে। বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউস'

—একটি তীব্র উত্তেজনাবিদ্ধ মুহূর্তে শম্ভু মিত্রের আপ্লুত অভিনয়ের মধ্যে হঠাৎ লোড্-শেডিং হয়ে গেল। ব্যবস্থাপত্র করতে মিনিট পনেরো কেটে গেল। পর্দা আবার সরতেই একই ভঙ্গিমায় ন্যস্ত শম্ভুবাবু স্বরগ্রামের একই স্কেল থেকে এবং একেবারে খণ্ডিত অংশটির প্রাণকেন্দ্র থেকে অভিনয় শুরু করলেন—যেন এর মধ্যে কোন সময়ের ফাঁক ছিল না, কোন ঘটনার এলোমেলো ধাক্কা ছিল না। একি স্ব-দেহের (এবং অনুভূতিরও) উপরে সচেতন প্রভুত্ব ব্যতিরেকে সম্ভব? Max Reinhardt অভিনেতাকে তাই ভাস্করের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'The actor's power of self suggestion is so great that he can bring out in his body not only inner and psychological change, but even outer and physical changes'। মনে রাখতে হবে চিত্রকর বা ভাস্কর যখন তাঁর মানস-অবয়বকে আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে নির্মাণ করতে পারেন তখনই তাঁর সৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁর কাজ শেষ। কিন্তু অভিনেতাকে তাঁর নিজেরই তৈরী মূর্তির ভেতর ঢুকে পড়তে হয়, তার সাথে সাথে হাঁটতে হয়, কথা বলতে হয়, হাসতে হয়, কাঁদতে হয়, এবং সেটা ঐ ছবির ফ্রেমের ভেতরে থেকেই—সেই ফ্রেম হলো মঞ্চ। অভিনেতার শিল্প-মাধ্যমের উপর তাঁর আত্মকর্তৃত্ব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের স্বোপার্জিত প্রত্যয়কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে তাই বলা চলে না যে অভিনেতা নিজের ভাবাবেগ বা দৈবের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আর শুধুমাত্র মাধ্যমের বিচারে শিল্পত্বের বিচার হয় না। নিজের দেহ শিল্প-মাধ্যম হতে না পারলে নৃত্য এমনকি সঙ্গীতও এক অর্থে শিল্পত্বের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর যদি সুরকার বা নৃত্য-উদ্ভাবককেই কেবল সঙ্গীত বা নৃত্যের ক্ষেত্রে শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হয়, সঙ্গীতের বা নৃত্যের সুন্দর বা কুৎসিৎ উপস্থাপনাকে কেবলই গুলিয়ে ফেলা হয় যন্ত্রের পটুতা বা অপটুতার সঙ্গে তবে দুঃখের সঙ্গে সে জাতীয় সমালোচকদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে কারিগর শিল্পী নন ঠিকই কিন্তু শিল্পীমাত্রেরই একটি কুশলী মিস্ত্রী-সত্তা থাকা প্রয়োজন। তবে কেবল সেই সত্তাটুকুকে বিচার করেই যদি কেউ তার শিল্পীত্ব অস্বীকার করতে চান তবে তাহবে সঙ্কীর্ণতারই নামান্তর। শ্রেষ্ঠ গায়ক, নৃত্যশিল্পী বা অভিনেতা ব্যাকরণের মধ্যে থেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রের সাধারণদের তুলনায় যে ভিন্নতা প্রকাশ করেন তা শুধু কুশলতা-

ভিত্তিক নয়, সে প্রভেদ কিছু ভিন্ন জাতের, সৃষ্টির ছোঁয়া লেগে থাকে তা'তে। ভারতীয় রাগসংগীত ও নৃত্যকলার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে ভাব ও রসের বিভিন্নতা কি ভাবে শিল্পীর কণ্ঠে বা শরীরে নিজস্ব শিল্পচিন্তায় সুনিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতীয় নৃত্যকলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মুদ্রার বা ভঙ্গীর সাহায্যে যে সব ভাব বা রসসৃষ্টি হয় তাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘটে আকার, তাৎপর্য বা গতি-প্রকৃতির বিভিন্নতায়—নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরত যার জন্য পুরোপুরি অভি-নেতার ব্যক্তিগত বিচারে নির্ভরশীল। লক্ষ্যনীয়, আমরা 'বিচার' শব্দটি ব্যবহার করছি কারণ এই সূক্ষ্ম পার্থক্য তাঁর সচেতন বোধেরই প্রতিফলন, ভাবাবেগের নয়। আর অভিনয় মূলত নিজ-শরীরে নৃত্য, সঙ্গীত এমনকি ভাস্কর্যেরও প্রকাশ—তাই সমষ্টিগত প্রাচ্য নৃত্যের ইঙ্গিত অবলম্বন ক'রে 'আরতো' উদ্ভাবন করেন নতুন নাট্যশৈলী, 'থিয়েটার অব্ ক্রুয়েল্টি'। আসলে অভিনেতা শরীরকে ভাষা দেন, মুখের ভাষার ব্যবহৃত বিবর্ণ প্রতিলিপি যেখানে পৌছয় না সেখানে দেহের অনেক সদ্য-আবিস্কৃত ভাষা পৌছে যায়, কারণ তুলনায় অনধিগত সেই ভাষা স্বচ্ছল ব্যবহারে পাণ্ডুর হয় না।

পূর্বোক্ত সমালোচনাগুলির দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে আমার মূল আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক দুই মেরুতে অবস্থিত দু'টি নক্ষত্রের মতো সুদূর। অভিনেতা বাস্তবের ফটোগ্রাফ্ মঞ্চে পরিবেষণ করেন বা সেটাই তাঁর জীবনদর্শন একথা মান-বার মত কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। আর শিল্পের সঙ্গে বাস্তব কতটা অন্বিত—এ প্রশ্নের কোন শেষ জবাব কি কেউ পেয়েছেন? শুধুমাত্র বাস্তব-বর্জিত হওয়াই কি শিল্পের প্রধান লক্ষণ নাকি? অথবা বাস্তবের ছোঁয়া লাগায় গর্কির "মা" শিল্পগুণ থেকে বিচ্যুত? আসলে এই মাপকাঠিগুলোই ভুল দোকান থেকে কেনা, ভুলভাবে। কোথায় ব্যবহার করব না জেনেই তাদের ঘরে আনা হয়েছিল; এখন তাই যত্র তত্র লাগিয়ে দেওয়া। আসলে বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া নয়, নিছক বাস্তব থেকে উত্তীর্ণ হওয়াই শিল্পকর্ম; অভিনেতাও তাই করেন। যে-কোন শিল্পের মাধ্যম, উপাদান আর প্রবণতা সবই তো বাস্তব কেবল সব মিলিয়ে প্রকাশিত যে সৃষ্টি তা বাস্তব হয়েও বাস্তবোত্তীর্ণ। তবে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়, কেন না প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা প্রকৃতি-প্লাবী শিল্পের জন্মদানের যন্ত্রণাও প্রকৃতিসৃষ্ট এবং শেষ অবধি সেই সৃষ্টিকাণ্ডও প্রকৃতিতেই ন্যস্ত। তবে অভি-

নেতা যে মঞ্চে এসে শুধু চারপাশের দৈনন্দিন জগতের খবর দেন না, বা 'আপনি কি ফুল ভালবাসেন' জাতীয় স্বাভাবিক প্রশ্ন সহজভাবে ক'রে দেখান না, সে বিষয়ে যে কোন হৃদয়বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি একমত হবেন। আসলে জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই অভিনেতা তাঁর অভিনীত চরিত্রের মধ্যে ধারণ করবার চেষ্টা করেন। বাস্তবে ঐ চরিত্ররা কিভাবে চলাফেরা করে বা তিনি ঐ পরিস্থিতিতে থাকলে কি ক'রতেন তার প্রকাশই তো শুধু আর অভিনয় নয়। অর্থাৎ পুতুল হওয়া নয়, পুতুলের খোলশ গায়ে দিয়ে নিজের সচেতন খেলা যার মধ্যে পুতুল হিসেবে বিশ্বাস-যোগ্যতা আর মানুষের দৃষ্টি-ক্ষমতা দুই-ই থাকবে—মানে আত্মবিলোপ নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ; জীবনের প্রতিলিপি নয়, সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার প্রধান প্রয়োজনীয় (পরিবেশের দাবী অনুযায়ী) বৈশিষ্টগুলিতে এমনভাবে আলো ফেলা যাতে তাদের নিজস্ব রঙ বিশেষ তাৎপর্য পায়, যে তাৎপর্যে আকাশ আর পাহাড়, ধরিত্রী আর সমুদ্র, ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে এক অপরিহার্য যোগ-সূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আলো প্রক্ষেপের ক্ষমতাই অভিনেতাকে সামান্য নকল-নবীশ থেকে এমন এক শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত করে যে আমরা আরও গভীর ও প্রবল ভাবে তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

নির্দেশক বা নাট্যকারের হাতের পুতুল অভিনেতার স্বতন্ত্র শিল্পী-সত্তার উন্মেষ হ'তে পারে না—এই দু'টি সূত্রই অভিনয়ের শিল্পত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো অভিযোগ। সেই প্রসঙ্গে আবার বলতে হয় যে অভিনেতার ভিতরের কারিগরটুকুই সব নয়, স্রষ্টার ভূমিকাও বিরাট। জীবন সম্পর্কে কোন না কোন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করা যদি অভিনয় হয় তবে প্রখর কল্পনা-শক্তির অভাব ঘটলে অভিনেতা নির্দেশকের পুতুল হবেনই। কিন্তু যিনি ভাবতে জানেন? তিনিই কেবল ভাবাতে জানেন বা পারেন সাদা-সাপ্টা পর্দা চকিতে খুলে দিয়ে ভিতরের অপূর্ব সংগ্রহ দেখাতে। এই কল্পনাশক্তিকে চরিত্রচিত্রণে অবশ্য যেমন তেমন ক'রে কাজে লাগানো যায় না, তার জন্য প্রয়োজন স্তানিস্লাভস্কি-বর্ণিত "Triumvirate"-এর, "feeling" "will" এবং "mind"-এর সমন্বয়ে যা গঠিত। ইচ্ছাশক্তি ব্যতিরেকে অভিনেতা পরিচালকের হাতের পুতুল হ'তে পারেন, নচেৎ নয়। আর feeling এবং mind-কে মেশাতে হবে বড় সন্তর্পণে যাতে এই সম্পূর্ণ

ভারসাম্য বজায় থাকে। এই মতের সমর্থন শুধু স্তানিস্লাভ্স্কি নয়, আর-উইন পিস্কাতর-এর কথায়ও পাওয়া যায় :

"In this unity of reason and emotions, of spirituality and affection and sensation—the actor will discover his creative genius for the stage—the art of acting."

যদিও ঐ sensation-এর ব্যাপারে আপত্তি আছে দিদেরো (Diderot) -র বা কক্‌ল্যাঁর, আবার হেনরী আরভিং বা সালভিনির মতে feeling-ই অভিনয়ের প্রধান স্থান জুড়ে আছে। আমার নিজস্ব ধারণা, অভিনেতার হৃদয় ও বোধের সুষম বিন্যাস প্রখর কল্পনাশক্তির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তাড়িত হলেই তাঁর পক্ষে সার্থক সত্য অভিনয় করা সম্ভব, নতুবা নয়। সেই অভিনয় নির্দেশকের এবং নাট্যকারের জলন্ত উপস্থিতিতেও স্বতন্ত্র স্বাধীন শিল্প। তবে স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার নয়। একটি নাটকে অনেক চরিত্র, তার উপর আছে অনেক রকম যান্ত্রিক যোগবিয়োগ যার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা থাকে পরিচালকের মাথায়। মনে রাখতে হবে যে নির্দেশকের ব্যবহৃত উপাদানগুলির মধ্যে একটি প্রচণ্ড মানবিক, সেটি অভিনেতা যিনি ভাবতেও জানেন। সম্পূর্ণ মাঠের স্বত্বে পরিচালক বিভিন্ন সত্তার সীমানা নির্দেশ ক'রে দেন, স্বক্ষেত্রে সেই সত্তার সত্য এবং প্রকৃত উজ্জীবনই অভিনেতার শিল্প। নিয়ন্ত্রণাধীন থেকেও স্বকীয় শিল্পের বিকাশই তাঁর আর্ট-ফর্মের প্রধান দায়িত্ব। আর নাট্যকার—তাঁর সঙ্গে অভিনেতার কোন্ সম্পর্ক? সেখানেও তো ঐ "অধীনতা—স্বাধীনতা"র প্রশ্ন। যে চরিত্রটি মঞ্চের উপর সৃষ্টি করা অভিনেতার শিল্প-দায়িত্ব, তার মূল সৃজন তো নাট্যকারের কল্পনা থেকে। নাটকের পরিবেশ ও সংলাপও তো নাট্যকারেরই সৃষ্টি। তাহ'লে অভিনেতার শিল্পী-সত্তার প্রকাশ কোথায়? প্রত্যেক শিল্প-মাধ্যমই এমন একটা প্রকাশ ভঙ্গীর বা সম্পূর্ণতার দাবী রাখে যা অন্য আর কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অভিনেতাও সেই রকম তাঁর আঙ্গিক বা বাচিক ভঙ্গীর সাহায্যে বা তাঁর সত্তার প্রতিফলনে, নিজস্ব অভিক্ষেপণে এমন মুহূর্ত বা সংহতি সৃষ্টি ক'রতে পারেন যা কেবলমাত্র নাট্যকারের লেখায় প্রকাশ পায় না এবং সেই কারণেই অভিনয় একটি স্বতন্ত্র শিল্প। শুনেছি "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল"

—এই সংলাপটি গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু এবং শিশিরবাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আবেগে ব্যক্ত করতেন—কিন্তু তাঁদের ঐ সূক্ষ্ম জটিল প্রভেদটা যে কী তা নিছক সংলাপটিকে লক্ষবার পড়লেও বোঝা যায় না। অথবা 'দশচক্র' নাটকে শম্ভুবাবু যে ভাবে 'মেজরিটি' শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে এক জটিল আবেগ-প্রবাহ সৃষ্টি ক'রতেন তা যাঁরা দেখেননি, তাঁদের কি ভাবে বোঝাই? ভাষাকে ছাড়িয়ে এই উত্তরণ এবং তার ব্যবহারই অভিনয়শিল্পের একটি মহৎ লক্ষণ। কিংবা 'রক্তকরবী' নাটকে বেদীর উপরে দাঁড়ানো সর্দারের ভঙ্গী এবং বিভিন্ন স্তরের চরিত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গীমার সামান্য রদবদলে অমর গাঙ্গুলী স্পষ্ট ক'রে দিতেন তাঁর সর্দারের বিচিত্র ডাইমেন্‌শান্‌গুলিকে—এগুলো তো নাটকটা কেবল প'ড়ে বোঝবার নয়। আবার একই চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা / অভিনেত্রীর সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ পেয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক। এই তফাতের কারণ শিল্পীর অন্তস্থিত গভীর সত্তার উপলব্ধির বিভিন্নতা, যার ফলে একই প্রাকৃতিক জগৎ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর চোখে ভিন্ন রূপাবয়ব ধারণ করে। আসল কথা ঐ সম্পূর্ণতা, শিল্পের প্রধান কথা ঐ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। তার জন্য নাট্যকারের প্রয়োজন হয় অভিনেতা বা নির্দেশককে তেমনি অভিনেতারও প্রয়োজন হয় নির্দেশক বা নাট্যকারের যেমন নির্দেশকের প্রয়োজন নাট্যকার, অভিনেতা প্রভৃতির। অর্থাৎ এঁরা নিজেরাই কখনো শিল্পী, কখনো বা উপকরণ। এই সমষ্টিগত শিল্প-মাধ্যমের ভেতরেও নির্জন সৃষ্টি-মুহূর্তে একাকী হন শিল্পী-অভিনেতা—কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে কোথাও সেই বৈশিষ্ট্য ছন্দ-চ্যুতি ঘটায় না—এই অখণ্ডতাই অভি-নয়ের শিল্পগত উৎকর্ষতার বিচার। অর্থাৎ কাঠামোটা নাট্যকারের, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিকল্পনা নির্দেশকের আর সূক্ষ্মসব রঙের কাজ অভিনেতার। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ এবং বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি অভি-নেতাকেই প্রকৃত শিল্পী বলেন যাঁর কাছে তাঁর প্রত্যাশা অপরিসীম এবং শিল্পী বলেই সে দাবী মেটানো অভিনেতার পক্ষে সম্ভব (it demands too much of the actor, but then it is the actor who is a true artist Stanislavsky had in mind. And one can never demand too much from an artist—David Magarshack : Stanislavsky on The Art

of the Stage)। সেইজন্যই বারবেজকে মনে রেখে শেক্সপীয়র নাটক লিখেছেন। অভিনেতার বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সৃষ্টি হয়েছে King Lear's fool-এর, ফোর্বস-রবার্টসনের জন্য বার্ণাড্‌শ লিখেছেন তাঁর 'সীজার ও ক্লিওপ্যাট্রা' নাটক, হেলেনে হ্বাইগেল্‌কে মনে রেখে যেমন অসংখ্যবার ব্রেশ্‌ট্‌। আবার ইংলণ্ডে যখন নাট্যকারের অভাব তখনো শেক্সপীয়রের নতুনতর প্রযোজনার ভিতর দিয়ে মুক্তি লাভ ক'রেছেন বিখ্যাত অভিনেতারা। আসলে পরস্পরের শিল্পকর্মের সম্পূর্ণতা ও অপরিহার্যতার বোধই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বা নির্দেশককে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সাহায্য করেছে।

একটি সৃষ্টিকর্মকে অতিক্রম বা বিকৃত না করেই তাই অভিনেতা আর একটি শিল্পত্বে উত্তীর্ণ হতে পারেন, পূর্বতনটিকে কেবল উপকরণের মতো রেখে। সমষ্টিগত নাট্য-শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অভিনয়ের শিল্প-গরিমা প্রসঙ্গে আরও একপা অগ্রসর হয়ে Max Reinhardt বলেছেন "It is to the actor and to no one else that the theatre belongs" যে মতের সমর্থন পাওয়া যায় গ্রেন্‌ভিল্‌ বার্কারেও। আমি অবশ্য আমার ব্যবহৃত পূর্বতন গাঢ় বাক্য-বস্তুটিতেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসী। আসলে প্রকৃতির সৃষ্টি-রহস্যের নিয়ন্ত্রণে থেকেও তো বিভিন্ন সত্তা স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি ক'রে থাকে। প্রকৃতির অখণ্ড harmony তা'তে নষ্ট হয় না। আবার তার কোলে ন্যস্ত থেকেও মানুষের সৃষ্টি 'দ্বিতীয় ভুবন রচনার' গৌরব পায়—নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও এই যে স্বতন্ত্র নির্মাণ, হয়ে ওঠা, তাকেই যদি আলোচ্য মাত্রায় দেখি নিয়ন্ত্রণাধীন অভিনেতার শিল্পী-সত্তার স্ফুরণে, তবে পরিচালক ও নাট্যকারের প্রকৃত সার্থক উপস্থিতিতেও একজন সত্য অভিনেতার শিল্পীত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সবশেষে আসে স্থায়ীত্বের প্রশ্ন, পিছনে রেখে যাওয়ার প্রশ্ন। কিন্তু সেটা কি কোন প্রশ্ন? স্থায়িত্বের বিচারে কি খারিজ ক'রে দেওয়া যায় কোন সৃষ্টি, যদি বা সে হয় কয়েক মুহূর্তের! সমস্ত শিল্পকর্মই নশ্বর। কবিতা অথবা ছবি, সংগীত অথবা ভাস্কর্য কে তাড়াতাড়ি ঝরে? হায়, সে কেবল আগে-পরের কথা, কমবেশী একই নশ্বরতা। শিল্পসৃষ্টি এক জিনিষ, স্থায়িত্ব আর এক। কাগজের চেয়ে পাথরে লেখা টেঁকে বেশী, কিন্তু কতদিন? অনন্ত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবই একদিন লুপ্ত হয়। "আজ থেকে দুশো কোটি বছরের পরে, আমাদের সূর্য নিভে যাবে"—তখন?

শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ক্ষমতায় অভিনেতাও পিছনে কিছু রেখে যান—তাঁর রীতিপ্রকরণ এবং সত্য মুহূর্তের স্মৃতি। স্মৃতি হয়ত কখনো-কখনো উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়। কিন্তু শেষ অবধি সেই এক অমোঘ বিচারক। আজ যদি প্রাকৃতিক খেয়ালে নষ্ট হয়ে যায় অজন্তার সব ভাস্কর্য তবে কি তার শিল্পত্ব মুছে যাবে? যতদিন বাঁচি মনে থাকবেনা তার স্মৃতি, তাকে দেখার অভিজ্ঞতা?

কক্‌লাঁ্যা সখেদে বলেছেন:

> "Suppose that, as the result of a natural and fatal law, at the moment that Michelangelo died, by the same stroke of an invisible hammer, death had reduced to powder all his works, from the Moses to the Last Judgement: because the work and the workman perished at the same instant should you say, "Michelangelo was no artist, he did not create?"

অভিনেতার সৃষ্ট অবয়ব বা মুহূর্তও তাঁর সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, এ তাঁর শিল্প-মাধ্যমের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিক। কিন্তু এ কেবল দুর্ভাগ্য, শিল্প হিসেবে কোন স্তরচ্যুতি নয়।

কবি অথবা চিত্রকর অপেক্ষা করতে পারেন ভাবীকালের জন্য যে তাঁর সত্যের রূপ উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হবে, অভিনেতা সেটুকুও পারেন না। সমসাময়িককে তাঁর আন্দোলিত করতে হবেই, সত্যের শুদ্ধতায় দর্শককে উন্নীত করার দায় তাঁর এই মুহূর্তেই। বহমান সময়স্রোতের একটি মুহূর্তের মধ্যে চিরন্তন সময়কে ধারণ করবার এবং করাবার কঠিন মূল্য অভিনেতাকেই শোধ করতে হয়, এই তাঁর নিয়তি। তাঁর এই ভাগ্যলিপির স্মরণে আমরা দুঃখার্ত হই যত, তত বেশী ভালবাসি তাঁকে আর সময়-সাগরের পার থেকে ভেসে আসা সম্মিলিত দর্শকের গ্রহণে বিশাল এই অভিনন্দনের প্রতিধ্বনিই অভিনয়শিল্পকে অবিনশ্বর ক'রে তোলে।

সত্যের সন্ধানে

অভিনয় তা হলে একটি শিল্পকলা। তবে এ শিল্পের সত্য কোথায়? সমস্ত মহৎ শিল্পের মতোই তার সত্য **হয়ে ওঠায়**; সেইখানেই তার সার্থকতা। এই

শিল্প এক অখণ্ডতা, যেখানে সুন্দরের উপাদান অভিনেতার অবয়বে রূপ পরিগ্রহ করে আরও বড় কোন সত্যের প্রকাশলীলায়। এই রূপময় প্রতিন্যাস, এই গ'ড়ে তোলা বা হয়ে ওঠাই অভিনয়ের সত্য। কিন্তু কেমন ক'রে সম্ভব হবে সেই সামগ্রিক সত্য অভিনয়? তার জন্য অভিনেতাকে প্রস্তুত হতে হয় প্রতি-মুহূর্তে। অভিনেতার যন্ত্র তো তিনি নিজেই। কাজেই এই প্রস্তুতি যন্ত্র ও যন্ত্রী উভয়েরই যতক্ষণ না তিনি নিজেকে দিয়ে সম্পূর্ণ করছেন নিজেরই সৃষ্টিকর্ম। এঁর জন্য তার দ্বিতীয় সত্তা, ঐ যন্ত্রকে তাঁর মার্জনা ক'রতে হয়, গঠন ক'রতে হয় সত্য অনুভবকে, ধরবার কাজে। সে মার্জনা কণ্ঠের কৌশলে, শরীরচালনার অভিনবত্বে, নৃত্য-শিক্ষায় এবং ভাস্করের মত নিজের দেহকে নানান ভাঙ্‌চুরের ভেতর দিয়ে নানান রূপ দেওয়ায়। আর তাঁর দেখার চোখে অভিনেয় চরিত্রের একটা পূর্বনির্ণীত ধ্যানরূপ আঁকা থাকে যাকে বাইরে এনে দেখা এবং দেখানোই তাঁর কাজ। সেই সত্যের সৃজনে তিনি বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শুনতে খুব বড়ো বড়ো লাগছে? বড়োই তো, তবে ফাঁকা নয়। শিল্প-সত্যের realisation এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির স্বাভাবিক বিরাটত্বও তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। কারণ প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে ক্ষুদ্র মানবকের এ এক অপরিসীম চ্যালেঞ্জ—'দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার'। অভিনেতার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের তাগিদে বহিরঙ্গ ঘটনা বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। তাঁর শিল্পীসত্তা ব্যবহারিক সংগতিকে দুমড়ে-মুচড়ে নানান মাপে ফেলে দেয় যার বিভিন্ন বিন্যাসে সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেন্‌শনের। কোমলে-মধুরে মেশানো সেই প্রচণ্ড অভিনয় আমরা দেখেছি যখন 'আজ বসন্ত' নাটকে পার্কে চক্কর-খাওয়া আদ্যি-কালের বুড়ো হঠাৎ 'হ্যাম্‌লেট্‌' নাটকের কবর খোঁড়ার দৃশ্য চলে যান। কার জন্য, কেন এই কবর খোঁড়া! এই জটিলতা যখন তীব্র হ'য়ে ওঠে তখনই হঠাৎ চকিতে দেখা যায় অন্য এক বিজন ভট্টাচার্যকে যাঁর ঝাঁকানো চুলের রাশি শনের মত মাথার উপর থেকে দু'গালের পাশে ঝুলে পড়ে আর অদ্ভুত এক ভাঙা গলায় তিনি নিয়তির মত হঠাৎ উচ্চগ্রামে এক চিৎকার ক'রে ওঠেন :

> "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান
> মেঘবরণ তুঝ মেঘ জটাজুট………"

তখন আমরা সেই মরণ, তাঁর মেঘবরণ শ্যামরূপ, বিজন ভট্টাচার্য, পার্কের বুড়ো

এবং 'হ্যাম্‌লেট্' নাটকের কবর-খোঁড়া লোকটিকে এক শরীরে মূর্ত দেখতে পাই। এই সেই সত্য যাকে আমি বিধাতার অধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছি।

এই রূপবিন্যাস, এমন বিভিন্ন স্তরে, সম্ভব হয় শুধু তাঁরই পক্ষে যাঁর অভিজ্ঞতায় রয়েছে বহু বিচিত্র উপলব্ধির বোধ। অভিজ্ঞতা যার সীমিত, উপলব্ধির প্রয়াস যার কম, কল্পনার সীমা তার কতটুকু? বোধি তাকে, তাই বড় একটা সাহায্য করে না। অভিনেতাকে তাই শিক্ষিত হতে হয়। এই শিক্ষা শুধু তাঁর অন্তস্থ যন্ত্রের পরিশীলন নয়। এই শিক্ষার মাপজোক করা যায় না অভিনেতার বহিরঙ্গ-প্রকাশে। জীবনের অন্তর্লীন এই শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লে অভিনেতা বুঝতে পারেন জীবনের উপরিভাগের জলন্ত অস্তিত্বটাই সত্য নয়, সত্য তার ঘরের দিকের মুখ, ভেতরতলার অন্তর্গূঢ় টান। উপস্থিত সত্য থেকে নিহিত সত্যের বিচরণেই অভিনয়ের সত্য প্রকাশ; যার ব্যাপ্তি গভীরতার সঙ্গে অম্বিত, ফেনিল আবেগের উচ্ছ্বাসী স্বতোৎসার নয়। অভিনেতাকে তাই সৎ হতে হয়। এই সততা তাঁর অনুভবের কাছে, জীবনোপলব্ধির কাছে, তাঁর আত্মার কাছে, রসদৃষ্টির কাছে। না হলে কোন সার্থক রসসৃষ্টিও তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ তো কোন দৈব দুর্ঘটনা নয় যে তিনি অবস্থার চাপে প'ড়ে অভিনয় ক'রতে আসেন। এ তো সজ্ঞানে নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করা, যে আনন্দময় যন্ত্রণা-ভোগের মহৎ অধিকার শিল্পীকে শিল্পী ক'রে তোলে। জীবনের এবং নিজস্ব শিল্প-মাধ্যমের প্রতি এই সত্য-দৃষ্টিই তাঁকে তাঁর অভিনেয় চরিত্র বা পরিবেশের পক্ষে বিশ্বস্ত হ'য়ে উঠতে সাহায্য করে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত অভিনেতা তাই প্রথমেই জানেন :

ক) শিল্প বলতে তিনি কি বোঝেন? কেবল অন্যদের চেয়ে নিজের একটি সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য অর্জন নয়, যে সৃষ্টির বেদনা তাঁকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে তারই ব্যক্তিত্বময় প্রকাশ।

খ) কেন তিনি তাঁর মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন অভিনয়কে এবং কতটা কষ্ট তাঁকে স্বীকার করতে হ'তে পারে এই শিল্পের সত্যকে স্পর্শ করতে? তিনি ভালো ক'রেই জানেন যে তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎস একটাই, একটাই তাঁর পথ এবং সে আকাশের ধ্রুব নক্ষত্রও অনন্য—সে হ'ল নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। সুন্দর হ'য়ে বাঁচবার শ্রম, পৃথিবীতে এবং পৃথিবীরই জন্য; অথচ স্বভাবের স্তর

থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে, অর্থাৎ অনুভবের মধ্যে জীবনকে ধ'রে রেখেও জীবনের নিষ্প্রত্যয় প্রতিযোগিতার উর্ধ্বে থাকতে হবে তাঁকে।

গ) অভিনয়ের জন্য তাঁর ভালোবাসার তৃষ্ণা এতই তীব্র যে সেই জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তিকেই তিনি তাঁর ভালোবাসায় অতিক্রম ক'রতে পারবেন।

হ্যাঁ, ভালোবাসা! সমস্ত সৃষ্টিকর্মের মূলেই এই ভালোবাসা। তা কেবল মাধ্যমের জন্য নয়, বিষয়ের জন্য নয়—নিজের জন্যও। নিজেকে প্রকাশের আবেগ, হয়ে ওঠার তাড়নাই তো শিল্পের মূলে, না হ'লে তো প্রকৃতি-প্রেমে আত্মস্থ হয়েই কেবল বসে থাকা যেত, যদি সেটা নিজের সম্পূর্ণতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত না হতো। সম্পূর্ণতাই সত্য, সুন্দরের অঙ্গীকার। যতদিন বাঁচব, পৃথিবীর উপর, মঞ্চের উপর সুন্দর হ'য়ে বাঁচব, এই শুদ্ধ ভাবনাই অভিনেতাকে অভিনয়কর্মে নিমগ্ন করে। এই সুন্দর তো তখনই আসেন যখন সত্তা তার মূল থেকে উৎপাটিত না হয়েও নিছক জন্মের উত্তরাধিকারকে, যে কোন পূর্ব-নির্ণয়কে অতিক্রম ক'রতে পারেন। তাই যে অভিনয় অভিনেতার নিজস্ব আবেগকে ধারণ ক'রতে পারে না তা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয় না, সৎ হয় না। সত্তার এই শিল্পী-সুলভ তাগিদেই একই চরিত্র দু'জন মহৎ শিল্পীর হাতে দু'টি পৃথক সত্যরূপ পরিগ্রহ করেছে স্বদেশে এবং বিদেশে, যার পরিচিত নিদর্শনগুলি পাঠকের অবিদিত নেই, আশা রাখি। এই আপাত-অদ্ভুত অথচ শিল্পগত অর্থে স্বাভাবিক সংঘটন ঘটেছে শেক্‌সপীয়রের মতো একজন মহৎ নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রেও, যে শেক্‌সপীয়র নিজেও একটি চরিত্রকে বুঝতেন নটের চোখে এবং কেবলমাত্র নাট্যকারের চোখে নয়।

একটি সৎ চরিত্র-চিত্রণের জন্য, ঘন সার্থক মুহূর্তের অভিনেতাকে তাই কঠোর মনোযোগী হ'তে হয়, নির্মাণ ক'রতে হয় নিজের সৃষ্টির বৃত্ত। এই বৃত্তের ব্যাস যতো বড়ো হয় অভিনেতার কাজ তত সার্থক হয়ে ওঠে—অবশ্য এর মধ্যেই তাকে নিপুণ আয়াসে স্থির থাকতে হয় সেই বৃত্তের কেন্দ্রে। এই সৃজন-বৃত্ত অবশ্যই অভিনেতাকে এক অর্থে নিঃসঙ্গ ক'রে তোলে, কিন্তু সেটাই অভিপ্রেত। এই বিচ্ছিন্নকরণে, অভিনেতা নিজেই নিজেকে বাইরে থেকে এবং ভেতর থেকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। এই সময়ে তাঁর মনোসংযোগ

এত তীব্র হয় এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ মানসিক চেতনা এমন ভাবে বাঁধা থাকে যাতে শরীর ও মনের সমস্ত প্রয়োজনীয় স্নায়ু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, আলোকিত হয় এবং সবকিছু মিলে মিশে একটি লক্ষ্যেই ধাবিত হয় যেন একটিই ভাবনা তাঁর সমস্ত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে এক চৌম্বক আবেশে বিদ্ধ ক'রে রাখে। হৃদয়ের সঙ্গে বোধির ও ইচ্ছাশক্তির এই অনুপম নিবিড় যোগসূত্র রচিত হয় কেবলমাত্র অভিনেতার ভিতরকার আমিত্বের উপর তাঁর শ্রমলব্ধ অর্জিত স্মৃতির আশীর্বাদে। এই আমিত্বকেই নাট্যাচার্য স্তানিস্লাভ্স্কি বলেছেন 'Creative I'।

এই এক সুকঠিন পদ্ধতি। যে কোন হয়ে ওঠাই এক অর্থে এমনি কঠিন আবার এমন সহজও। তবে প্রকরণের কথা যখন এলোই তখন তার কথাই কিছুটা বলা যাক, বিশেষত এ-নিবন্ধে তার বাস্তব প্রয়োজন নিশ্চয়ই কারো কাছে অস্বীকৃত হবেনা। জীবনের বিন্যাসে জটিলতা যত বাড়ছে, ততই তফাৎ বেড়ে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের। মঞ্চের উপরে জীবনের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য আর হ'য়ে ওঠার প্রকাশের ভিতর দিয়ে অভিনেতাকে যে পুনর্জন্মের অঙ্গীকার নিতে হয়, সেই নির্মাণের তাই কোন সামান্য সূত্র আর থাকছে না। ফলে এই লোকটা ভিলেন অথবা ঐ লোকটা প্রেমিক, মঞ্চের উপরে এই কথাগুলো সহজেই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবার মত কোন প্রথাশ্রিত টেক্নিক্ তাই আর সত্য অর্থে টিকছে না। সত্য অনুভবের সৎ জীবনায়নই প্রকৃত অভিনেতার অন্বিষ্ট। এই সত্যকে তা'হলে মঞ্চে ধরা যাবে কোন্ পদ্ধতিতে ? কি হবে তা'হলে অভিনয়ের সত্য রূপ ? দোহাই, আমাকে স্বাভাবিক অভিনয়ের কথা বলবেন না। কোন শিল্পকলা কখনোই স্বাভাবিক হ'তে পারে না। স্বাভাবিক মনের রূপৈষণা, তার সম্পূর্ণ হওয়ার তাগিদের প্রতিফলনই শিল্প। ফলে স্বাভাবিক ঘটনা-প্রবাহের ভিতর থেকে কিছু তুলে কিছু ফেলে একটা ছন্দোময় মালা গেঁথে মঞ্চের উপরে তার যথাযথ দোলনটুকু ধ'রে রাখাই অভিনয়। সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণকেন্দ্রে অন্ধকার থেকে আলোয় আবার আলো থেকে অন্ধ জন্মরাত্রির পথে যে প্রচণ্ড জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে তার সম্পূর্ণতার আকাঙ্খা, সেই বেগকে শরীরে ধারণ করাই অভিনেতার দায়িত্ব। কিন্তু কেমন ক'রে তিনি বুঝলেন তাঁর জীবনকে, সেটা তাঁর অভিনয়ের সত্য নয়, জীবনবোধের সত্য। আর তাঁকে দেখে দর্শক

যখন সেই উপলব্ধিকেই আত্মস্থ ক'রতে পারলো সেটাই হ'য়ে উঠল তাঁর সত্য অভিনয়। অর্থাৎ ব্যক্তিক অনুভবের সততা রূপ পেলো এমন একটি উপযুক্ত মঞ্চকল্পে যে তা অধিগম্য এবং বিশ্বস্ত হ'য়ে উঠলো সবার কাছেই। অভিনেতার সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয় তখনই, যখন শিল্পসূত্রে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবের উপস্থিত সত্য থেকে নিহিত সত্যের বিচরণ সত্য অর্থে সঙ্গী ক'রে নেয় তাঁর দর্শককে। আত্মিক প্রকাশের সততার এই অনাত্মকরণই অন্যের কাছে তাঁকে গ্রহণীয় ক'রে তোলে। তাঁর সৃষ্টি সার্থক হয়। এ'রকম একটি দৃশ্যাভিনয় দেখেছিলাম 'আজ বসন্ত' নাটকে। নায়ক একটি মিথ্যাভাষণের মুহূর্তে ধরা পড়ার অপরাধবোধে সংকুচিত হয়ে দেখলেন নায়িকা যেন পাথরের দেয়াল। তিনি সেই দেয়ালের চারপাশে করাঘাত ক'রে ঘুরতে লাগলেন প্রবেশপথের সন্ধানে। হঠাৎ একটা দরজা উন্মুক্ত হ'তেই সামনে দেখলেন একটা আয়না যাতে তাঁরই মিথ্যাচারের মুখটা অমোঘ ফুটে র'য়েছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বিপন্ন পশুর মত আর্তনাদে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে। অবচেতনের এই সমস্ত প্রকাশটাই তিনি ধ'রে রাখলেন অসামান্য অভিনয়ের ইঙ্গিতে। নায়িকা মমতা চট্টোপাধ্যায় মুখে পাথর এঁকে অটুট দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁর চারপাশে ঘুরে-ঘুরে তাঁর নাম ধ'রে ডেকে ডেকে, যেন দেয়ালে করাঘাত ক'রে চললেন নায়ক (নাম মনে নেই), হঠাৎ কোন একটা দরজা খুলে গেল, মমতা চট্টোপাধ্যায় নায়কের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখ যেন আয়না হ'য়ে নায়কের মুখের কুৎসিত মিথ্যাচারের ছবি ফুটিয়ে তুলল যার যথার্থ রূপায়ণ আমরা মুহূর্তে দেখতে পেলাম নায়িকার চোখে চোখ-রাখা নায়কের মুখবিকৃতিতে আর হঠাৎ কুৎসিত একটা আর্তনাদ ক'রে নিজের পাপবোধের কাছে নিজেই অভিযুক্ত হয়ে তিনি পেছনে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ থেকে। অবচেতনের এই যে সচেতন প্রকাশ যা দেখানো হ'ল আভাসে—তা যেমন সম্পূর্ণ করল অভিনেতার হ'য়ে ওঠাকে, তেমনি তৃপ্ত ক'রল আমাদের বোধিকে যার উপর তিনি দিয়ে গেলেন ছবিটির রঙের মাত্রা হরণপূরণের ভার। উভয়ত এই আত্মোপলব্ধির আবিষ্কারই অভিনেতার শিল্পকে সত্য ক'রে তুলল।

এই সত্যের ধারণায় এবং প্রকাশে পৌছবার যে ক'টি মহান শিক্ষা এখন অবধি স্বীকৃত সেগুলির বিভিন্ন ধর্ম ও লক্ষণের বিচারে "Ronald Hayman"

অভিনয়-শিল্পীর ছ-রকম বিভাজন পদ্ধতি দেখিয়েছেন তাঁর "Techniques of Acting" বইতে।

(1) "Method" and technical.

(2) Creative and imitative.

(3) Straight and character.

(4) Actors who find the role in themselves and actors who find themselves in the role.

(5) Internal and external.

(6) Actors who start from the inside and work outwards and actors who start on the outside and work inwards.

এর প্রথম বিভাজন পদ্ধতিতে আমার আপত্তি আছে, কেননা 'Method' যা কিনা স্তানিস্লাভ্স্কি-নির্দেশিত পথের অনুসরণ, সেও এক অর্থে 'technique' যা ব্যবহৃত হয় অভিনেতার হৃদয় ও বোধির সংযম অনুশীলনে, নিমগ্ন সৃষ্টিকর্মের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে।

দ্বিতীয় বিভাজনটির সম্বন্ধে পূর্ব-প্রসঙ্গেই অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। বলা হয়েছে কী ক'রে অভিনেতা তাঁর অভিনেয় চরিত্রের টীকাকার হয়ে ওঠেন এবং এই সূত্রে আর একবার ঐ 'হয়ে ওঠেন' বাক্যবন্ধের ব্যবহার। যখন সংলাপ তুচ্ছ, সে সময়েও অভিনেতার বিশিষ্ট উচ্চারণ, দৈহিক ও বাচিক উদ্যম, তাঁর কাজকে অনুকৃতি থেকে সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন দেখেছি 'তিন পয়সার পালা' নাটকে শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন তিনি পুলিস-অফিসার-বেশী রুদ্রপ্রসাদকে আলতোভাবে বলতেন :

> "মহীন্দিরের খবর আমি আপনারে আবার দিয়ে যাব। আপনি অবশ্য ডাইরির পাতা ছিঁড়ে ফেলবেন। তা হোক্—আমি আবার ডাইরি করাব। আপনি আবার ছিঁড়বেন আমি আবার করাব; আপনি আবার ছিঁড়বেন আমি আবার করাব; আপনি আবার ছিঁড়বেন আমি আবার করাব। এ খেলাতো চলবেই, যতদিন না ....."

এই অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে পড়বে কেমন ক'রে

একইভাবে বসে থাকতে থাকতে তিনি প্রথম দিকের আল্‌গা বাক্যাংশকে শেষ দিকে ক্রুদ্ধ মার্জারের অন্তর্গূঢ় ফোঁসানিতে রূপান্তরিত করতেন, আবার হঠাৎ কেটে দিয়ে, এক পাক ঘুরে, হেঁঃ হেঁঃ করতে করতে বেরিয়ে যেতেন কৌশলী চিতার মত। শুধু দক্ষতা নয়, তিনি অসামান্য সৃষ্টি করতেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অসহায়তা অথচ দুর্নীতিকে আর এক দুর্নীতির স্বচ্ছন্দ শাসানি, স্বার্থপর চেতনা আর কেউটের লেজে পা-দেওয়ার অনিবার্য গরল পরিণতি। একবার-দুবার নয়, অন্তত সতেরো-আঠারোটি রাত্রি আমি এই সৃষ্টি-কর্ম প্রত্যক্ষ করেছি ; একই নৈপুণ্য। অভিনেতা তাই কেবল কারিগর নন, নিপুণ শিল্পী কারিগর।

'Hayman'-এর তৃতীয় বিভাজনটি এক ধরণের পেশাদারী বিভাজন যেখানে নায়ক-নায়িকারা এক রকম ফর্মূলা অভিনয় করেন এবং চরিত্রাভিনেতারা করে যান নানান টাইপের প্রবর্তন। আমার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা থেকে সংগত কারণেই তাই আমি এই বিভাজনটিকে বাদ দিচ্ছি।

দ্বন্দ্ব মেটেনি এবং মিটবে না কখনই হয়ত তাঁর চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বিভাজনগুলিতে। আসলে একই সত্য লক্ষ্যে সুন্দর উত্তরণই এই বিভিন্ন পথের সমস্যা। পথটা যেমনই হোকনা কেন, উদ্দেশ্যটা এক।

কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তা নিয়ে বিরোধ মেটেনি আরভিং ও কক্‌ল্যাঁর, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পদ্ধতি বা ব্রেশ্‌টের মতে। তাঁদের নিজেদেরই তত্ত্বগত মত, প্রয়োগের সময় অনেকটা ভিন্ন চেহারা নিয়েছে কখনো কখনো। প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সার্থক সমন্বিত হ'য়ে ওঠাতেই অভিনেতার মুক্তি। তাঁর নিজস্ব চারিত্রিক গঠনের উপর তাই নির্ভর করে কোন্‌ পথে তাঁর সত্য আসবে। 'গ্যারিক' বা 'জন লরেন্স টুল' দু'জনেই মহৎ অভিনেতা ছিলেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে লোকে 'গ্যারিকের' অভিনয় দেখে এসে বলত 'হ্যাম্‌লেট্‌' অপূর্ব আর 'জন-লরেন্স টুলের' অভিনয় দেখে এসে অভিনেতার নামই করত অভিনীত চরিত্রের নয়। বাংলা দেশে 'অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী'র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি প্রযোজ্য। অনেকে মনে করেন যে এরকম অভিনয়ে নাটকের চরিত্রটি সার্থক বা সম্পূর্ণ অভিনীত হয় না। এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

"এইরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাব দৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যে রূপ মনের ভাব হইয়াছিল সেই ভাবটি যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনা প্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। Art gallaryতে Approaching storm অর্থাৎ ঝড় আসিতেছে এই নামে একখানি চিত্র আছে। ঘোর মেঘ উঠিয়াছে, বৃক্ষসকল স্পন্দনহীন, পশু-পক্ষী ভয়াকুল, ঝড়ের পূর্বে এই দৃশ্য স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্য আঁকিয়া তাহাতে কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রভৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার পূর্বে যেখানে সেখানে চাষা গাভী প্রভৃতি দেখা যায়না। কিন্তু চিত্রকর তাঁহার চিত্রপটে উহা দেখাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত মেঘ ও স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অঙ্কিত মানবের মুখভাবে ঝড়ের আশঙ্কা বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্দ্ধেন্দু উচ্চ কলা-বিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশ চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। বর্ণিত চিত্রকরের Approaching storm ছবিতে আমরা ছবি দেখি কিন্তু ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়; অর্দ্ধেন্দুর অভিনয়ে সেইরূপ আমরা অর্দ্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের ঠিক ভাব উপলব্ধি হয়।"

'গ্যারিক' বা 'টুল' কারো অভিনয়রীতিই অগ্রাহ্য করার নয়, 'গিরিশবাবু' এবং 'অর্দ্ধেন্দু'র অভিনয়ও একই চরিত্রের বেলায় অনেক সময় পৃথক্ ধরনের হতো—কিন্তু তাঁরা সকলেই সত্য অভিনেতা ছিলেন। এই সব থেকে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে যে অভিনয় ব্যাপারটা মোটেই একমেটে নয়, তার অনেক রকম ডাইমেন্‌শন্ বা নানান গভীরতার রঙ আছে। তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতা, নিমগ্নতা বা বিচ্ছিন্নতা তাই মিথ্যাও বটে, সত্যও বটে। যে কোন একটি মাত্র নান্দনিক তত্ত্বের নির্দেশে তাকে নির্দিষ্ট করা চলে না। স্ত্রী মারা গিয়েছেন, স্বামী শোকাচ্ছন্ন—এই হয়তো নাট্যকারের দেওয়া সিচুয়েশান, কিন্তু সেই শোকের একটা ব্যক্তিগত রূপদানই অভিনেতার সৃষ্টি। 'রাজা' নাটকে

বৃদ্ধ ঠাকুর্দা-বেশী কুমার রায় যখন বিদ্রোহী রাজন্য-বর্গের পথ আগলে দরজায় দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে চিৎকার করতেন, "রাজার রাজ্যে আমি তো সবচেয়ে অযোগ্য লোক, তাই আমার উপর ভার পড়েছে তাঁর দ্বার রক্ষার", তখন ঠাকুর্দার নব-জাগ্রত যৌবনের দীপ্তি শরীরে এবং কণ্ঠে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঠাকুর্দার বয়সের বার্ধক্য যা অভিনেতা কখনোই ভোলেননি, যাঁর নিজের জীবনের একটি বড়ো সত্য ছিল তখন তার চল্লিশ বছর বয়স। এই সৃষ্টি যে পন্থাতেই সম্ভব হোকনা কেন, অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী যে ধরনের পদ্ধতিতেই তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুননা কেন, তা সত্য হয়েছিল। মহৎ প্রথা-প্রকরণের সূক্ষ্মতম ভেদ বিচার নয়, এই হয়ে ওঠাই আমার কাছে সত্য।

অভিনেতার কাছে তাই মঞ্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ আত্মস্থতার কেন্দ্রে নিজেকে প্রতিস্থাপন; অটুট আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসে। বিশু পাগল যাতে আর মঞ্চে শুধু 'রক্ত করবীর' একটা চরিত্র হয়ে বাঁচে না, বরং একজন অভিনেতার মধ্যে বাঁচে যে বিশুর ভাবনা এবং দুঃখে তারই মত দীর্ণ হয়ে যায়। সেই দুঃখ দর্শকের কাছে যথার্থ প্রবাহিত করতে গেলে প্রয়োজন সেই ভালোবাসার যার জন্য জীবনের সারাৎসার উৎসর্গ করা যায়। কোন প্রতিযোগিতা নয়, কোন অন্ধ ঘোড়দৌড় নয়, কোন সুখ্যাতির লিপ্সা নয়, শুধু সুন্দরের জগতে প্রবেশাধিকারের চেষ্টা। সৌন্দর্যের তৃষ্ণা আমাদের চারপাশের মানব-মনে। যদি একবারও হৃদয় ও বোধির এক অপূর্ব মিলন মুহূর্তে তাঁদের রসতন্ত্রীতে সাড়া তুলতে পারা যায় তাহলে রহস্য হয়ে ওঠে উজ্জ্বলতম সূর্যও। এ সেই সার্থক প্রতিফলনের মায়াবী সত্য যার ভিতর দিয়ে দৈনন্দিনের সাধারণতম ঘরও একটি নিটোল কবিতা হয়ে ওঠে। পোষ্টম্যান্ কত হাসি-কান্নার চিঠি বিলিয়ে যায়, কত স্মৃতি আর স্বপ্নের, স্মৃতি, স্বপ্ন আর তীব্রতার, কত সমাহিত নিমগ্নতার খবর; কিন্তু পোষ্টম্যান্ পোষ্ট-ম্যান্ই থাকে। সমস্ত চিঠি যথাযথ বিলি করার মধ্যে এই নির্বিকার পোষ্টম্যান্ হয়ে ওঠাই অভিনয়ের সত্য।

এ নিবন্ধে যা কিছু বলা হলো তা কেবল মঞ্চাভিনয়ের কথা মনে রেখে। সাধারণভাবে এ সব কথা সকল রকম অভিনয়ের ক্ষেত্রেই সত্য বটে, তবে নির্দিষ্ট কোন কোন অংশে সমস্যার রূপটা অন্যান্য অভিনয়-মাধ্যমে কিছু ভিন্ন।

লেখক।

অভিরূপ সরকার

শিল্প-জিজ্ঞাসা : একটি বিকল্প সিদ্ধান্ত

প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ নয়, যথার্থ-অর্থে প্রাকৃতিক তা-ও নয়, স্বাধীন মানুষের চেতনায় প্রতিফলিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর তির্যক-সুন্দর প্রকাশ-ই শিল্প—এমন একটা ধারণা আছে। শতাব্দী-বিস্তীর্ণ এই ধারণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু হয়েছে কোনো মৌল ভাবার্থে নয়, শুধুমাত্র বাহ্যিক বিন্যাসে। প্রাচীন ভারতীয় রস-বেত্তাগণ 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' যে শিল্প-প্রক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম হননি; এবং প্রকৃতি-সজ্জিত সন্ধ্যার মেঘমালাকে বিদেশী রোম্যান্টিকরা সেই একই প্রক্রিয়ায় আপন কল্পনা মিশিয়ে রচনা করতে চেয়েছেন, পূর্ণতার অন্য এক রূপ দিতে চেয়েছেন। ধারণাটির তাত্ত্বিক সংশ্লেষ আরও ব্যপ্ত। ফলত, অসংখ্য নান্দনিক বিচারে একে মূল বিশ্লেষণের একটি ভিত্তি-স্থাপক প্রকল্প হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব বিচার যদিও একে অপরের থেকে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের চরিত্র অনুযায়ী আলাদা, এদের মধ্যে একটি সামান্য-লক্ষণ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। ঈষৎ বিস্তৃত-অর্থে বলা যেতে পারে সেই নন্দনতাত্ত্বিকগণ যাঁরা 'অনন্যপরতন্ত্র' রচনার ধ্যান করেছেন, তাঁরা শিল্পকে বর্ণনা করেছেন একটি বিশেষ বিমূর্তের অন্বেষণ হিশেবে— রবীন্দ্রনাথ এই অন্বেষণকে কখনো-কখনো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব'লে মনে করেছেন; অন্যত্র তিনি একে গ্রহণ করেছেন আপন সত্তার এক অজানিত অংশের উন্মোচন-প্রয়াস রূপে। অন্য কারো কাছে, এই অন্বেষণ এক অর্ধ-সচেতন আত্মনিমগ্নতা ; আপাত-অস্পষ্ট এবং বিশেষ-অর্থে নৈর্ব্যক্তিক এক আবেগের মধ্যবর্তিতায় অন্তহীন সময়-প্রবাহ তথা জৈবী অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। স্পষ্টত, এই ধরনের অন্বেষণের একটি বিশেষ চরিত্র আছে। বিস্তারিতভাবে তা এই : প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অন্বিষ্টের প্রকৃত-স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা নেই, অনেকটাই নিজেকে তথা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া, কাজেই, চরম লক্ষ্যবস্তুটি সেই-অর্থে প্রাকৃতিক নয়,স্পষ্ট নয়, বরং প্রকৃতি-অতীত, অতীন্দ্রিয় কোনো উত্তরণ।

শতভিষা

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য মূল প্রকল্পটির ও তৎসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনা, ভিন্নতর একটি প্রকল্প-নির্মাণ এবং সেই প্রেক্ষিতে বিকল্প একটি সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা।

দুই

আরম্ভেই 'প্রকৃতি' শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য ও ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতি এক আরোপিত অবস্থাবলীর সমন্বয় অথবা পূর্ব-নির্ধারিত কয়েকটি উপাদান যা একজন ব্যক্তিমানুষ শুধুমাত্র তার নিজের চেষ্টায় পালটাতে পারে না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিমানুষের কাছে তার চারপাশের গাছ, ফুল, আকাশ ইত্যাদি যেমন প্রকৃতির অন্তর্গত, তেমনই তার সমাজ, বান্ধব-সঙ্গ কিংবা ভৌগলিক আবহাওয়া। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি কয়েকটি বিশেষ রীতিতে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবর্তিত—এমন মনে করা ভুল হবে না। যেহেতু এই নিয়মগুলি মোটামুটি স্থির, বর্তমান প্রবন্ধে 'শাশ্বত প্রকৃতি' বলতে আমরা এই বিমূর্ত নিয়মগুলিকেই বুঝব।

উল্লিখিত প্রকল্প অনুযায়ী, শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সচেতন অথবা অর্ধসচেতনভাবে বিন্যাসিত ক'রে যে ব্যক্তিগত পৃথিবী রচনা করেন তা-ই শিল্প। অর্থাৎ এখানে দু'টি পরস্পরবিরোধী উপাদানের কথা বলা হয়েছে : এক, পূর্ব-আরোপিত, অপরিবর্তনীয় কয়েকটি নিয়ম, শিল্পীর পারিপার্শ্বিক যার ফল, ও দুই, শিল্পীর অন্তর্নিহিত এক রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় চেতনা; এই উপাদানদুটি একে অপরের স্বাধীন এবং পরস্পরের উপর এদের যৌথ প্রতিক্রিয়ার পরিণতিই শিল্প। যেহেতু এই পরিণতি যথার্থ-অর্থে প্রাকৃতিক নয়, 'উত্তরণ' জাতীয় শিল্প-সিদ্ধান্তগুলি এই প্রকল্পের-ই অনুসরণ।

যদি এই প্রকল্পটিকে সত্য ব'লে ধরে নিই, তাহলে দু'টি অনুসিদ্ধান্তে পৌছনো যেতে পারে—প্রথম, প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত কিছু সৃষ্ট হওয়া সম্ভব, ও দ্বিতীয়, কোনো-কোনো মানুষের ভিতরে প্রাকৃতিক গুণাবলী ছাড়াও এমন একটি রহস্যময় চৈতন্য আছে যার সংমিশ্রণে নিছক প্রকৃতি-লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিও 'অনন্য-পরতন্ত্র' শিল্প হয়ে ওঠে। দুটি অনুসিদ্ধান্তই আমার ভ্রান্ত ব'লে মনে হয়েছে।

বলা যেতে পারে, যে-মৌল প্রতিজ্ঞা থেকে উপরি-উক্ত প্রকল্পটি, সিদ্ধান্তগুলি এবং অনুসিদ্ধান্তদুটি উদ্ভূত তা আর কিছুই নয়, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া প্রকৃতির উল্লিখিত সজ্ঞা। স্বভাবতই এই সজ্ঞা সার্বিক কিংবা চরম নয়, ব্যক্তিনির্ভর এবং মন্ময়, সুতরাং যে কোনো তন্ময় সিদ্ধান্তের প্রতিজ্ঞা হওয়ার অযোগ্য। আরো স্পষ্টভাষায়, উল্লিখিত সজ্ঞার ব্যক্তিমানুষও অনিবার্যভাবে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অন্তর্ভূক্ত, শাশ্বত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার যে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কাজেই শিল্প-সৃষ্টির প্রাণালীটিও একান্তভাবে প্রাকৃতিক, প্রকৃতি-অতীত কোনো চৈতন্যের স্থান এখানে নেই। বস্তুত, প্রকৃতি-অতীত কোনো চৈতন্যের স্থান কোথাও নেই, কারণ প্রকৃতি অর্থই পরম, শাশ্বত, সম্পূর্ণ। অতএব প্রকৃতির সার্বিক সজ্ঞাটি এইরকম : বোধযোগ্য প্রত্যেকটি উপাদান কোনো-না-কোনো কার্য-কারণের সূত্রে আবদ্ধ ; এই কার্য-কারণ-সূত্রের আড়ালে যে কয়েকটি শাশ্বত নিয়ম অবিশ্রাম কাজ করে তা-ই প্রকৃতি। এই সজ্ঞা অনুযায়ী 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' শিল্প-রচনার প্রকল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলিকে আমারা বর্জন করতে পারি।

তিন

এখন বৈকল্পিক একটি প্রকল্পের কথা এইভাবে ভাবা যেতে পারে : সর্বব্যাপ্ত চরাচর অখণ্ডমণ্ডলাকার কয়েকটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। যে-নিয়মের ফলে গাছ ফুল ফোটায়, অনেকটা সেই রকমই একটা নিয়মের ফলে শিল্পী শিল্প রচনা করেন ; গাছ ফুল-ফোটানোর উপাদান সংগ্রহ করে মাটি থেকে, শিল্পী শিল্প-রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন পারিপার্শ্বিক থেকে। এক্ষেত্রে মাটি ও শিল্পীর পারিপার্শ্বিক যেমন প্রকৃতির অন্তর্গত, ফুল-ফোটানোর নিয়ম এবং শিল্প-রচনার নিয়মও তাই। অতএব শিল্প-রচনা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীরই একটি বিশেষ প্রকাশ, প্রকৃতি থেকে আলাদা কোনো প্রক্রিয়া নয়। এই প্রকল্পের প্রেক্ষিতে আমরা এবার ভিন্নতর একটি নান্দনিক-সিদ্ধান্ত নির্মাণ করতে পারি।

প্রাথমিক-অনুমান-স্বরূপ, শিল্প-সঞ্জাত অনুভবকে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে

বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: রস-গ্রহীতার কাছে, এমন মনে করা ভুল হবে না, শিল্প-অনুভব মূলত কয়েকটি অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস; শিল্পীর দিক থেকে আবার, বলা যায়, শিল্পরচনা স্রষ্টার কয়েকটি অতীত অভিজ্ঞতার শাশ্বতীকরণ-প্রক্রিয়া। কিন্তু শুধুমাত্র এই বর্ণনা অনুসরণ করলে যুগপৎ দুটি সমস্যা দেখা দেবে। প্রথমত, একজন ব্যক্তিমানুষের কাছে, প্রবৃত্তি-জাত ছাড়া অন্য যে-কোনো অনুভব-ই অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস, শিল্প-অনুভবকে আলাদা করব কেমন ক'রে? দ্বিতীয়ত, স্রষ্টার অভিজ্ঞতার সম্ভার অপরিমেয়; শিল্প-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কোন্ বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলিকে রচনায় ধ'রে রেখে শিল্পী নির্মাণের আনন্দ পেতে চান? এই সমস্যাদুটি সমাধানের জন্য শিল্প-চেতনাকে আরো সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

এইভাবে শুরু করা ভালো: প্রাকৃতিক নিয়মের ফলেই প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর এক-একটি বিশেষ সম্পূর্ণতার বোধ আছে; এই বোধ একান্তই ব্যক্তিগত সুতরাং যে-কোনো দুটি ক্ষেত্রে এক নয়। একজন ব্যক্তিমানুষের সারাজীবনের প্রয়াস শুধুমাত্র ব্যক্তিগত-অর্থে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা, এবং এই ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা-বোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল, একে কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রেক্ষিতেই বিচার করা সম্ভব। প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি, বক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা পারিপার্শ্বিক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমানুষটির শারীরিক, বিশেষ ক'রে মস্তিষ্কের গঠন—মূলত এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গ'ড়ে ওঠে একটি প্রাতিস্বিক সম্পূর্ণতা-বোধ।

একজন ব্যক্তিগত রস-গ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে, শিল্প-অনুভব এমন একটি অভিজ্ঞতা যা তাঁর আপাত-অস্পষ্ট সম্পূর্ণতা-বোধটিকে অন্তত আংশিকভাবেও স্বচ্ছ ক'রে তোলে, এবং একই সঙ্গে সেতু-স্থাপন করে বর্তমান বাস্তব এবং আকাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণতার ভিতর। স্পষ্টত, এই সেতু-স্থাপন ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা-বোধের উপাদান কয়েকটি অভিজ্ঞতার মধ্যবর্তিতায়—শিল্প-অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র এই মূল অভিজ্ঞতাগুলির পুনর্বিন্যাস। যুগপৎ আনন্দ এবং দুঃখ—আনন্দ আত্ম-আবিষ্কারের, দুঃখ তাকে না-পাওয়ার।

পক্ষান্তরে, শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে, শিল্প-রচনার প্রক্রিয়া আর কিছুই নয়, ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা-বোধের গঠন-প্রক্রিয়া। আরো স্পষ্টভাষায়, পারিপার্শ্বিক-

কন্ধ একটি বা একাধিক অভিজ্ঞতা শিল্পীর কাছে কখনো-কখনো বিশেষ অর্থবহ মনে হয়, এই মনে-হওয়া আবার শিল্পীর সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নিয়মেই শিল্পী একে গ্রহণ করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই এই অভিজ্ঞতা শিল্পীর ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতা বোধের একটি উপদান হয়ে পঠে, এবং এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষটি নিজের সম্পূর্ণতা-বোধ সম্বন্ধে আর পুরো অজ্ঞ থাকেন না। যেহেতু এই সম্পূর্ণতা শিল্পীর পরম আকাঙ্ক্ষা, তিনি তাকে ধ'রে রাখতে চান, শাশ্বত ক'রে রাখতে চান তার এক-একটি উপাদান— শিল্প-রচনা মূলত শিল্পীর সম্পূর্ণতাবোধ-সংশ্লিষ্ট উক্ত অভিজ্ঞতার শাশ্বতীকরণ প্রক্রিয়া।

চার

এই প্রবন্ধে আমরা পাশাপাশি দুটি প্রকল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুটি সিদ্ধান্ত আলোচনা করেছি। প্রথম সিদ্ধান্তটি উত্তরণ-সম্বন্ধীয়—এবং এই উত্তরণ প্রকৃতি-অতীত, অতীন্দ্রিয় এবং রহস্যাবৃত। এই সিদ্ধান্তটিকে আমাদের ভ্রান্ত ব'লে মনে হয়েছে। বিকল্প যে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তটি আমরা তৈরী করেছি তাও এক-অর্থে উত্তরণ-বিষয়ক। কিন্তু এই উত্তরণ প্রকৃতি-অতীত নয়, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর-ই অন্তর্ভুক্ত। কারণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই যখন প্রকৃতি-নির্ধারিত, শিল্পী ঈশ্বরের সমকক্ষ এক স্রষ্টা—এই ধারণার সমর্থন শুধুমাত্র মানুষের মূর্খ দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

শংকর চট্টোপাধ্যায়

আমি এখন মানুষের পোশাক খুলে লাফ দিয়ে নামছি জলে
উঠছি ডাঙায়, উড়ে যাচ্ছি দশদিকে
এখন আর আমি কোন মায়ের ছেলে নই কারোর নই আত্মীয়
নেই-শহরের বাসিন্দা—আমি লাল আলোর লাল হলুদের হলুদ

শতভিষা

ক্রমে ছায়া দীর্ঘ হয়,
ক্রমে
ছায়া দূরে স'রে যায়।

দূরে
অন্ধকার হ'য়ে আসে
মানুষের বাড়ি-ঘর মানুষের
সুখ

পৃথিবী তার
ঘুমের গল্পকে কোলে নিয়ে
স্বপ্ন দেখে
পাতাঝরা গাছের

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সেদিন রাত্রে শংকরের জন্যে মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছিলো। তখন প্রায় দশটা। ওর বাড়িতে ফোন করতে গিয়ে দেখি লাইন খারাপ। পর-দিন সকালে খবর, গত রাত্রে শংকর গৌহাটিতে মারা গেছে। আশ্চর্য! শংকরের কবিতা ওর মুখে আমি অনেক শুনেছি। তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী নিজের লেখা ওকে শুনিয়ে এসেছি বাড়ি বয়ে। এমন সহ্যশক্তি সম্পন্ন মানুষ একডাকে মৃত্যুর দিকে ছুটে গেল! 'দেশ'-এ ওর ছবি দেখে সেই প্রথম সারাদিন ওর জন্যে কাঁদলাম। আজ শংকরের কবিতা পড়তে গিয়ে দেখি শুধু মেঘ মলিন অভিমান, যা ঢেকে আছে ওর ছবি।

সুখেন্দু মল্লিক

পঞ্চাশের একজন বিশিষ্ট কবি শংকর চট্টোপাধ্যায় কবিতা বিষয়ে অতিরিক্ত সিরিয়স ·ছিলেন, তাই তাঁর প্রবণতা ছিল, হালকা লঘুচালের পরিবর্তে গভীর উপলব্ধির রহস্যকে তুলে ধরা ; এ তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক, তাই বিষয় হিসেবে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিলো সবসময়ই গভীর কিছু বেছে নেওয়া, তা অনেক সময় বাঁক নিতো দার্শনিকতার দিকে, কিন্তু কখনো তিনি লঘুচারি কিছু বেছে নিতেন না ; তাই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম ; ক্রমশই লক্ষ্য করছিলাম, অতৃপ্তি তাঁকে সেইদিকে নিয়ে যাচ্ছে যে বিন্দু থেকে মহৎ কবিতা উৎসারিত হয়ে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ একজন প্রিয় কবির পূর্ণবিকাশ দেখা গেলো না, এই দুঃখ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি গেলেই আগে শংকর আমাকে টানতো। ওর হাসিখুশি মুখ সতেজ ভরাট গলা মনে পড়তো। ইচ্ছে হতো, একবার শংকরের সঙ্গে দেখা করে যাই। ল্যান্সডাউনের সেই বাড়িটা এখনও নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

পঞ্চাশের একজন কবি আমাকে বলেছিলেন, পার্কের পাশের কোনো গাছকে তাঁর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, উত্তেজনা নেই, কোনো কিছু হয়ে ওঠা নেই, গাছ তুই বছরের পর বছর এইভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

শংকরদের বাড়িটাকে আমি এ প্রশ্ন করতে যাবো না। তবে কোনো ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা শংকরের সম্পূর্ণ অজানা ছিলো ছোটো। বড় সব ঘটনা শংকরে মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। ওর মধ্যে উত্তেজনা আহ্লাদ এবং প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরী হতো। শংকরের লেখা এই প্রতিক্রিয়ার ফল। তাঁর গল্পে, কবিতায় এই চিৎকার আর আর্তনাদ ধরা পড়েছে।

অনেকে 'জীবনসংগ্রাম' 'জীবনযুদ্ধ' এই সব কথা ব্যবহার করতে ভাল-বাসেন। কিন্তু আমরা যেভাবে বেঁচে থাকি তাকে 'যুদ্ধ' যদি বা বলা যায়, এ' যুদ্ধে' আমাদের শৌর্যের কোনো পরিচয় নেই, বীরত্বের নাম গন্ধ নেই। এ'যুদ্ধ' আমরা ঘোষণা করিনি। আমাদের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ-জীবন আমরা বহন করতে বাধ্য। তার মধ্যে হয়তো কেউ চিৎকার করে উঠতে পারি, কেন জন্ম কেন নির্যাতন। এই নির্যাতন শংকরের লেখা গল্পের বিষয়। কবিতায় শব্দ দিয়ে যে বাড়িটা শংকর তৈরী করতে চাইতো তার ভেতরের পরিমণ্ডলটা এই রকম।

আর ল্যান্সডাউনের ইঁটের নিস্পৃহ বাড়িটার পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে যাবো। শংকরের সতেজ ভরাট গলা, হাসিখুশি মুখ মনে পড়বে। এই বাড়িতে আমাদের প্রিয় শংকর চট্টোপাধ্যায় বাস করতেন। শংকর নেই। আর ঐ বাড়িটাকে কি বলা যাবে শংকরদের বাড়ি?

সুব্রত সেনগুপ্ত

ছোটখাটো একজন স্বয়ং-সম্পূর্ণ কবি হওয়ার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না শংকর চট্টোপাধ্যায়ের, সে-রকম কোনো প্রচেষ্টাও ছিল না। তিনি একজন বড়ো কবির সর্তে ভেবেছেন নিজেকে যে সর্ত আয়ত্বে আনার জন্য তাঁর মধ্যে সর্বদাই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছিল, রক্ত এবং পরাজয় ছিল। তিনি গভীরতর বিপদের ভিতর থেকে ছুঁতে চেয়েছিলেন এক রহস্যের জগৎ যেখান থেকে মানুষের মধ্যে পশুত্ব এবং পরাজয়-কে দেখতে পাওয়া যায়—সেখানে ঈশ্বর এবং সময় নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষের পটভূমিকা রচনা করে। তিনি তাঁর আবেগের জটিল নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে মৃত্যুকেও উপলব্ধি ক'রেছেন। তাঁকে আমার সব সময়ই একজন কবি মনে হয়েছে যাঁর শ্রম বিষাদ এবং অবচেতনা মহৎ কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকের জন্য কবিতার একটি ছত্রও রচনা করেননি

তিনি—এমনকি দুচার লাইন চতুর 'ছড়রা'ও না— যার ফলে বিশেষ কোনো খ্যাতিও (অর্থাৎ যাকে নাম ছড়িয়ে-পড়া বলা চলে যা একজন লেখকের জন্য আত্মতৃপ্তি আনে এবং তার সৌন্দর্য নষ্ট ক'রে দেয়) হয়নি তাঁর।

বস্তুতঃ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাঁর কাছ থেকে একজন বড়ো কবির পরিচয় গ্রহণ করছিলুম আমরা, যিনি যে কোনো বিচারসভায় নির্ভীকভাবে মাথা তুলে বলতে পারতেন 'না', যিনি মৃত্যুর আগে, অন্তত একটি দশ লাইনের অসম্ভব কবিতাও লিখে যেতে পেরেছিলেন দশ লাইনের এক 'অসম্ভব' কবিতা লেখার জন্য তাঁর মধ্যে সারাজীবন এক অন্ধকার অপেক্ষা ছিল, কান্না ছিল, ক্ষয় ছিল। কিন্তু কেন তিনি এরকম আকস্মিকভাবে পা বাড়িয়ে মৃত্যুর ভিতরে নেমে গেলেন ? কেন নেমে গেলেন ?

কালীকৃষ্ণ গুহ

(৬)

কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়কে আমি মাঝে মাঝে চিনতে পারতাম না। যখন তিনি কবিতা প্রতিবেশীদের শোনাবার জন্যই যেন জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতেন, তখন নয় : যখন পুরো চব্বিশ এম জোড়া পংক্তির পরেই দুই এম-এর লাইন সাজাতেন, তখনো নয়, কিম্বা যখন ঝকঝকে চিত্র-কল্পের মোড়কে নিজেকে রাজার সাজে সাজিয়ে রাখতেন, তখনো নয়। কিন্তু যখন "বাঁশি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে তুমি কখন জলে নামবে ?" এই প্রশ্ন খুব নীচু স্বরে উচ্চারণ করতেন, কিম্বা যখন"……হৃদয়ের কুঁজ বা গলগণ্ড আছে/আছে ভাঁড়ারের ঘট/বর্ণ লিপি/জীবিকা নির্বাহ/শুধু নেই গহ্বরের ভয়" এই অভিজ্ঞতার পোড়া বাদামী প্রজ্ঞা আমাদের জানাতেন তখন তাঁর বুকের অন্ধকার কোণে রাখা ছোট্ট বাক্সের ভিতরটা হঠাৎ চোখের সামনে খুলে যেত। আর তখন, ঠিক তখন কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়কে চিনতে পারতাম।

"মানুষ যাবার হলে চলে যায়"…এই নির্বিকার অমোঘ উক্তির প্রত্যক্ষ দর্শনের এর দ্রুত প্রয়োজন ছিল কি? সত্যই কী ছিল?

পার্থ রাহা

(৭)

নৈরাশ্য, বেদনা, অপমান, ও বিরক্তি লুকিয়ে রাখা যায় না। চালচলন কথাবার্তায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর নিজেকে নিয়েই তো লেখা। তাই শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বইয়ের নাম যখন্ দেখি,—'কেন জন্ম, কেন নির্যাতন'—তখন এই উচ্চকণ্ঠ, বন্ধুবৎসল ও আবেগপ্রবণ মানুষটির গোপন ব্যর্থাকে যেন অনুভব করতে পারি।

শংকরের কোন গল্প সংকলন থাকলে, হাতের কাছে সব গল্পগুলো পাওয়া গেলে আলোচনায় সুবিধে হোত। এই মুহূর্তে যৌবন, বৃষ্টি, ভাত এইসব গল্পের কথাই মনে পড়ছে। শংকরের নিজস্ব একটা মেজাজ ছিল, সেই মেজাজেই তিনি গল্প কবিতা লিখে গেছেন। ঠিক গতানু-গতিক ভঙ্গীতে গল্প লেখেননি। মানুষটার মতো তাঁর ভাষাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। তাঁর গল্পে এমন অনেক অংশ আছে, যা প্রায় কবিতার কাছাকাছি। অবশ্য গল্পের পক্ষে এটা ভাল কি খারাপ সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, শঙ্করের গল্প পড়ে এই জন্যেই বোঝা যায় এটা তাঁরই লেখা।

'যৌবন' গল্পের ইতু কৈশোরের বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে যৌবনের স্বপ্ন দেখেছে।—'বয়স বয়স তুমি শেষ পর্যন্ত দরজা খুললে…… সব রহস্যকে আমায় জানিয়ে দিলে।' শঙ্কর নিজেও কি জীবনের সব রহস্যকে জানতে পেরেছিলেন? তাই কি এলোমেলো বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ক'রে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন?—'এক নগ্ন নিঃসঙ্গ আগুন জ্বলছে 'ইতুর সব কিছুকে ঘিরে।'—'যৌবন' গল্পের শেষ দিকের একটা লাইন এরকম। আসলে এই নগ্ন নিঃসঙ্গ আগুনে পুড়ে পুড়ে শংকর নিজেকেই নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

ভাবতে কষ্ট হয়, আমোদপ্রিয় আড্ডাবাজ এই মানুষটিকে এখন থেকে তো একাই থাকতে হবে।

আশিস ঘোষ

(৮)

বলতে দ্বিধা নেই, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই তাঁর প্রতি আমি ঝুঁকে পড়েছিলাম। তারপর অনেক গভীর রাত্রি তিনি আমাকে কলকাতার কুটিল রাস্তা অগ্রজের মত শান্ত হাতে পার করিয়ে নিয়ে গেছেন। নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও ব্যবহার যেন এক অগ্রজ ও বন্ধুর মিশ্রণে আমার কাছে অমোঘ আশ্রয় হয়ে উঠেছিলো। শেষ ছ-সাত বছর যখন তিনি যথার্থ কবিতা লিখছিলেন, তখনই জানতে পেরেছিলাম, মৃত্যুকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু বলতেন, সেই অমোঘ বারবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। যা তাঁর শেষ দিককার লেখায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। আর, এই মৃত্যুর অনুষঙ্গেই তিনি কবিতায় হয়ে উঠেছিলে ন সত্য। অর্জন করেছিলেন এক ব্যক্তিত্ব। কেননা, তিনি যখন শেষ ছ-সাত বছর জীবন সম্পর্কে ধারণাগুলি পালটাতে শুরু করেছেন, বুঝতে পেরেছেন কবিতা কী, তখনই কবিতা যে একটি নির্মাণ, এই শিক্ষা ছাত্রের পরিশ্রমী নিষ্ঠায় গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্য তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চাই স্বতন্ত্র ভাষা-ব্যবহার। যার মধ্য থেকে ঘটবে এক তীব্র ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। আর এই শিক্ষা, নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর কবিতায় সার্থক হয়ে উঠেছিলো। একথা আজ স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন শংকর চট্টোপাধ্যায় বাংলাকবিতার ভূমির ওপর যে প্রাকার গড়ে তুলেছেন তা তাঁর নিজস্ব। সেই প্রাকারের প্রতিটি ঘরে সন্ধ্যার হাওয়ায় নিঃসঙ্গতা ধরা দেয়, কাস্তে ও কার্পাস নত হয়। মৃত্যুর তীব্র বোধ থেকেই তিনি তাঁর চারিপাশের প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, শিল্পের শুদ্ধতা। তাঁর কবিতার একজন নিবিষ্ট পাঠক ক্রমশ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন, কি ভাবে তাঁর এই বোধ অবশেষে এক দ্বান্দ্বিক বিন্যাসে

উপনীত হয়েছিলো। মনে হতে পারে তিনি শিল্পের শুদ্ধতা ও মৃত্যুর মধ্যে এক সমতা আনতে চেয়েছিলেন। তখনই হয়তো-বা তিনি কবিতায় হ'য়ে উঠে ছিলেন কিছুটা দুরূহ। সেই বিমূর্ত শিল্পের শুদ্ধতায় তিনি নিজেকে নিমগ্ন রাখতে চেয়েছিলেন।

অশোক দত্তচৌধুরী

(৯)

'আবেগ কবিতার জন্মশত্রু' এই উক্তিকে নিঃশর্তে মেনে নিয়েও শংকরের কবিতার অনুরাগী পাঠক হতে আমার আটকায় না। আবেগ-ই শংকরের কবিতার প্রধানতম আশ্রয় কিন্তু সে আবেগের জাত আলাদা। শংকরের আবেগ কখনোই ইনিয়েবিনিয়ে বলে ওঠে না 'তোমার নামের শব্দ আমার প্রাণে আর কানে গানের মতো'। শংকর অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ চাইতো না কিন্তু তার আবেগ অভিজ্ঞতারই সারাৎসার। সেই অভিজ্ঞতাসঞ্জাত আবেগ স্থির শিখার আগুনের মতো জ্ব'লে ওঠে, মন্ত্রের মতো উপলব্ধিনিবিড় নিশ্বাসে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত যায়। মন্ত্রে বিশ্লেষণ নেই, জিজ্ঞাসা নেই, সংঘাত নেই, আছে কখনো আর্তি, কখনো আনন্দ-উন্মীলিত দৃষ্টি—বিশ্লেষণ-জিজ্ঞাসা-সংঘাতকে পাশে রেখে শংকরের কবিতা সেই আর্তি সেই আনন্দ-উন্মীলিত দৃষ্টির কবিতা। শংকরের কবিতাকে আমি এইভাবে বুঝি।

আলোক সরকার

শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর দু'টি কবিতা

ভেঙেছে প্রাচীর

ভেঙেছে প্রাচীর। তুমি বীজ তোলো
তোলো দণ্ডপাণী।
প্রবাহ কাণ্ডের তবু কৃপাময়ী চোখ দুটি থাক
থাক পরমায়ু দীর্ঘ
অদর্শন
বিচ্ছেদ নীলিমা।

আনো নতুন কর্ষণ, অগ্নি, শূন্যস্বর
আধিপত্যময়।
লক্ষ্যের আড়ালে রাখো নত মুখ
মলিন চীবর।
রসস্থ কণায় ধরো বিভূতিও।

বস্তুত ধূলির তৃষ্ণা ছুঁয়েছে অসীম
ছুঁয়েছে স্বাদের লক্ষ্য পরমাও
ভেঙেছে প্রাচীর ঐ
কৃপাময়ী চোখ দুটি থাক।

ভাষাভিত্তিক স্বরলিপি

স্বরলিপি খুলে ভাষা চলে যায় গূঢ়তার দিকে
জানি না আহ্বান কিনা প্রাকৃতিক ?

মানুষও যাবার হলে চলে যায়…খরশব্দে যায়
বস্তুত অধীন তারা কামারশালায়।

যাবার পথের বাঁকে দেখা হয় মানুষ ও ভাষার
জঙ্গুলে কেশের সঙ্গে খরোষ্ঠি লিপির ঘটে কূট যোগাযোগ।

তখন বিবাহসভা খালি থাকে…নেমে পড়ে ছায়া
খালি চটিজুতো আর স্বরলিপিটির মধ্যে বাক্যালাপ হয়।

দেখা যায় সহৃদয় বালিশের মোহপাশ ছিঁড়ে ফেলে রবির অমল
খোঁজ নেয় রাজার চিঠির।

গূঢ়তা ও অধীনতা তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে যুগ্মস্বর তোলে
সম্পূর্ণ সপ্তক…অসামান্য পুরস্কার লাভ হয় মানুষের প্রকৃতিরও বটে।

সম্পাদকীয় দপ্তর

সুরজিৎ ঘোষ : ৫, ওয়েষ্ট রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭

অভিরূপ সরকার : ৪৫এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনার পত্রিকা 'শতভিষা' পঁচিশ বছর পূর্ণ করল। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাকে সত্য অর্থে সজীব এবং ক্রমঅগ্রসরমান রাখার প্রচেষ্টাই তার একমাত্র লক্ষ্য। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধচন্দ্র সেন, অমিয় চক্রবর্তী থেকে শুরু ক'রে বাংলা ভাষার সবচেয়ে তরুণ কবি ও প্রাবন্ধিকটিও 'শতভিষা'র লেখক। কবিতা এবং একমাত্র কবিতার কাছেই 'শতভিষা' উৎসর্গীকৃত।

প্রকাশক : তরুণ মিত্র। ৫, ওয়েষ্ট রেঞ্জ, কলিকাতা-১৭

মুদ্রক : গোপীনাথ আর্ট প্রেস। ১০, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ ও আর্ট পেপার সরবরাহ : শ্রীভোলানাথ শীল।

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন্ সিণ্ডিকেট।

চতুশ্চত্বারিংশ সংকলন

রজত জয়ন্তী বর্ষ : ১৩৮৩

দাম : পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীপরিতোষ সেন।